নারায়ণী।

নারায়ণী।

উপন্যাস।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্. এ. প্রণীত।

কলিকাতা ;

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, "বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী" হইতে,

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ, ১৩১২ সাল।

মূল্য—১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

নারায়ণীর কিয়দংশ "ভারতী" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে সম্পূর্ণ গ্রন্থ মুদ্রিত করিলাম।

এই আমার প্রথম উপন্যাস। নানা কারণে গ্রন্থখানি এবার মনের মত করিতে পারিলাম না। দ্বিতীয় সংস্করণে তাহার চেষ্টা করিব।

গ্রন্থকার—

প্রিয় সোদরোপম সুহৃৎ

বঙ্গ-সাহিত্যের অলঙ্কারস্বরূপ

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়কে

"নারায়ণী"

উপহার প্রদত্ত হইল।

নারায়ণী।

অবতরণিকা।

ছোটনাগপুরের ভিতরে জনার জঙ্গল প্রসিদ্ধ। কলিকাতা হইতে পুরুলিয়ার পথ দিয়া রাঁচি যাইতে হইলে, এই জনার জঙ্গলের পার্শ্ব ভেদ করিয়া যাইতে হয়। আগে পথে বড়ই বাঘের উপদ্রব ছিল, এখন এক রকম নাই বলিলেই হয়,—মাঝে মাঝে দুই একটা উপদ্রবের কথা শুনা যায় এইমাত্র। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ একটা উপদ্রব ঘটিয়াছিল। একটা নরখাদক ব্যাঘ্রের দৌরাত্ম্যে দিন কয়েক পথিকের এই পথে চলা ফেরা ভার হইয়াছিল।

রাঁচির একজন হাকিম সাহেব, সেই ব্যাঘ্র শীকারে কৃত-সঙ্কল্প হন। তিনি কতকগুলি কোল অনুচর, ও গোটাকয়েক কুকুর লইয়া জনার জঙ্গলে প্রবেশ করেন।

জঙ্গলের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া সুবর্ণরেখার তীরস্থ একটা স্থানে উপস্থিত হইলে, সহসা সাহেবের কুকুরগুলা চীৎকার করিয়া উঠিল। ব্যাঘ্রের সন্নিধান অনুমান করিয়া সাহেব ভৃত্য-গুলাকে কারণ নির্দ্ধারণে আদেশ করিলেন। অনুসন্ধান করিতে

খাইয়া সোমরা কোল বিকট চীৎকার করিয়া মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িল ; লছুয়া বিকৃত মস্তিষ্কের ভাব দেখাইল, আর কুরুয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য বোবা হইয়া গেল। সাহেব হস্তীপৃষ্ঠে ছিলেন,—হস্তীও সহসা গমনে বিরত হইল। মাহুতের প্রহার অগ্রাহ্য করিয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া শুণ্ড তুলিয়া প্রহারজনিত কাতরতা দেখাইতে লাগিল।

হইল কি! বাঘই যদি বাহির হইয়া থাকে ত সে বাঘ কোথায়? সম্মুখে সুবর্ণরেখার জল তর তর করিয়া বহিয়া যাই-তেছে—বাঘ কই? পার্শ্বে যতদূর দেখা যায়, দেখা গেল কেবল বিরল-সন্নিবিষ্ট সুবর্ণরেখা-তীরশোভী শালতরু। অদূরে বাঘের অস্তিত্ব বুঝা গেল না।

সাহেব শুধু বিস্মিত হইলেন না, কিছু বিপন্নও হইলেন। কুকুরগুলা সমভাবে চীৎকার করিতেছিল। মাতঙ্গেরও শুণ্ডচালনের বিরাম ছিল না। সোমরা তখনও উঠে নাই, সেই ভাবেই মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া ছিল। কুরুয়ার তখনও পর্য্যন্ত বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই, লছুয়ারও প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না। কারণনির্দ্ধারণের জন্য সাহেব বন্দুকের আওয়াজ করিলেন। বন্দুকের শব্দে সোমরার সংজ্ঞা ফিরিল।

সাহেব সোমরাকে মূর্চ্ছিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করি-লেন। উত্তর না করিয়া সে কেবল অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সাহেবকে একটা প্রকাণ্ড শালগাছ দেখাইল। সাহেব দেখিলেন বৃক্ষচূড়ে পরস্পরাবলম্বী শাখার [illegible] ঘন পত্রাবরণে কতকগুলি নর-কঙ্কাল অবস্থিত রহিয়াছে।

সাহেব কারণনির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়া তদণ্ডেই প্রফুল্লতার কিঞ্চিৎ

রাঁচি এমন হইল কেন? কঙ্কালতিনটীর কি এমন বৈদ্যুতিক শক্তি ছিল? এ কঙ্কাল কাহাদের?

প্রত্নতত্ত্ববিৎ কতকগুলি পণ্ডিত সেই সময়ে কোলজাতির আদি পুরুষ নির্দ্ধারণের জন্য ছোটনাগপুরে গিয়াছিলেন। তাঁহারা রামগড়ের পাহাড় হইতে একখানা প্রকাণ্ড পাথর কুড়াইয়া, সেই খানাই কোলজাতির আদিপুরুষের ভগ্নাবশেষ স্থির করিয়া তাঁহার উপর চকমকি ঠুকিতেছিলেন। দেখিতে-ছিলেন, তাহার ভিতরে জীবন-বহ্নির একটী মাত্রও স্ফুলিঙ্গ আছে কি না। সকলে হতাশ হইতে যাইতে ছিলেন, এমন সময়ে সেই কঙ্কালকয়টীর গন্ধ তাঁহাদের নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। আনন্দোৎফুল্ল হইয়া তাঁহারা রাঁচি আগমন করিলেন।

প্রবলবেগে পরীক্ষা চলিল। কেহ কঙ্কালহৃদয়াভ্যন্তরে গোলোকের গান শুনিতে পাইলেন। কেহ বা সূক্ষ্মদর্শনে দেখিলেন, অস্থির ভিতরে আণবিক কম্পন লম্বভাবে না হইয়া আড়ে হইতেছে। সুতরাং উহা গান নয় আদি কোলের প্রতিভার আলোক। কোন মহাত্মা তুষার-সন্নিভ অস্থি-অঙ্গে মসীবর্ণের ছায়া দেখিতে পাইলেন।

তখন স্থির হইল, স্বতন্ত্রাবস্থিত কঙ্কালটীই কোলজাতির আদি পুরুষ, নইলে সোণার শিকলে বাঁধা রূপার ডিবা হইতে আফিমের গন্ধ বাহির হইল কেন? কঙ্কাল গাছে উঠিল কেমন করিয়া? অমন হয়। নহিলে প্রত্নতত্ত্ব চলিবে কেন? ছোটনাগপুরের সোণার খনি কঙ্কালের গায়ে লাগিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিকল হইয়া দৈবযোগে শালবীজে জড়াইয়াছিল। শেষে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া গাছের সঙ্গে ধীরে ধীরে উপরে

উঠিয়াছে। সকলে সুব দেখি... দি কেহ সেখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখি... হাড়ে দূর্ব্বা গজাইয়াছে।

কিছু দিন পরে ক... ক বিশিষ্ট ইংরাজী সংবাদপত্রে একটী বিস্ম... প্রকাশিত হয়। আমরা নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ

"এতদিন পরে অ... হা রাজা বীরচন্দ্র সাহীদেবের কঙ্কাল আবিষ্কৃ... ার ভীষণ জঙ্গলে একটী প্রকাণ্ড শালবৃক্ষশাখ... লটী বিলম্বিত ছিল। রাঁচির জ—সাহেব শীকার... ইয়া কঙ্কালটাকে দেখিতে পান। হতভাগ্যের মুখে ... চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। পাপিষ্ঠের করাঙ্গুলি-কঙ্কালের শোণিতচিহ্ন এখনও সম্যক্ বিলুপ্ত হয় নাই। ত্রিশ বৎসরের ধারাবর্ষণেও সে কলঙ্ক প্রক্ষালিত করিতে পারে নাই। বিকৃত বদনের বিকট দন্তবিকাশ অবলোকন করিয়া, সাহসী বীরপুরুষ হইলেও আবিষ্কারককে ভয় পাইতে হইয়াছিল। হতভাগ্য দিনকয়েক বড়ই উপদ্রব করিয়াছিল। দিনকয়েক ছোটনাগপুরস্থ ইংরাজ পুরুষ ও মহিলাগণের প্রাণে উদ্বেগ তুলিয়া স্বহস্ত-প্রজ্বলিত অনলে আপনাকে আহুতি দিয়াছিল।

"এই সঙ্গে আরও দুইটী কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। বড়ই বিস্ময়ের কথা, কঙ্কালদ্বয় পরস্পর বিজড়িত ছিল! একটী স্ত্রীলোকের বলিয়াই অনুমিত হয়! অপরটী পুরুষের। কিন্তু নেটিভে... নয়। তাহার অঙ্গুলি-কঙ্কালে যে অঙ্গুরীয় ছিল, তাহাতে ইংরাজী অক্ষর আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটী অক্ষর

সি, বোধ হয় চার্‌ল্‌সের আত্মক্ষর। অপরটী এরূপ ক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহা হইতে কোনও কিছু রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল না। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহা সেই নিরুদ্দিষ্ট চার্‌ল্‌স ব্রাউন। ব্রাউন বিলাতের প্রসিদ্ধ লড—এর ভাগিনেয়। সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাস লিখিতে তথ্যসংগ্রহের জন্য তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার খুড়া অমুক ব্রাউন তখন ছোটনাগপুরের কমিসনর। ব্রাউন খুড়ার গৃহেই অতিথি ছিলেন। সহসা একদিন তিনি নিরুদ্দিষ্ট হন। আর তাঁহার সন্ধান মিলে নাই। বুঝি এতদিন পরে মিলিল। কিন্তু ব্রাউন রমণীকর্ত্তৃক বিজড়িত হইয়া কেমন করিয়া গাছে উঠিল? বড়ই বিস্ময়ের কথা।"

আর একখানি সংবাদ-পত্রে এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল :—

"ধন্য প্রেম! ধন্য তোমার মহিমা! তুমি মানুষকে কতই না উচ্চ করিতে পার! তোমার কৃপায় মহাত্মা ব্রাউনের দেহ মাটী ছাড়িয়া ত্রিশ হাত উপরে উঠিয়াছিল। গাছের ডালে বাধা না পাইলে এতদিন ব্রাউন কত উপরে উঠিতেন, তাহা কে বলিতে পারে?" ইত্যাদি।

তৃতীয় আর একখানি পত্রিকায় এইরূপ লিখিত ছিল :—

"রমণী তোমার প্রেমের কি এতই আকর্ষণ! যে ইহার জন্য একজন বীরপুরুষ কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াও ত্রিশ বৎসর ধরিয়া একটা গাছের ডালে ঝুলিতেছিল। কিন্তু এ মহিলা কে? অবশ্য তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া। কেন না তাঁহার কণ্ঠে মণিময় হার ছিল। রমণীর প্রেমের কি এতই উত্তাপ, এই

অজ্ঞাতনাম্নী প্রেমময়ীর কঙ্কালাবশিষ্ট হৃদয়ের উত্তাপে সেই অপূর্ব্ব হার এবং তৎসংলগ্ন মহামূল্য মণি অঙ্গারে পরিণত হইয়া গিয়াছে। মিথ্যাবাদী হতভাগ্য কৃষ্ণাঙ্গগুলা বোধ হয় এ তত্ত্বে বিশ্বাস করিবে না। তাহারা হয়ত বলিবে, আবিষ্কারক হার-গাছটী আত্মসাৎ করিয়াছেন। ঈশ্বর এই মিথ্যাবাদীগুলাকে রক্ষা করুন।"

আমরা এই ঘটনাটী-সম্বন্ধে যে একটী গল্প শুনিয়াছি, তাহাই আজ পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

প্রথম খণ্ড।

নারায়ণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত অনন্তপুর একটী পার্ব্বত্য গ্রাম। এই গ্রামে বীরচন্দ্র সাহীদেব নামে একজন বড় জমীদার ছিলেন। তাঁহার সম্পত্তির তিন লক্ষ টাকা আয় ছিল। বীরচন্দ্র সাহী পূর্ব্বে নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয় রাজা ভোঁসলার একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে নাগপুরাধিপতির জন্য সৈন্য সরবরাহ করিতে হইত। নিজের জমীদারীর মধ্যে তাঁহার প্রজাশাসনেরও অধিকার ছিল। সুতরাং জমীদার হইলেও বাঙ্গালার জমীদারদিগের ন্যায় তিনি সম্পূর্ণ শক্তিশূন্য ছিলেন না।

অপুত্রক বলিয়া যে সময় নাগপুরাধিপতির রাজ্য ইংরাজ রাজ স্বাধিকারভুক্ত করেন. সেই সময় বীরচন্দ্রকেও ইংরাজের অধীনে আসিতে হয়। ইংরাজের অধীনে আসিয়া তাঁহার পূর্ব্বক্ষমতা অনেকাংশে খর্ব্বীকৃত হয়; ইংরাজ তাঁহার হস্ত হইতে প্রজাশাসন-ক্ষমতাটী কাড়িয়া লয়েন, তবে ৭ টুকগুলি সিপাই রাখিবার অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল।

বীরচন্দ্রের একমাত্র পুত্র, নাম রামচন্দ্র। অধিকারচ্যুত হইবার পর তিনি জমীদারী পর্য্যবেক্ষণের ভার পুত্রের হস্তে দিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে মনোনিবেশ করেন।

আনন্দদেব নামে এক আত্মীয়পুত্রকে তিনি রামচন্দ্রের সহায়তায় নিয়োগ করেন। আনন্দদেবের চেষ্টায় রামচন্দ্রের অনেক ইংরাজের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়, এবং এই ঘনিষ্ঠতার ফলে অসভ্য রামচন্দ্র শীঘ্রই সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হন।

অল্পদিনের মধ্যেই আয় অপেক্ষা ব্যয়ের ভাগটা কিছু বেশী হইতে লাগিল। ক্রমে মাত্রা চড়িল। নৃত্য-ভোজ-মৃগয়াদি বিবিধ ব্যাপারে অল্পদিনের মধ্যেই বীরচন্দ্রের বাল্যাবধি সঞ্চিত প্রভূত ধনরাশি পুত্র রামচন্দ্র নিঃশেষিত করিলেন। বীরচন্দ্র বিষয় সম্বন্ধে কিছু দেখিতেন না বলিয়া পূর্ব্বে বিশেষ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি কেবল পুত্রের ম্লেচ্ছসাহচর্য্য দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইতেন। এবং তাহাকে ক্রমে ক্রমে অধিকতর ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইতে দেখিয়া মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনে ডাকিয়া তিরস্কারও করিতেন। কিন্তু তাঁহার ধনরাশি যে নিঃশেষিত হইতেছে এটা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। যখন বুঝিলেন, তখন তাঁহার জমীদারী ঋণজালে আবদ্ধ, পুত্র সাংঘাতিক পীড়াক্রান্ত। অতিরিক্ত মদ্যাদি সেবনে রামচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে বৃদ্ধ পিতা ও মাতাকে শোকার্ত্ত করিয়া, একটী মাত্র বালিকা কন্যা রাখিয়া রামচন্দ্র দেহত্যাগ করিলেন। স্বামীর চরিত্রদোষে মর্ম্মাহত হইয়া ভগ্নহৃদয়া পত্নী ইতিপূর্ব্বেই পরলোকগতা হইয়াছিলেন।

অগত্যা বৃদ্ধ বীরচন্দ্রকে জমীদারীর কার্য্যভার পুনঃগ্রহণ

করিতে বাধ্য হইতে হইল। আনন্দদেবই এই সর্ব্বনাশের মূল বুঝিয়া তিনি প্রথমেই তাহাকে পদচ্যুত করিলেন। আনন্দদেবের পুত্র মুকুন্দদেবের সঙ্গে পৌত্রী নারায়ণীর বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সংক্ষুব্ধ বীরচন্দ্র সে সঙ্কল্পও ত্যাগ করিলেন। পিতা, পুত্র উভয়েই অনন্তপুর হইতে তাড়িত হইল। বীরচন্দ্র পৌত্রীর জন্য অন্য পাত্রের সন্ধানে রহিলেন। কেননা পুত্রের অভাব পূরণ করিতে পুত্রস্থানীয় একটী যুবকের বড়ই প্রয়োজন। তিনি বৃদ্ধ, পুত্রশোকে-পীড়িত, আর কয়দিন বাঁচিবেন? তখন কে নারায়ণীর অভিভাবক হইয়া, তাঁহার অগাধ সম্পত্তি রক্ষা করিবে? জীবিত থাকিতে থাকিতে তাহাকে বিষয়কার্য্য বুঝাইয়া দিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত। তাহা হইলে আবার স্বচ্ছন্দ মনে তিনি ধর্ম্মকর্ম্মে মনোযোগ দিতে পারেন। সৎপাত্রের সন্ধানে তিনি বিশ্বস্ত সহচর রতনকে নিযুক্ত করিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া রতন অনন্তপুর পরিত্যাগ করিলেন।

বীরচন্দ্র অতি সাবধানে জমীদারীর কার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জমীদারী ঋণে আবদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং ঋণমুক্তির জন্য তাঁহাকে নানাদিকে ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হইল। সামান্য দুই দশজন সিপাহী রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদায়কে তিনি অবসর প্রদান করিলেন। এবং শ্বেতাঙ্গোৎসব ব্যাপারটা একেবারেই উঠাইয়া দিলেন।

রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। রাজার ঋণ পরিশোধের আর বিলম্ব নাই। রতন [illegible] াত্রের স্থান করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। ঋণ-ভীত [illegible] ঋণ-

মুক্তির শুভদিনের অপেক্ষা করিতেছেন। তাহা হইলেই মহাসমারোহে পৌত্রী নারায়ণীকে পাত্রস্থা করেন। এমন সময়ে সহসা একদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি শুনি-লেন যে, তিনি বিকৃত-মস্তিষ্ক, সুতরাং জমীদারী পরিচালনে সম্পূর্ণ অক্ষম। রাঁচি হইতে কতকগুলি শান্তিরক্ষক সঙ্গে লইয়া স্বয়ং কমিসনর অনন্তপুরে আগমন করিলেন। বীর-চন্দ্রের হস্ত হইতে কার্য্যভার অপসৃত হইল। এবং আনন্দ-দেবের হস্তে জমীদারীর পরিচালনভার প্রদত্ত হইল। বীরচন্দ্র এই আকস্মিক বিপৎপাতে স্তম্ভিত হইলেন। যথাসাধ্য প্রতি-বাদ করিলেন। কোনও কুচক্রী মিথ্যাপবাদে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতেছে বুঝাইলেন। প্রতিবাদ নিষ্ফল হইল। রাঁচির কলেক্টর গ্রেট্ গ্রিড্ সাহেব নিজে গোপনে আসিয়া রাজার এ উন্মত্ততা দেখিয়া গিয়াছেন। বীরচন্দ্র একদিন সুবর্ণরেখার তীরে বসিয়া সর্ব্বাঙ্গে মৃত্তিকালেপন করিয়া উন্মাদের ন্যায় অঙ্গ-ভঙ্গী ও অর্থহীন শব্দোচ্চারণ করিতেছিলেন, ইহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

সুতরাং প্রতিবাদে ফল হইল না। আনন্দদেবের হস্তে জমীদারীর ভার সমর্পিত হইল। সপুত্র আনন্দদেব আবার অনন্তপুরে প্রবেশ করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ ভিন্ন তাহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে অনন্তপুরে আর কেহ রহিল না।

ৰিয়োগের
পু:

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ বীরচন্দ্রের সহচরগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন রতন। রতন বাঙ্গালীব্রাহ্মণ, উপাধি রায়। নৈহাটীর সন্নিহিত কোন একটী গ্রামে তাঁহার জন্মস্থান। ছোটনাগপুরই রতন রায়ের কর্ম্মভূমি বলিয়া সে গ্রামের বিশেষ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলাম না।

অদৃষ্টসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া বীরচন্দ্রের সহিত তিনি সৌহার্দ্দ্য-বন্ধনে আবদ্ধ হন। শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করিতে যাইয়া রাজার সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ—সেই প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ের সখ্য। ইহার পর রতন আর দেশে ফিরিলেন না। রাজার অনুরোধে অনন্তপুরই তাঁহার ভাবী বাসস্থান নির্ণীত হইল। রতনের সংসারে কেহ ছিল না।

রতন যখন প্রথমে অনন্তপুরে আসেন, তখন তিনি নব-জাতশ্মশ্রু যুবা। এখন তাঁহার ষষ্টি বর্ষ বয়ঃক্রম। এই সময়ের মধ্যে তিনি রামচন্দ্রকে মানুষ করিয়াছিলেন। নিজে মনোমত কন্যার সন্ধান করিয়া তাহার সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। এখন আবার মাতৃপিতৃহীনা নারায়ণীর ভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

কেমন করিয়া দরিদ্র বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ একজন কোটীপতির সখিত্ব লাভ করিল, এ রহস্য বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। এ রহস্য চিরকালই রহস্য থাকিবে। জগতে এরূপ উদাহরণ দুর্ল্লভ নয়।

·····রচন্দ্রের অন্তঃপুরেও রতনের প্রবেশাধিকার ছিল। মুক্তি·
·ণী মধুমতী রতনকে পিতৃজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। ধর্ম্মকার্য্যে পরামর্শ-প্রয়োজনে রাজার ন্যায় তিনিও ব্রাহ্মণের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। আসল কথা সোদরোপম বীরচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া রতন অনন্তপুরে এক অভিনব সংসার পাতিয়াছিলেন।

মাতৃবিয়োগের পর হইতে নারায়ণী অধিকাংশ সময় রতনের কাছেই থাকিত। বিশেষতঃ এই এক বৎসর পুত্রশোকাতুরা রাণী মধুমতী নারায়ণীকে বড় একটা কাছে রাখিতেন না। রাখিতে সাহসও করিতেন না। পরের ধন করিয়া রাখিলে নারায়ণী বাঁচিয়া থাকিবে, এই আশায় রাণী তাঁহাকে ব্রাহ্মণের হাতে একরূপ সমর্পণই করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণেরও আপনার বলিবার কেহ ছিল না। সুতরাং ঈর্ষাপরতন্ত্র বিধাতা নিশ্চিন্ত ব্রাহ্মণকে বৃদ্ধ বয়সে একটী আপনার ধন দিয়া তাঁহার জীবনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। রতনের তপ, জপ, হোম, যাগ এখন এই কুসুমকিঞ্জল্কসমা বালিকা।

যে সময় পুলিশ সাহেব অনন্তপুরে আসিয়া রাজাকে কার্য্য হইতে অপসৃত করিতেছিলেন, তখন রতন নারায়ণীকে সঙ্গে লইয়া বীরচন্দ্রের অট্টালিকাসংলগ্ন উদ্যানে এক মুকুলিত সহকারতলে দাঁড়াইয়া একটী মৃগশিশুর সহিত খেলা করিতেছিলেন।

তৎপূর্ব্বে নারায়ণী পিতামহীর উপর অভিমান করিয়াছিল। শৈশবে পিতামহীর উপর নারায়ণীর অভিমান অধিকাংশ সময়ে রতনের পৃষ্ঠেই সংরক্ষিত হইত। দুই চারিগাছি পক্ব-

কেশও সেই অভিমানের ফলে স্থানচ্যুত হইত। পিতৃবিয়োগের পর হইতেই বালিকার অভিমানের সেই কার্য্যকরী শক্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নারায়ণীর অভিমানচিহ্ন এখন কেবল মাত্র লোচনজলে পর্য্যবসিত। অভিমান হইলে বালিকা শুধু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিত - কথা কহিত না।

সেটা রতনের বড় অসহ্য হইত। তাই আজ বৃদ্ধ নারায়ণীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নিজের ব্যায়ামকৌশল দেখাইতে উদ্যানে আসিয়াছেন।

কিছু পূর্ব্বে তিনি নারায়ণীর সম্মুখে বড় বড় পাথর লোফালুফি করিয়াছেন, বড় বড় বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়াছেন, কৃষ্ণসারের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়াছেন। তথাপি বালিকার অভিমান দূর হয় নাই।

অবশেষে মৃগশিশুটী আসিয়া ব্রাহ্মণের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

এক হস্তে ঘট অন্য হস্তে আম্রমুকুল ধরিয়া নারায়ণী দূর হইতে হরিণশাবকের খেলা দেখিতেছিল। সে নারায়ণীকে কিছু অতিরিক্ত আদর দেখাইত। তাহাকে দেখিলেই দূর হইতে ছুটিয়া আসিত। অজাতশৃঙ্গমস্তকে তাহার গণ্ড-পৃষ্ঠ-বক্ষ কণ্ডুয়ন করিত, কর্ণ-মুখ-নাসিকা লেহন করিত। এই সকল কারণে মৃগশিশুর সঙ্গটা তাহার বড় ভাল লাগিত না। তাই নারায়ণী দূরে দাঁড়াইয়া তাহার খেলা দেখিতেছিল। বালিকার অভিমানভারাবনত বদনকমলে অৰ্দ্ধবিশুষ্ক-লোচনজল, অরুণকিরণস্পর্শী প্রভাতবাতাভিহত শিশিরবিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

বৃদ্ধ কিন্তু বালিকাকে ভুলাইতে যাইয়া নিজেই আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন। হরিণের সহিত খেলা করিতে করিতে তিনি আপনার পক্ককেশ ও তদ্বৎ শুভ্র আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রু—বার্দ্ধ-ক্যের যে সকল দেহোপকরণ—সব ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি এক একবার আম্রশাখা আকৃষ্ট করিয়া মৃগশিশুর মুখের কাছে ধরিতেছিলেন। ব্যগ্রতাসহকারে সে যেমন মুকুলগুচ্ছকে রসনাপাশে জড়াইবার উপক্রম করিতেছিল, অমনি শাখা পরিত্যাগ করিতেছিলেন। মুকুলগুচ্ছও সেই সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিধারে কণা বর্ষণ করিতেছিল। এইরূপে রতন এক মনে বালোচিত ক্রীড়ায় নিমগ্ন ছিলেন। নারায়ণী যে নিকটে দাঁড়াইয়া আছে, তাহা মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

হরিণশিশু দেখিতে দেখিতে নারায়ণী একবার এদিক ওদিক মুখ ফিরাইতেছিল। তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যোগ্য অনেক সামগ্রীই সেই উদ্যানের ভিতরে সংরক্ষিত ছিল। এদিক ওদিক সেদিক মুখ ফিরাইতে, তরুলতা পুষ্পবন নিরীক্ষণ করিতে করিতে বালিকা দেখিল, দূরে কুঞ্জদ্বাররক্ষী কামিনীতরুতোরণ তলে দাঁড়াইয়া একটী বালক তাহাদের খেলা দেখিতেছে। বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে নারায়ণী তাহার পানে চাহিল। বালকও অমনি তরু-অন্তরালে লুকাইল। তখন চাহিয়া চাহিয়া বালিকা একপদ একপদ করিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল।

বালক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। অগ্রসর হইয়া নারায়ণীর কাছে আসিবে কি পিছাইয়া পলাইয়া যাইবে স্থির করিতে পারিতে-

ছিল না। কর্ত্তব্য স্থির করিতে না করিতে নারায়ণী সম্মুখে উপস্থিত হইল।

নারায়ণী বলিল "মুকু"......

বালক আনন্দদেবের পুত্র মুকুন্দ। পিতার সহিত সে আজ অনন্তপুরে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিরূপ অবস্থায় ফিরিয়াছে তাহা সে অনেকটা বুঝিতেও পারিয়াছে। তাহার বয়স এখন সপ্তদশ বৎসর। সুতরাং পিতার সহিত রাজার বর্ত্তমান সম্বন্ধ বুঝিবার কতকটা শক্তিও তাহার জন্মিয়াছে। তাই নারায়ণীর কথায় কি উত্তর দিবে স্থির করিতে না পারিয়া মুকুন্দ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নারায়ণীর সহিত মুকুন্দ অতি শৈশবে ক্রীড়া করিত। তার পর যখন সে শুনিল নারায়ণীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে, তখন সে লজ্জায় নারায়ণীর কাছে বড় একটা আসিতে চাহিত না। কেননা পুরস্ত্রীগণ প্রায়ই বালকবালিকাকে, বিবাহ কথা লইয়া রহস্য করিত। নারায়ণী বড় বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, মুকুন্দ অনেকটা বুঝিতে পারিত।

সেই নারায়ণী বহুদিন পরে তাহার সম্মুখে। তাহার উপর বালিকার বয়ঃসন্ধি। এই এক বৎসরে নারায়ণীর দেহলাবণ্যে একটা বিপ্লব ঘটিয়াছে। সর্ব্বোপরি মুকুন্দের যৌবনোন্মেষ। মানসিক বৃত্তগুলি প্রস্ফুটনোন্মুখী। চক্ষু অন্ধকারে রূপের আভাস দেখে। কর্ণ কোনদূরদেশের সুকণ্ঠের সুক্ষ্ম-স্বরসুধা পান করে। নাসিকা পারিজাতের আঘ্রাণ পায়। অঙ্গে জল-ভারাবনত নব কাদম্বিনীর স্পর্শসুখ অনুভূত হয়।

কাজেই নারায়ণীকে দেখিয়া কে যেন হৃদয়ের ভিতর হইতে

মুকুন্দের নাক, মুখ, চোক চাপিয়া ধরিল। মুকুন্দ নারায়ণীর কথায় উত্তর দিতে পারিল না।

তখন বালিকা দক্ষিণকরের আম্রমুকুল ঘটমুখে স্থাপিত করিল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মুকুন্দের হাত ধরিয়া টানিল।

কাজেই মুকুন্দকে কথা কহিতে হইল। কম্পিতকর নারায়ণীর হস্ত হইতে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করিয়া অর্দ্ধপরিস্ফুট কণ্ঠে মুকুন্দ কহিল—

"আমি যাইব না!"

"চল দোলায় দুলিব।"

"না—"

"হরিণ লইয়া খেলিব।"

"না—"

"তবে চল দাদার কাছে যাই।"

বালিকা ঘট ফেলিয়া দিল। এবং দুই হস্তে মুকুন্দের এক-হস্ত সবলে ধরিয়া আকর্ষণ করিল। মুকুন্দ বলিল "আমায় ছাড়িয়া দাও।" নারায়ণী বলিল,—"ছাড়িব না। কখনই ছাড়িব না।"

ইতিমধ্যে বৃদ্ধের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তখন আম্রশাখা পরিত্যাগ করিয়া তিনি পশ্চাতে ফিরিলেন। দেখিলেন নারায়ণী নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, নারায়ণীকে দেখিতে পাইলেন না। ডাকিলেন,—"নারায়ণী!" নারায়ণী পশ্চাতে না ফিরিয়াই উত্তর করিল—"কি?"

বৃদ্ধ দেখিলেন, নারায়ণী আনন্দদেবের পুত্রের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুকুন্দকে দেখিয়াই বৃদ্ধের লোচন ক্রোধ-

রাগরঞ্জিত হইল। তখন গম্ভীরস্বরে আবার ডাকিলেন—"নারায়ণী।"

সেই গম্ভীর-স্বর-ঝঙ্কারে সমস্ত উদ্যান প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। বালক স্তম্ভিত হইল। তাহার করের দৃঢ় বন্ধন নারায়ণীর কোমল করাঙ্গুলি-বলয় খুলিয়া গেল। বৃদ্ধ আবার বলিলেন—"চলিয়া আয়"—মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোমাকে এখানে কে আসিতে বলিল?"

ভয়ে মুকুন্দের মুখ শুকাইয়া গেল।

এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে বীরচন্দ্র উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। মুকুন্দকে তদবস্থ দেখিয়া রতনকে বলিলেন, "ও বালককে তিরস্কার করিও না। এখন হইতে এ বাগান এ বাগান কেন—এই অট্টালিকা, রাজ্য—সমস্ত ওই বালকের পিতার—আমার নয়।"

রতন বলিলেন—"কি রকম?"

বীরচন্দ্র রতনকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিতে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। ইত্যবসরে মুকুন্দ একপদ একপদ পিছাইয়া যেই একটু অন্তরালে পড়িল, অমনি ছুটিয়া পলাইল।

নারায়ণীও পিতামহীর কাছে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আনন্দদেব বীরচন্দ্রের আত্মীয়াছে। কিন্তু দূর সম্পর্কীয় এবং দরিদ্র। অনন্তপুর হইতে প তাহার দূরে মথুরাপুরে তিনি বাস করিতেন। পৌত্রীর সন্নাই। সে

পুত্রের বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে রাজা বীরচন্দ্র তাঁহাকে অনন্তপুরে আনাইয়া আশ্রয় প্রদান করেন। অনন্তপুরে আসিয়া, আনন্দদেব অল্পদিবসের মধ্যেই প্রতিপত্তি লাভ করেন। প্রথমে তিনি রাজদপ্তরে একটী সামান্য কাজ পান। ক্রমে বুদ্ধিকৌশলে রাজাকে তুষ্ট করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর পদ লাভ করেন। ইংরাজের অধীন হইয়া, বীরচন্দ্র যে সময় রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া পুত্রের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করেন, তখন রামচন্দ্রের সহায়তার জন্য তিনি আনন্দদেবকেই নিযুক্ত করেন।

রামচন্দ্র বিলাসী, রাজকার্য্য কিছুই দেখিতেন না। সুতরাং কার্য্যতঃ আনন্দদেবই অনন্তপুরের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কথা ও কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে অনন্তপুরে কেহ রহিল না।

এরূপ সুবিধায় কয়জন লোক প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারে? অল্পদিনের মধ্যেই বীরচন্দ্রের ধনরাশিতে আনন্দদেবের ঘর পূর্ণ হইয়া গেল। অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি রামচন্দ্রের বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতে লাগিলেন। এবং সাহেবদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়া ও নানাবিধ উপায়ে তাহাদিগকে তুষ্ট করিয়া, ভবিষ্যতের পথ অনেকটা নিষ্কণ্টক করিয়া রাখিলেন। পদচ্যুত করিবার সময়ে বীরচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার অপেক্ষা তাঁহার দেওয়ানের শক্তি কত অধিক। [illegible]চন্দ্রকেই অবশেষে স্বাধিকারচ্যুত হইতে হইল।

[illegible]নদেবকে কেহই চিনিতে পারে নাই। চিনিয়াছিল [illegible]জন। সে ঐ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ রতন। রতন যে

অমানুষিক অন্তর্দ্দৃষ্টিবলে আনন্দদেবকে চিনিয়াছিলেন, আমরা এমন কথা বলিতে পারি না। তিনি চিনিয়াছিলেন, কেবল তাহার দেহের একটীমাত্র চিহ্ন দেখিয়া। আনন্দদেবের সম্মুখের দুইটী দাঁতের উপর আর একটী দাঁত ছিল।

বীরচন্দ্র ব্রাহ্মণের কাছে আনন্দদেব সম্বন্ধে কখনও কোন প্রসঙ্গ তুলিলেই রতন বলিতেন,—"ট্যারার হাজার দোষ, কুঁজোর নেই অন্ত। ইহারও অধিক যার দন্তের উপর দন্ত।" রাজা সরল হৃদয় ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া হাসিতেন। এরূপ বিজ্ঞতায় কে না হাসিবে? কিন্তু রতন সে হাসি গ্রাহ্য করিতেন না। আনন্দদেবের চরিত্রের উপর তাঁহার সন্দেহ কেহ কোন মতে দুর করিতে পারিত না। যে করিতে যাইত, ব্রাহ্মণ তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতেন না। তিনি বলিতেন, বহুদিন হইতে, বহু উদাহরণ হইতে, বহু বিজ্ঞতার ফলে কবিতাটী রচিত হইয়াছে। ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। যে করে আমি তার বিজ্ঞতার প্রশংসা করি না।

আনন্দদেবকে রাজকার্য্যে নিয়োগ করিবার সময়ে রতন প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। রাজ্যের ভার দিবার সময়েও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বলিতেন—"আত্মীয়—তাহাকে জমী দাও বাড়ী দাও, আদর যত্ন কর। রাজ্যের অন্ধিসন্ধি জানাইবার প্রয়োজন কি?"

বীরচন্দ্র তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বুঝিলেন, অদৃষ্টদোষে আনন্দ রতনের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছে। সুতরাং রতনের বিজ্ঞতা রতনের কাছেই থাকিত। তাহার ফল আনন্দদেবের স্বার্থকে কখনও স্পর্শ করে নাই। সে

বিজ্ঞতাপরিচালিত হইয়া রাজা কখনও কোন কার্য্য করেন নাই। নিজে আনন্দদেবের আচরণে ও কার্য্যকুশলতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার পদোন্নতি করিয়া তিনি নিজেই আগ্রহ করিয়া তাহাকে দেওয়ানী দিয়াছিলেন।

এখন বীরচন্দ্র নিজের মূর্খতা ও মূর্খ ব্রাহ্মণের সর্ব্বজ্ঞতা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। আনন্দদেবের হস্ত হইতে রাজ্যভার কেমন করিয়া পুনর্গ্রহণ করা যায়, তাই পরামর্শ করিবার জন্য তিনি রতনের কাছে আসিলেন। তাঁহার ভয় হইল বুঝি নারায়ণী বিষয়ভোগে বঞ্চিত হইবে।

রতন বুঝিলেন রাজ্য রাঘববোয়ালে গ্রাস করিয়াছে। রাজাকে রাজ্য ফিরাইয়া দেওয়া এখন আনন্দদেবেরও সাধ্যাতীত। বলিলেন, শক্তি আর ফিরিবে না। প্রতীকারের চেষ্টা করিতে গেলে বিপরীত ফল হইবে। যে একটু আধটু অধিকার তাঁহার আছে, তাহাও থাকিবে না। বীরচন্দ্রও তাহা বুঝিলেন। বুঝিয়া চারিদিক শূন্য দেখিলেন।

রতন সংসারানভিজ্ঞের যোগ্য উপদেশ দিলেন। সংসারের সকলই অনিত্য বুঝাইয়া, তিনি তাঁহাকে বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে ও ধর্ম্মকর্ম্মে মনোযোগ দিতে আদেশ করিলেন। বলিলেন—"আর কেন? বয়স গিয়াছে, পুত্র গিয়াছে; তখন মণি বিসর্জ্জন দিয়া কাচে এত লোভ কেন?" অবশ্য এ কথায় রাজা তুষ্ট হইলেন না। এ কথায় কেই বা কবে তুষ্ট হইয়াছে? নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণের কথায় তাঁহার মনে শান্তি আসিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। আনন্দদেব অল্প-দিনের ভিতরে রাজ্যমধ্যে নিজের শক্তি দৃঢ়তর করিয়া লইলেন। রাজার যা একটু আধটুও স্বাধীনতা অবশিষ্ট ছিল, অল্পে অল্পে তাহাও কাড়িয়া লইলেন। এখন বীরচন্দ্র নিজের গৃহে একরূপ বন্দী; ক্রমে রতনের কাছে আসাও তাঁহার বন্ধ হইয়া গেল। স্বগৃহে আবদ্ধ বীরচন্দ্র দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার অট্টা-লিকাসম্মুখস্থ বিশাল প্রান্তর, কিংকবলার, ফ্রেগুলি বুচার প্রভৃতি মহাপ্রভুগণের ক্রীড়াভূমি হইয়াছে। যে ঘরে বসিয়া তিনি রতনের সহিত শাস্ত্রালাপে নিযুক্ত থাকিতেন, সেই ঘর এখন সাহেবদিগের পৈশাচিক ভোজের জন্য ব্যবহৃত।

বীরচন্দ্র দশদিক অন্ধকার দেখিলেন। যে আদর নারায়ণীর প্রাপ্য, সেই আদর মুকুন্দ ভোগ করিতেছে। নারায়ণীকে পুত্রবধূ করা এখন আনন্দদেবের অনুগ্রহ। তা করিলে বুঝি বীরচন্দ্র আপনাকে ভাগ্যবান বিবেচনা করিতেন।

কিন্তু আনন্দদেব তাহা করিলেন না। তিনি বীরচন্দ্রের অপর এক আত্মীয়ের কন্যার সহিত মুকুন্দের বিবাহ দিলেন। মহাসমারোহে অনন্তপুরেই বিবাহ নিষ্পন্ন হইল।

বীরচন্দ্র ক্ষিপ্তবৎ অস্থির হইলেন। এই অসময়ে রাণী মধুমতী সর্ব্বদা রাজার নিকটে থাকিতেন, প্রাণপণে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেন। অবস্থাবিপর্য্যয়ে নারায়ণীও অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। নারায়ণী আর পিতামহীর উপর অভিমান করিত না। রতনকেও আর তাহার অত্যাচার সহিতে

হইত না। নারায়ণী বিশেষ কিছু বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, তবে এটা বুঝিয়াছিল বাড়ীতে একটা গোলমাল বাধিয়াছে।

রতনের কাছে থাকিলে সে তাহার পূজাদির আয়োজন করিয়া দিত। পিতামহের কাছে আসিয়া কিন্তু সে কোন কিছু করিবার সুবিধা পাইত না। পিতামহের মুখ দেখিয়া তাহার প্রাণটা কেমন কেমন করিত। চক্ষু আপনা আপনি কেমন জলে ভরিয়া যাইত। পিতামাতার অভাব নূতন ভাবে আসিয়া যেন তাহাকে পীড়ন করিত।

মনের ভাব গোপন করিবার চেষ্টাও এই বয়সে নারায়ণীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। পিতামহের নিকটে বসিলে, যখন মনোভাব উদ্বেলিত হইবার উপক্রম করিত, তখন গৃহের সামগ্রী—এটা ওখানে ওটা সেখানে স্থানান্তরিত করিতে নিযুক্ত হইত।

মুকুন্দের সহিত নারায়ণীর আর বড় দেখা শুনা হইত না। যদি ঘটনাক্রমে কখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, নারায়ণী আর তাহার সহিত প্রগল্ভ হইয়া কথা কহিত না। এমন কি, কথা যাহাতে না কহিতে হয়, সেইরূপ উপায়ই অবলম্বন করিত। দূর হইতে দেখিলে দূর হইতেই সরিয়া যাইত। নিকটে পড়িলে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইত। মুকুন্দও উপযাচক হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে সাহসী হইত না। মুকুন্দের বিবাহের পর হইতে উভয়ের মধ্যে আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই।

বিবাহের পর নববধূকে লইয়া যখন মুকুন্দ ঘরে আসে, তখন নারায়ণীর একবার উভয়কে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল।

নববধূটীর সহিত ছেলেবেলা হইতে তাহার বড়ই ভাব ছিল। বালিকার পিত্রালয় অনন্তপুরের নিকটেই। তাহার পিতা মধ্যবিত্ত তালুকদার—দুই তিনখানি গ্রাম তাহার অধিকার ভুক্ত ছিল। গ্রাম কয়খানি বীরচন্দ্রের প্রদত্ত। বালিকা মাঝে মাঝে বীরচন্দ্রের বাটীতে আসিত। এবং আসিলে বহুদিন ধরিয়া অবস্থিত হইত। এই সূত্রে নারায়ণীর সহিত তাহার বড়ই সদ্ভাব হইয়াছিল। বালিকার নাম ছিল জানকী। জানকী বহুদিন অনন্তপুরে আসে নাই। তাহার পিতা পরমানন্দ সিংহ রামচন্দ্রের সর্ব্বনাশসাধনে আনন্দদেবের সহায় ছিল। বীরচন্দ্র অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছিলেন, এ বিশ্বাসঘাতকতা কার্য্যে সেও কতকটা লিপ্ত ছিল।

বহুদিন দেখে নাই বলিয়া নারায়ণীর জানকীকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু পিতামহীর জন্য দেখিতে পায় নাই। ইদানীং নারায়ণী বাটী হইতে বড় বাহির হইত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আনন্দদেবের ইচ্ছা ছিল, রতন কোন মতে না অনন্তপুরে থাকিতে পায়। এইজন্য প্রথমেই সে রাজাকে এই সঙ্গীটী হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টায় ছিল। অন্য সঙ্গীতে তাহার বড় আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পুলীশ সাহেব বৃদ্ধকে পূর্ব্বে অনেকবার দেখিয়াছেন। তাহা হইতে যে ভয়ের কোনও কারণ থাকিতে পারে এটা তিনি স্বপ্নেও

বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কাজেই আনন্দদেবের প্রস্তাব তাঁহার কাছে উপহাস্ত হইয়াছিল। যাই হ'ক, কার্য্যতঃ আনন্দদেব রাজাকে রতন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। কিন্তু রতনকে নির্ব্বাসিত করিতে তাহার সাহসে কুলায় নাই।

ইহা ভিন্ন রাজাকে দেখিতে রতনের নিজের যদি কোন সময় ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে কোনও লোক তাঁহাকে বাধা দিতে সাহসী হইত না।

রতনকে এত ভয় কেন? স্বরাজ্যে সহস্র অনুচরমধ্যে অগণ্য রক্ষিসহায় রাজ-প্রতিনিধির এক সামান্য ব্রাহ্মণকে এত ভয় কেন?

ভয়ের অনেক কারণ ছিল প্রথম কারণ, রতন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। নিরীহ, মিষ্টভাষী, সদালাপী সদানন্দ পুরুষ। অনন্তপুরের আবাল-বৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে ভক্তি করিত। পরোপকারের জন্য তাহার জীবন উৎসর্গীকৃত। দ্বিতীয় কারণ, ব্রাহ্মণের বল গল্পের বিষয় ছিল। অনন্তপুরের অধিকাংশ সিপাহীই তাঁহার কাছে ব্যায়াম শিক্ষা করিয়াছিল। যাহারা নবাগত তাহারাও তাঁহার কার্য্যকলাপ অবগত হইয়া তাঁহাকে ভক্তি করিত। সুতরাং তাঁহার অঙ্গে হাত তুলিতে কে অগ্রসর হইবে? তৃতীয়—সরলহৃদয় ব্রাহ্মণ সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিতে পর্ব্বতের বাধাও গ্রাহ্য করিতেন না। হৃদয়ে ঐশ্বরিক বল, বিষয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্তি, কাঁদিবার কাঁদাইবার লোকাভাব, মৃত্যুভয়-রাহিত্য, এই প্রকার নানাবিধ অস্ত্রে সজ্জিত ব্রাহ্মণ অনন্তপুরের মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতেন।

ব্রাহ্মণ একেবারে যে ক্রোধশূন্য ছিলেন, এ কথা বলিতে পারি না। কখন কখন কোনও বিশেষ কারণে ব্রাহ্মণের ধৈর্য্য-চ্যুতির কথা শুনা গিয়াছে। আনন্দদেব একবার নিজেই দেখিয়াছিল, একজন বিপন্নকে রক্ষা করিতে ব্রাহ্মণ শতাধিক লোককে বিপন্ন করিয়াছিলেন। নখ হইতে মুখের কথাটি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের তীক্ষ্ণ অস্ত্রের কার্য্য করিয়াছিল। আনন্দদেব ইহাও দেখিয়াছে যে, ব্রাহ্মণ একবার ক্রুদ্ধ হইলে, সে ক্রোধ সহজে উপশমিত হইত না। ব্রাহ্মণের চপেটাঘাতে একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র প্রাণ দিয়াছে—অনন্তপুরের আবাল-বৃদ্ধবনিতা ইহাও বিশ্বাস করিত! সুতরাং এরূপ ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করিতে ভীরু দেওয়ান সাহসী হইত না। রতন কিন্তু বুঝিলেন, অনন্তপুরে থাকা আর অধিক দিন চলিবে না। অনন্তপুরের অবস্থা এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বাবস্থা যে আর ফিরিবে, এমন সম্ভাবনাও তিনি দেখিতে পাইলেন না।

রাজবাটীর পশ্চাৎ একটী ছোট বাগানের মধ্যে একটী পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া রতন তাহার মধ্যে অবস্থান করিতেন। রাজা তাঁহাকে একখানি পাকাবাড়ী করিয়া দিবার জন্য পঁচিশ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু রতন তাহা করিতে দেন নাই। পর্ণশালা হইলেও পরিচ্ছন্নতায় ও মনোহারিত্বে রতনের বাসস্থান রাজপ্রাসাদ হইতে যে কোনও অংশে হীন ছিল, তা বলিতে পারি না। দেখিলে স্থানটীকে একটী সিদ্ধাশ্রম বলিয়া ভ্রম হইত।

রতন একা। কিন্তু তাঁহার গৃহ সর্ব্বদাই বহুজনে পূর্ণ থাকিত। গ্রামের বালক, যুবা, বৃদ্ধ—সকলেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের

আশ্রমে যাতায়াত করিত। শাস্ত্রালাপে, সঙ্গীতে, হাস্য-কোলাহলে রতনের বাসগৃহ সর্ব্বদা এক অপূর্ব্ব সজীবতার পরিচয় প্রদান করিত।

বালকেরা আসিয়া রতনের বাড়ীর উঠানে কুস্তি শিখিত। যুবক কুস্তিগীর—রতনের শিষ্য সম্প্রদায়—শিক্ষকের কার্য্য করিত। রতন নিকটে একখানি চৌকিতে বসিয়া, তামাকু সেবন করিতে করিতে তাহাদের খেলা দেখিতেন; এবং প্রয়োজন হইলে দুই একটা ব্যায়াম-কৌশল বলিয়া দিতেন। বিশেষ প্রয়োজন হইলে কখন কখন নিজেও মাটী মাখিতেন।

রতনের আশ্রমের পার্শ্ব দিয়া সুবর্ণরেখা প্রবাহিতা। রাজা তাঁহার গৃহপার্শ্ববর্ত্তী সুবর্ণরেখাতলদেশ খনন করাইয়া গভীর করিয়া দিয়াছিলেন। ব্যায়ামান্তে সকলে সেইখানে স্নান করিত। তাহাদের স্নানকার্য্য একটা সমারোহ ব্যাপার। তাহাদের অঙ্গতাড়িত তরঙ্গোচ্ছ্বাসে নদীজলে গভীর আবর্ত্ত উপস্থিত হইত। শিলাময় তটভূমি বিদীর্ণ-প্রায় হইত।

রতনও তাহাদিগের সঙ্গে স্নান করিতেন। বহুক্ষণ ধরিয়া রতনের গাত্রমার্জ্জনকার্য্য চলিত। বালকসম্প্রদায় দশ পোনরজন এক সঙ্গে রতনের পৃষ্ঠে স্কন্ধে বাহুতে মুষ্ট্যাঘাত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। তাহাদের মুষ্টি বজ্রসম কঠিন হইবে এইজন্য রতন স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। কেহ এরূপ কার্য্যে ঔদাস্য দেখাইলে ওস্তাদের কাছে তিরস্কৃত হইত। বালকেরাও বুঝিত; কিছু কালের জন্য তাহাদের পাহাড়ের সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে। প্রথম প্রথম প্রহারান্তে বালকদিগকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইত। চূণহলুদের শ্রাদ্ধক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া

যখন তাহাদের হাতের ব্যথা মরিত, তখন তাহারা আবার পূর্ব্বানুরূপ প্রহারকার্য্যে নিযুক্ত হইত।

রতনের অঙ্গে প্রহার করিয়া যখন আর তাহাদের চূর্ণ হরিদ্রার প্রয়োজন হইত না—হস্তে কোনও রূপ যন্ত্রণা অনুভব করিত না, তখন তাহারা স্থির বুঝিত যে তাহাদের মুষ্টি-প্রহার পর্ব্বতগাত্রও চূর্ণ করিতে সমর্থ। ব্যাঘ্রাদি জন্তুর সম্মুখে পড়িলে মুষ্টিই তাহাদের আত্মরক্ষণোপযোগী মহাস্ত্র।

স্নানান্তে রতনের গৃহে জলযোগ রাশি রাশি ছোলা ও গুড়। জলযোগের পর সকলে আনন্দ করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিত। রতন এই সময় আহ্নিকাদি কার্য্য সমাপন করিয়া, রন্ধনের উদ্যোগ করিতেন। রাজবাটী হইতে প্রত্যহ বিশ জন লোকের যোগ্য সিঁধা আসিত। রতন একাই পাঁচ ছয় জনের যোগ্য আহার করিতে পারিতেন। রাজপ্রদত্ত একজন ভৃত্য ও একজন দাসী ছিল। সাকরেতদিগের মধ্যে কেহ কেহ গুরুর প্রসাদ পাইবার জন্য থাকিয়া যাইত। সময় বিশেষে প্রয়োজন হইলে আরও আহারীয় তিনি আনাইয়া লইতেন।

বিকালে রতনের সহচরগণ সিদ্ধি ঘুঁটিত, এবং সেই সঙ্গে সীতারামের জয়সঙ্গীতে সুবর্ণরেখাতটভূমি প্রতিধ্বনিত করিত। এই সময়ে গ্রামস্থ বৃদ্ধগণেরই সমাগম অধিক ছিল। তাঁহারা আসিয়া রতনের সহিত শাস্ত্রালাপে রত থাকিত। কেহ কেহ খোস গল্প করিত।

আর কেহ বড় একটা আসে না। আসিতে সাহস করে না। কিজানি কোন দিন আনন্দদেব দেখিবে, দেখিলে নাজানি

কি বিপদ ঘটিবে। ভয়ে আর বড় কেহ রতনের কাছে আসিতে চাহিত না! সকলেই জানিত, রতন আনন্দদেবকে দুচক্ষে দেখিতে পারিত না; সুতরাং রতনের কিছু করিতে পারুক আর নাই পারুক, যে রতনের সঙ্গে মিশিবে আনন্দদেব যে তাহার সর্ব্বনাশ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেহ আসিতে চাহিলে, রতন নিজেই তাহাকে আসিতে দিতেন না।

তাঁহার কুস্তির আখড়ায় বড় বড় তৃণগুল্ম জন্মিয়া বন হইয়াছিল, সিদ্ধির বাটীতে ছাতা ধরিয়াছিল,—বাহির হইতে তাঁহার ঘর দেখিলে লোক আছে এরূপ বোধ হইত না। সুবর্ণ-রেখা সঙ্গীহারা—সুতরাং উচ্ছাসশূন্যা—কুল কুল করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার উদ্যানের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইত। তাহাকে দেখিবার পর্য্যন্ত লোক ছিল না। আর সেরূপ ভারে ভারে তাঁহার গৃহে দধিদুগ্ধ-ঘৃত-আটা-তণ্ডুল নানাবিধ মিষ্টান্ন আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আনন্দদেব অবশ্য তাঁহার জন্য সিধা পাঠাইত। কিন্তু প্রায়ই তাহাতে রতনের পর্য্যাপ্ত হইত না। কখন কখন সিধা সময়ে উপস্থিত হইত না। ইতিমধ্যে দুই চারি দিন রতনের উপবাসে কাটিয়া গিয়াছে।

রাণী মধুমতী পূর্ব্বে ততটা রতনসম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিবার অবসর পান নাই। আনন্দের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহারও মনের অবস্থা কতকটা বিকৃত হইয়াছিল। অবশেষে একদিন নারায়ণীর মুখে ব্রাহ্মণের অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া ইদানীং প্রতিদিন সংবাদ লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সরকার হইতে আসিবার অপেক্ষা না করিয়া, তিনি ঘর হইতে প্রতিদিন

ব্রাহ্মণের আহার্য্য প্রেরণ করিতেন। নারায়ণী নিজে বসিয়া ব্রাহ্মণের আহারের পর্য্যবেক্ষণ করিত।

রতন ভাবিলেন, এরূপ করিয়াই বা আর কতদিন চলিবে। রাণী আপনাকে বঞ্চিত করিয়া যে তাহার অন্ন যোগাইতেছেন না, তাহাই বা কে বলিবে? নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছু বলিত না। রাণীর কাছে তথ্য জানিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। আনন্দময় রতন অল্পে অল্পে বিষাদকালিমায় আচ্ছন্ন হইতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্বশ্রী অল্পে অল্পে লোপ পাইতে লাগিল। অনন্তপুরের বায়ু এখন তাঁহার পক্ষে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

বহুদিন পরে রতনের অনন্তপুর ত্যাগে ইচ্ছা হইল। দ্বাদশ বৎসর তিনি এস্থান হইতে বাহির হন নাই। দুই একদিনের জন্য বাহিরে যাওয়া অবশ্য ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। এই সেদিন নারায়ণীর পাত্রানুসন্ধানে অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি আপনাকে গৃহ হইতে বহির্গত বিবেচনা করেন নাই। বহুকাল পরে তাঁহার প্রিয় পর্ণকুটীরটী ছাড়িবার অভিপ্রায় জাগিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু কেমন করিয়া যাইবেন? নন্দিনী বলিতে, সঙ্গিনী বলিতে, ক্রীড়ণক বলিতে একমাত্র যে নারায়ণী তাহাকে কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিবেন। পরিত্যাগের চিন্তায় ব্রাহ্মণ শিহরিয়া উঠিতেন। নারায়ণীকে পাত্রস্থা করিতে পারিলে, অবশ্য অনেকটা নিশ্চিন্ত হইবার কথা ছিল। কিন্তু নারায়ণীর যে বিবাহ হয়, এমনটা তাঁহার আর বিশ্বাস হইল না। কে আর নারায়ণীর বিবাহের উদ্যোগ করিবে? রাজার সঙ্গে

কথাবার্ত্তায় বুঝিয়াছেন, পাগলের সহিত তাঁর আর বিশেষ প্রভেদ নাই। নারায়ণীর ভবিষ্যৎ বুঝিয়া তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। কিন্তু অনন্তপুরে থাকা তাঁহার আর অধিক দিন চলিবে না। নিজে ইচ্ছা করুন আর নাই করুন, তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই ত্যাগ করিতে হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কিছুদিন ইতস্ততঃ করিয়া রতন অবশেষে রাণী মধুমতীর কাছে কথাটা পাড়িলেন। বলিলেন, আজ বাদে কাল মরিব, তখন তীর্থে মরিতে পারিলেই ভাল হয়। মধুমতী শুনিয়া বজ্রাহতের ন্যায় নিষ্পন্দ হইলেন। কিজন্য ব্রাহ্মণ বলিলেন, তিনি সমস্তই বুঝিয়াছিলেন। কিছুক্ষণের জন্য তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। নীরব, স্তম্ভিত—চক্ষু দিয়া কেবল জলধারা পড়িতে লাগিল। রতনও অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। রাণী যখন প্রকৃতিস্থা হইলেন, তখনও কোন কথা কহিতে পারিলেন না। কি বলিবেন? হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণের বর্ত্তমান অবস্থা তিনি ত বিলক্ষণই বুঝিতে পারিতেছেন। কোন প্রাণে তাঁহাকে আর থাকিতে অনুরোধ করিবেন? তাঁহাদের যা ঘটে ঘটুক, ব্রাহ্মণ তাঁহাদের স্বার্থপরতার জন্য কষ্ট পান কেন? কিন্তু এমন ব্রাহ্মণ যদি না রহিল, তবে অনন্তপুরে রহিল কি?

রাণী রতনকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন—"আপনি বসুন। আমি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।"

রাণী প্রস্থান করিলে, রতনের হৃদয়ে ঝড় বহিতে লাগিল। সংসার-বিরাগী ব্রাহ্মণ জীবনে কখন এরূপ আত্মহারা হন নাই। তাঁহার মনোরাজ্যে মুহূর্ত্তমধ্যে একটা বিপ্লব ঘটিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন—"করিলাম কি? রাণীর কাছে মনের অবস্থা প্রকাশ করিয়া কি বুদ্ধিমানের কার্য্য করিলাম? নিজের শক্তির উপরেই কি আমার বিশ্বাস আছে? আমি কি নারায়ণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব?"

রাণী বীরচন্দ্রের কাছে সকল কথা বলিলেন। রাজা উত্তর দিলেন—"দেব-হৃদয় ব্রাহ্মণকে আর আবদ্ধ করিও না।"

রাণী ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময় নারায়ণীকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। নারায়ণী নিদ্রিত ছিল। ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে বসাইয়া, আর একবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ পরে একটী রৌপ্যপাত্রপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে রক্ষিত হইল। রাণী স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন। নারায়ণীকেও প্রণাম করিতে বলিলেন।

দাদাকে প্রণাম করা তাহার জীবনে কখন অভ্যাস ছিল না। বরং তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আরোহণাদি কার্য্যেই সে অধিক আনন্দ বোধ করিত। সে কেমন অপ্রস্তুত হইয়া গেল। দাদার প্রতি এরূপ অভ্যর্থনা সে আর কখন দেখে নাই। নানারূপ গোলমালের মধ্যে পড়িয়া, সে অবশেষে পিতামহীর অনুরোধে প্রণাম করিল। অল্পক্ষণ পরেই রাজাও আসিলেন এবং ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন।

রতন বলিলেন—"একি!—এত স্বর্ণমুদ্রা কেন? এ আমি কি করিব?

রাজা বলিলেন—“মনে দ্বিধা করিবেন না। আমরা আপনার সন্তান। গ্রহণ না করিলে মর্ম্মব্যথা পাইব। তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে হইবে। বিদেশে পথে অর্থের নানা প্রয়োজন। পুত্রকন্যার প্রতি দয়া করিয়া গ্রহণ করুন।” বলিতে বলিতে বীরচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর ঝঞ্ঝাভিহতের ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল।

রতন এতক্ষণ কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়াছিলেন। এখন বালকের ন্যায় তিনিও কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—“মহারাজ! তোমরা যা ভাবিয়াছ—আমি তা নই। আমি আপনাকে এতদিন চিনিতে পারি নাই! এ বৃদ্ধ নারী হইতেও অধম। চিত্ত-সংযমে তাহার কিছুমাত্র শক্তি নাই। আমি নারায়ণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। তবে তীর্থে যাইবার মনন করিয়াছি। দিন কতক ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিব।

নারায়ণী এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। ব্যাপারটা কি সে ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। এখন বুঝিল দাদা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতেছে। বালিকাও আবেগপূর্ণহৃদয়ে বলিয়া উঠিল—“দাদা আমাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইবে?”

নারায়ণীর প্রশ্নে এবং রাজা ও রাণীর কথায় ভাবে রতন বুঝিলেন, পাষণ্ড আনন্দ নারায়ণীর জন্য একটী পরিচারিকা পর্য্যন্ত নিযুক্ত রাখে নাই!

ব্রাহ্মণের শোকাবেগ মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্রোধে পরিণত হইল। বলিলেন, “বৃদ্ধ হইয়াছি, কয়দিনই বা বাঁচিব? সুতরাং অপঘাত মৃত্যু হয়, তাও স্বীকার—অনন্তপুর ছাড়িবার পূর্ব্বে এর একটা ব্যবস্থা করিয়া যাইব।”

রাজা ও রাণী উত্তেজিত হইতে নিষেধ করিলেন। ব্রাহ্মণ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না—রাণীর প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া মুহূর্ত্তে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। পশ্চাতে আর নিরীক্ষণ করিলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যুষেই রতন গৃহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভাবিলেন, বিলম্ব করিলে ঘরের মায়া ত্যাগ করিতে পারিব না। তখন রাণী প্রদত্ত মোহর কয়টী গণিয়া দেখিলেন—দেখিলেন পাঁচশত। মুখে তাঁহার হাসি আসিল। বলিলেন, "মৃত্যুসৌধের প্রবেশদ্বার সমীপে আসিয়া রাণীর কৃপায় আমি ধনী হইলাম।"

বাস্তবিক রতনের এত ধনে কি হইবে? পথে ইহার শতাংশের একাংশও প্রয়োজন হয় কিনা সন্দেহ।

পথে বাহির হইলে তখন কোনও ব্রাহ্মণ অতিথির অন্নাভাব ঘটিত না। একবার "ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া হিন্দুগৃহস্থের দ্বারে দাঁড়াইলে, গৃহস্থ রাজোপচারে তাঁহার সেবা করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিত। যদিই বা অন্নের জন্য অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হইত, সামান্য খরচেই তাহা নিষ্পন্ন হইত। তখনকার দ্রব্যাদি আজি কালিকার মত দুর্ম্মূল্য ছিল না।

রতন থলিয়ার ভিতর হইতে পঁচিশটী মোহর গ্রহণ করিলেন। বাকী মোহর একটী থলিয়ার মধ্যে পুরিয়া জুনিয়ার মাকে ডাকিলেন। জুনিয়ার মা বহুকাল রতনের গৃহে চাকুরী করিতেছে। সকলেই চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে আর ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই।

জুনিয়ার মা আসিলে রতন থলিয়াটী তাহার হাতে দিবার উদ্যোগ করিলেন, বলিলেন, "ইহা তোর কাছে রাখিয়া দে।" ব্রাহ্মণ চিরদিনই রহস্য-প্রিয়। রহস্য করিবার অবকাশ পাইলে, তিনি প্রায়ই প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিতেন না।

জুনিয়ার মা থলিয়ার মূর্ত্তি দেখিয়া অগ্রাহ্য করিয়াই হাতে লইতে গেল। মূহূর্ত্ত মধ্যে হস্তচ্যুত হইয়া সেটা মাটিতে পড়িয়া গেল। অপ্রতিভ হইয়া বৃদ্ধা ব্রাহ্মণের মুখের পানে চাহিল।

রতন হাসিয়া বলিলেন, "উহার ভিতরে মোহর আছে, যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দে। আমি তীর্থ-পর্য্যাটনে বাহির হইব। যদি ফিরি, তবে আমাকে ফিরাইয়া দিস্। না ফিরি, এসমস্ত তোর হইল।"

কথাটা শুনিবামাত্র বৃদ্ধার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। "না ফিরি" এরূপ কথা সে ব্রাহ্মণের মুখে কখনও শুনে নাই। শুনিবার প্রত্যাশাও করে নাই। অনেক দিন সে ব্রাহ্মণকে ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে দেখিয়াছে, কিন্তু সে জানিত, আগের দিন ফিরিতে পারিলে, ব্রাহ্মণ সহস্র প্রলোভনেও পরদিন গৃহের বাহিরে থাকিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণের কুটীরপ্রিয়তা সে যত বুঝিয়াছিল, আর কেহ সেরূপ বুঝে নাই।

বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকে সে বড়ই ভক্তি করিত। অর্থ-প্রলোভনে সে পণ্ডিতজীর গৃহে দাসীত্ব করিত না। দুইবেলা এক মুঠা করিয়া আহারই তাহার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

আহারান্তে নির্জ্জনে বসিয়া যে সময় রতন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন, তখন কেবল জুনিয়ার মা তাঁহার নিকটে বসিয়া

ভক্তিগদ্‌গদ হইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিত। সেই জুনিয়ার মা ব্রাহ্মণের মুখে প্রথম এই "না ফিরি" কথা শুনিল।

পদতলে মোহরের থলিয়া পড়িয়া আছে, দরিদ্রা বৃদ্ধা তাহার দিকে লক্ষ্য করিবার অবকাশ পাইল না। বিস্মিত নেত্রে রতনের মুখের পানে চাহিল, বলিল—"তুমি কি আর আসিবে না?"

রতন। বাঁচিয়া থাকি, আসিব।

বৃদ্ধা। বুঝিতেছি, তুমি আর আসিবেনা।

রতন। বোধ হয় আসিতে পারিব না।

বৃদ্ধা। তা হ'লে আমার উপায় কি হবে?

রতন থলিয়ার মুখ খুলিয়া বৃদ্ধাকে মোহর গুলি দেখাইলেন। বলিলেন—"এই সম্পত্তি তোরই হইল। ইচ্ছামত ব্যবহার করিবি।"

মোহরের মূর্ত্তি দেখিয়াই বৃদ্ধা শোকতাপ ভুলিয়া গেল। থলিয়ার ভিতর হইতে গোটাকতক মুদ্রা বাহির করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল।

মুহূর্ত্তেই জুনিয়ার মা নিজের অবস্থার পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিয়া লইল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার বাঁচিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। সে ভাবিল—"পণ্ডিতজী ত ঘর ছাড়িয়া চলিল, আমি ত পারিব না। তখন, যাহাতে এ স্থানে চিরদিন সুস্থশরীরে এই সম্পত্তি ভোগ করিতে পারি, এই সময়ে তাহার ও একটা ব্যবস্থা করিয়া লই।" এই ভাবিয়া সে ব্রাহ্মণকে বলিল "ধন ত দিলে। কিন্তু আমার থাকিবার ব্যবস্থা করিলে কি?"

রতন তাহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন,—"কেন এই ঘরেই থাকিবি। আমি এ স্থানে যাহা যাহা রাখিয়া যাইতেছি, সমস্তই তোর হইল।"

বৃদ্ধা। খাইব কি?

রতন। খাইবার ভাবনাই যদি তোর রাখিয়া যাইব, তবে কিসের জন্য এত মোহর দিলাম। যখনই অভাব বুঝিবি, তখনই মোহর ভাঙ্গাইয়া খাইবি।

বৃদ্ধা অবাক হইয়া ব্রাহ্মণের মুখের পানে চাহিল। ব্রাহ্মণ বলে কি! তুচ্ছ দুই মুঠা চাউলের জন্য মোহর ভাঙ্গাইতে হইবে! বৃদ্ধা স্থির করিল. পণ্ডিতজী পাগল হইয়াছে।

সে পূর্ব্বে অনেক পাগল দেখিয়াছে। পাগল হইলে লোকের মুখচোখের ভাব কিরূপ বিকৃত হয়, তাহাও সে অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছে। তাই সে স্থির হইয়া ব্রাহ্মণের মুখ চোখের পরিবর্ত্তন অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

রতন বৃদ্ধার মুখের ভাব দেখিয়া হাসিলেন। বুঝিলেন, এত অধিক ধন পাইয়া বুড়ী বড়ই বিপদে পড়িয়াছে। হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ করিয়া মুখের পানে কি দেখিতেছিস্?"

বৃদ্ধা তবু কথা কহে না। সে অনেক চেষ্টাতেও ব্রাহ্মণের মুখে চক্ষে উন্মত্ততার লক্ষণ খুঁজিয়া পাইল না। যে হাসি যে কথা বৃদ্ধার অশান্ত মনকে অনেক সময় প্রফুল্ল করিয়াছে, আজিও সে ব্রাহ্মণের মুখে সেইরূপ স্নিগ্ধ মধুর হাসি দেখিল, মৃদু মধুর বাক্য শুনিল। বৃদ্ধা এবার কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—"তুমি কি সত্য সত্যই ফিরিবে না?"

রতন। ফিরিবার ইচ্ছা আছে। তবে অনেক তীর্থে ঘুরিব—অনেক বয়স—যদি মরিয়া যাই!

পণ্ডিতজীর মরণের কথা চিন্তা করিতেও জুনিয়ার মার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। বলিল "না, যেমন করিয়া পার ফিরিয়া আইস।"

রতন। সে পরের কথা। এখন এই মোহরগুলি তুই গ্রহণ কর্। এ গুলি তোরই হইল জানিয়া রাখ্।—তুই ইচ্ছা-মত ইহার ব্যবহার করিবি।

বৃদ্ধা। তুমি কবে রওনা হইবে?

রতন। কবে কি? আজ—এখনি।

এই বলিয়াই ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। জুনিয়ার মাও মোহরের থলিয়া লুকাইতে চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণের ফিরিতে বিলম্ব হইল না। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, জুনিয়ার মা চলিয়া গিয়াছে। ঘরে সন্ধ্যা দিবার কথা, প্রতিদিন গৃহটী পরিষ্কার রাখিবার কথা, তুলসীমঞ্চে জল দিবার কথা,—আরও দুই চার কথা. যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে উপদেশ দিয়া যাইবেন, এইজন্য তিনি বৃদ্ধাকে আর এক-বার ডাকিলেন। উত্তর পাইলেন না। আবার ডাকিলেন। বাটী জনশূন্য বলিয়া বোধ হইল। আর জুনিয়ার মার অপেক্ষা সহিল না।

তখন মোহর কয়টী গেঁজিয়ার মধ্যে পূরিয়া তিনি কোমরে বাঁধিলেন। তারপর একটী কাপড়ের পুঁটুলি, একটী কমণ্ডলু, একখানি মৃগচর্ম্ম ও একগাছি বাঁশের লাঠি লইয়া, দুর্গাস্মরণ করতঃ ব্রাহ্মণ বহুদিনের প্রিয়সঙ্গী গৃহটীকে বুঝি জন্মের মত পরিত্যাগ করিলেন!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে, জুনিয়ার মা মনে করিল, "এই অবকাশে মোহর গুলা লুকাইয়া আসি।" তাহার ইচ্ছা ছিল, কিছুদূর সে ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। এদিকে রাশীকৃত ধন পাইয়াছে, ওদিকে অমূল্য রত্নসদৃশ পণ্ডিতজীকে সে হারাইতে বসিয়াছে। আনন্দ প্রকাশ করিবে কি কাঁদিবে, বৃদ্ধা স্থির করিতে পারিতেছিল না। তাই সে মনে করিল, মোহর কয়টা আপাততঃ একটু নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসি। রাখিয়া, ব্রাহ্মণের সঙ্গে যতদূর পারি যাই। ফিরিয়া দেবতায়ও না জানিতে পারে, এমন স্থানে মোহর লুকাইয়া রাখি।

বৃদ্ধার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল না। ধন লুকাইয়া রাখা সে যতটা সহজ মনে করিয়াছিল, কার্য্যে তাহার বিপরীত দেখিল। প্রথমে সে নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সেখানে সে মনোমত স্থান খুঁজিয়া পাইল না। ঘরের এক কোণে ঘুঁটে রাখিবার একটী জালা ছিল। অন্য কোথাও রাখিতে সাহস না করিয়া, বৃদ্ধা সেই জালাটার ভিতর হইতে যা কিছু ছিল বাহির করিয়া লইল। পরে অতি ধীরে, পাছে ঘরের ভিতরের পিপীলিকাটী পর্য্যন্ত জানিতে পারে, এইরূপ-ভাবে মোহরের থলিয়াটী তাহার ভিতরে ন্যস্ত করিল,—অতি সাবধানে মুখে সরা চাপা দিল। তবু যেন মনঃপুত হইল না। তাহার বোধ হইল যেন মোহরগুলা দেখা যাইতেছে। ভ্রম

মনে করিয়া সে একবার চক্ষু মুছিল। দেখিল মোহরগুলা জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে।

এমন সময় পণ্ডিতজীর কথা তাহার কাণে গেল। কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া, সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে, যেখান হইতে পারিল সেইখান হইতেই, কাঁথা, কাপড়, থলিয়া, মৃগচর্ম্ম—শেষ হাঁড়ি, ভাঁড়, মাটী—যেখান হইতে যাহা আনিতে পারিল, তাই দিয়া জালা ঢাকিতে লাগিল। কিন্তু যতই বৃদ্ধা মোহরগুলাকে আবৃত করিবার চেষ্টা করে, ততই সেগুলা যেন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়ে।

ক্রমে জানালা, দেওয়াল, দরজা, ঘরের চাল—বুড়ীর চক্ষে সমস্তই যেন স্বচ্ছ, সমস্তই যেন ফাঁকা দেখাইতে লাগিল। ভয়ে ভয়ে বৃদ্ধা মোহর বাহির করিল। দুইহাতে বুকে চাপিয়া বাহিরে আসিল। দেখিল পণ্ডিতজী চলিয়া গিয়াছে।

সন্দেহ দূর করিবার জন্য দুই একবার সে "পণ্ডিতজী—পণ্ডিতজী" বলিয়া ডাকিল। উত্তর পাইল না। ব্রাহ্মণের ঘর খুঁজিল। দেখিতে পাইল না। পা টিপিয়া দরজার কাছে গেল। সাবধানে শুধু মুখটী বাহির করিয়া সুবর্ণরেখার তীরস্থ পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল—যতদূর দেখা যায় দেখিল। দেখিল রাজপথে জনপ্রাণী নাই। বৃদ্ধা দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

বৃদ্ধা এইবারে যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। ভাবিল, মনোমত স্থান সন্ধান করিয়া এইবারে মোহরগুলিকে লুকা-ইতে পারিব। ব্রাহ্মণের গৃহের সম্মুখে একটী তুলসী মঞ্চ। তাহার নিকটবর্ত্তী অনেকটা স্থান বাঁধান। সেখানে বসিলে বাড়ীর সমস্ত অংশই দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধা মোহরগুলি

ব্রাহ্মণের ঘরের মধ্যে রাখিয়া সেখানে বসিল। বসিয়া কাঁদি-বার উদ্যোগ-আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল।

বৃদ্ধার ত্রিসংসারে কেহ ছিল না। জুনিয়া বলিয়া একটী-মাত্র কন্যা ছিল। সেটী বিশ বৎসর পূর্ব্বে মারা পড়িয়াছে। সুতরাং এত ধন লইয়া বৃদ্ধা কি করিবে? তাই আজ বিশ বৎসর পরে সে কন্যার অভাব অনুভব করিল। বাঁচিয়া থাকিলে জুনিয়া এক সঙ্গে এত মোহর দেখিতে পাইত। মোহর গুলি দেখাই বৃদ্ধা চরম উপভোগ মনে করিয়াছিল। জুনিয়া বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকেও স্পর্শ করিতে দিত না। তথাপি বৃদ্ধার জুনিয়াকে মনে পড়িল। এবং সেইজন্য যেটুকু চক্ষুজল নিক্ষেপের প্রয়োজন, তাহা সম্পন্ন করিতে সে কিছুমাত্র ত্রুটী করিল না। নিকট হইতে একখানা পিঁড়ি লইয়া, একখানা কাঁথা গায়ে দিয়া, বুড়ী কাঁদিতে বসিল।

কিন্তু বিধাতা তাহাকে কাঁদিতে দিল না। কাঁদিবার উপ-ক্রমটী করিয়াছে মাত্র, এমন সময় বুড়ীর বোধ হইল, যেন কে সদর দরজার কড়া নাড়িতেছে। চুপ করিয়া বুড়ী কাণ পাতিয়া রহিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল, বুঝিল বাতাসের কার্য্য। এমন অসময়ে রহস্য করিবার জন্য বাতাস কতকগুলা গালি খাইল। এবার বুড়ী নীরবে কাঁদিবার ব্যবস্থা করিল। এ সময় চীৎকার করাটা বুদ্ধিমতীর কার্য্য নয়। বুদ্ধিমতী জুনিয়ার মা আর কোনও মতে কণ্ঠ হইতে শব্দ বাহির হইতে দিল না। যদিই বা ফাঁকে ফুঁকে দুই একটা কথা গলা ছাড়াইবার উপক্রম করিল, অমনি সে হাতে মুখে চাপিয়া, দাঁতে পিশিয়া, তাহাদের বিনাশ সাধন করিতে লাগিল। পাছে কেহ বাহির

হইতে কথা শুনিতে পায়,—পাছে কেহ বাড়ীতে আসিয়া তাহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করে।

অতি সন্তর্পণে জুনিয়ার মা শোকাবেগ কার্য্য নিষ্পন্ন করিল। তারপর আবার পুঁটলি বুকে করিয়া বসিল। বুড়ী কোথায় যে মোহর লুকাইবে, তাহা এখনও স্থির করিতে পারে নাই। ভাবিল দিনটা যে কোন প্রকারে কাটাইয়া দিই। রাত্রে এর যাহ'ক একটা বিলি ব্যবস্থা করিব।

সহসা বিষম লোককোলাহল তাহার কাণে গেল। বৃদ্ধা শুনিতে পাইল, কাছারী বাড়ীর নিকটে একটা বিষম গোলমাল বাধিয়াছে। বৃদ্ধা স্থির করিল, এ আর কিছু নয়, পণ্ডিতজী ঘরে নাই জানিয়া, তাহার মোহরের গন্ধে সিপাহীগুলা তাহার ঘর লুটিতে আসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি, যেখানে যা পাইল পাথর, ইট, কাঠ দরজায় চাপা দিতে আরম্ভ করিল। এদিকে কোলাহলে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ হইয়াছে। জুনিয়ার মা দেখিল, রাজবাটীর ছাদে—রাজা, রাণী ও রাজকুমারী তিন জনেই উদ্‌গ্রীব হইয়া কি দেখিতেছেন।

বৃদ্ধার আর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। সে থলিয়া লইয়া ব্রাহ্মণের ঘরে প্রবেশ করিল। কবাট বন্ধ করিল। এবং মোহরের থলিয়া বুকে করিয়া, জীবনে প্রথম, স্বেচ্ছায় উপবাসব্রত গ্রহণ করিল।

মোহর কয়টী দিয়া, যথার্থই ব্রাহ্মণ প্রভুপরায়ণা পরিচারিকার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

ঘর হইতে বাহির হইয়াই রতন ভাবিলেন—"একবার দুষ্ট দেওয়ানকে দেখিয়া যাই। এই স্থির করিয়া তিনি কাছারী বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। ইংরাজের অধীনে আসিয়া অভ্যাগত সাহেবদিগের অভ্যর্থনাদির জন্য রাজা সাহেবীধরণে অট্টালিকাটী নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। এখন ইহার নিম্নে কাছারী হয়, উপরে আনন্দদেব পরিবার লইয়া বাস করেন। সাহেবদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র আবাস-স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। কাছারী বাড়ীর পূর্ব্বে কালাবাঁধ বলিয়া একটী প্রকাণ্ড দিঘী। তাহার পূর্ব্বে ঠিক কাছারী বাড়ীর পরপারে রামবাগ বলিয়া উদ্যান। তাহার মধ্যে সুনির্ম্মিত একখানি বাঙ্গলা। সাহেবেরা এখন সেই স্থানে আসিয়াই থাকেন।

কাছারী বাড়ীর পশ্চিম প্রায় দুই রশী দূরে সুবর্ণরেখাতীরে রাজপ্রাসাদ। রতনের ঘরখানি রাজবাটীর সংলগ্ন একটী অনতি-বৃহৎ উদ্যানের পশ্চাতে। তাঁহার ঘরের দিকের প্রাচীরে একটী দ্বার ছিল। রাজার সহিত সাক্ষাতের সময়, কিম্বা কাছারী বাটীতে যাইবার সময় ব্রাহ্মণ সেই দ্বার দিয়া বাগান পার হইয়া যাইতেন। তখন কাছারী বাড়ী তাহার ঘরের অতি নিকটে ছিল। এখন কিন্তু তাহা অনেক দূর হইয়া পড়িয়াছে। আনন্দদেব সেই দ্বারটী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। পাছে তাঁহার অলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসে।

আজকাল তাঁহাকে সুবর্ণরেখার তীরস্থ পথ ধরিয়া কিছুদূর উত্তর মুখে যাইতে হইত। তারপর রামবাগ বেড়িয়া উজান বাহিয়া, কাছারী বাড়ী ও রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইতে হইত। পূর্ব্বে রতন অন্তঃপুরদ্বার দিয়া রাজগৃহে প্রবেশ করিতেন। এখন সিংহদ্বার ভিন্ন গৃহে প্রবেশের অন্য পথ ছিল না। সেখানে যে সমস্ত দ্বারবান ছিল, তাহারা আনন্দদেবের চরের কার্য্য করিত।

সুতরাং গত রাত্রিতে রতনের রাজবাটীতে আগমন ও বহুক্ষণ অবস্থান রাত্রি মধ্যেই আনন্দদেবের কাণে উঠিয়াছে। আনন্দদেব আরও শুনিয়াছেন, একটা থলিয়ার মধ্যে কি জানি কি দ্রব্য লইয়া, রতন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন।

চিন্তায় সমস্ত রাত্রি আনন্দদেবের নিদ্রা হয় নাই। ব্রাহ্মণকে ভয় করিলেও আনন্দদেব মনে মনেও তাহাকে ঘৃণা করিতে সাহস করিতেন না। ব্রাহ্মণের নিস্পৃহতা তাঁহার অবিদিত ছিল না। প্রয়োজন সাধনের জন্য তিনি নিজেই কতবার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছেন। বহু অর্থে ব্রাহ্মণকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চেষ্টায় ফল হয় নাই। সেই ব্রাহ্মণ থলিয়া করিয়া আনিল কি? সম্ভবতঃ মুদ্রা। মুদ্রার বৈদ্যুতিক শক্তি আনন্দদেবের অপরিজ্ঞাত ছিল না। আনন্দদেব জানিতেন, যে মুদ্রার সহায়তায়, ভিখারী হইয়াও তিনি আজ রাজার তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই মুদ্রার সাহায্যে বুদ্ধিমান বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ না করিতে পারে কি? বিশেষতঃ অগ্রে কোনও সংবাদ না দিয়া রাঁচি হইতে জয়েন্ট সাহেব একজন বন্ধু লইয়া, গতরাত্রে অনন্তপুরে আসিয়াছেন।

অবশ্য চরের সাহায্যে আনন্দদেব জানিয়াছেন যে, সাহেবদের সহিত রতনের সাক্ষাৎ হয় নাই। তথাপি দেওয়ান বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় সমস্ত রাত্রি বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়াছেন।

শেষরাত্রে যখন মুকুন্দ আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল, যে সাহেবেরা মৃগয়ার জন্য অনন্তপুরে আসিয়াছে, তখন কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া দেওয়ান একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। তন্দ্রাটী আসিয়াছে; এমন সময় বাহিরে একটা বিষম কোলাঁ হল, তাঁহার আগমনোন্মুখী নিদ্রাকে একেবারে বৈতরণী পার করিয়া দিল।

সভয়ে আনন্দ শয্যা ত্যাগ করিলেন। কোলাহলের কারণ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া জানালার কাছে ছুটিলেন। কিছু দেখিতে পাইলেন না। মুকুন্দকে ডাকিলেন, উত্তর পাইলেন না। পর প্রকোষ্ঠে যাইয়া মুকুন্দের সন্ধান করিলেন। দেখিলেন, মুকুন্দ নাই। প্রাণপণ চীৎকারে ভৃত্যদের ডাকিলেন। কোনও ভৃত্য উত্তর দিল না। কোলাহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আনন্দদেবের বোধ হইল অনন্তপুরের গগন কি যেন এক অলৌকিক ভীমনাদে আলোড়িত হইতেছে। তিনি পুনরায় জানালার নিকটে গিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন। দেখিলেন জনস্রোত সুবর্ণরেখার তীরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে! ভয়ে তিনি জানালা বন্ধ করিলেন। দ্বারের কবাট বন্ধ করিতে যাইতেছেন এমন সময় স্ত্রী ও পুত্রবধূ অন্তঃপুর হইতে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিল।

স্ত্রীকে তদবস্থায় দেখিয়া সভয়ে আনন্দদেব জিজ্ঞাসা করিলেন —“ব্যাপার কি!”

নবম পরিচ্ছেদ

স্ত্রী বলিল—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মুকুন্দ বুঝি নাই।"

পুত্রবধূ জানকী সকরুণ চীৎকার করিয়া উঠিল।

স্ত্রী আবার বলিল—ব্রাহ্মণ রতন তাহাকে হত্যা করিয়াছে।

মূর্চ্ছিতপ্রায় আনন্দদেব ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। সহসা একজন ভৃত্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং ভূপতিত প্রভুকে দেখিয়াই, সত্বর তাঁহাকে স্থানত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল। বলিল—"এখনি ঘর ছাড়িয়া পালান। নইলে প্রাণে বাঁচিবেন না। ব্রাহ্মণ এই দিকেই আসিতেছে।"

মৃত্যুর আশঙ্কায় দেওয়ান তখনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভুকে সাবধান করিয়া ভৃত্যও ফিরিয়া চলিল। একবার মাত্র আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুকুন্দ?"

ভৃত্য। সাহেবেরা তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে।

সংবাদ দিয়াই আত্মরক্ষার্থ সে দ্রুতবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এদিকে বাহিরের কোলাহল কাছারী বাড়ীর ভিতরে আসিয়াছে। আনন্দ পত্নীকে বলিলেন—"ব্যাপার বুঝিতেছ না? পালাও।"

আনন্দপত্নী পুত্রবধূর হস্ত ধরিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে ছুটিল। বিপদে জ্ঞানশূন্যা, স্বামীর ভবিষ্যৎ ভাবিবার আর অবকাশ পাইল না।

আনন্দদেবের বোধ হইল, তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য যেন চারিদিক হইতে নরঘাতক তাঁহার গৃহাবরোধ করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। এরূপ অবস্থায় পলায়ন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বাহির হইবার জন্য ঘরের চৌকাটে যেই পা দিয়াছেন

অমনি সোপানে অসংখ্য পদশব্দ শ্রুত হইল। তাঁহার হস্তপদ অবশ হইয়া আসিল। তিনি বুঝিলেন, বাহির হইলেই নবু-ঘাতকের সম্মুখে পড়িব। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি পর্য্যঙ্কতলে আত্মগোপনের উদ্যোগ করিলেন। বিপদে আত্মহারা --দ্বাররোধ কার্য্যটা পর্য্যন্ত তাঁহার মনে আসিল না।

বিভীষিকায়, ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় আনন্দ নিজের শারীরিক অবস্থার কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দেহ বহুকাল হইতে কতকগুলা অপ্রয়োজনীয় মাংসরাশির অপ্রীতিকর ভারবহন করিয়া আসিতেছে। ভুলিয়া গিয়াছেন, যে এই অযথা-সঞ্চিত মাংসরাশি তাঁহার দেহের সর্ব্বাংশে সমানুপাতে বিন্যস্ত ছিল না,—কোথাও কোথাও অল্প,বা অধিক ছিল। এটাও বুঝিতে পারেন নাই, তলদেশে প্রবেশ মুখে পর্য্যঙ্ক তাঁহার অনধিকার প্রবেশের ন্যায়-সঙ্গত প্রতিবাদ করিতে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ।

যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল। অর্থাৎ পর্য্যঙ্কতলে অতি আগ্রহে প্রবেশ করিতে গিয়া, আনন্দদেবের সেই বিশাল অঙ্গ মধ্যভাগে আবদ্ধ হইয়া গেল। মস্তক ও স্কন্ধের কিয়দংশ পর্য্যঙ্কের নিম্নে স্থান পাইল। অঙ্গের অবশিষ্টাংশ বাহিরে পড়িয়া রহিল।

নিরুপায় আনন্দদেব, কুক্কুরতাড়িত ধৃতপ্রায় ক্লান্ত শশকের ন্যায়, অর্দ্ধ-লুক্কাইত দেহে চক্ষু মুদিয়া, আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সাহেব দুইজনের মধ্যে যিনি রাঁচির জয়েণ্ট ম্যাজিষ্টেট, তাঁহার নাম হার্‌লি, সহচরের নাম ব্রাউন। হার্‌লি পাঁচ বৎসর এদেশে আসিয়াছেন। ব্রাউন নবাগত। তিনি সম্ভ্রান্ত-বংশীয়। বিলাতের জনৈক লর্ডের ভাগিনেয় ও উত্তরাধিকারী। তাঁহার পিতৃব্য সে সময় ছোটনাগপুরের কমিশনর। হিন্দুস্থান দেখিবার অভিলাষে, অতি অল্পদিন হইল তিনি এদেশে আসিয়াছেন। আসিয়া পিতৃব্যের গৃহেই অতিথি হইয়াছেন। মৃগয়া-ব্যপদেশে হার্‌লির সহিত তাঁহার অনন্তপুরে আগমন।

যে সময় রতন গৃহত্যাগ করিয়া কাছারী বাড়ীতে আসিতেছিলেন, তাহার অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই ব্রাউন শয্যাত্যাগ করিয়াছেন; হার্‌লি তখনও নিদ্রিত।

ব্রাউন শয্যাত্যাগ করিয়া বাঙ্গলাসংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে বিচরণ করিতেছিলেন। সেইস্থান হইতে সুবর্ণরেখাতীর পর্য্যন্ত একটী বিশাল তৃণ প্রান্তর। মাঝে কেবল একটী প্রকাণ্ড বটগাছ।

সুবর্ণরেখার পরপারে, অনন্তপুর হইতে প্রায় একক্রোশ দূরে, একটী অনতিউন্নত অধিত্যকা ভূমি হইতে জনার সেই বহুযোজনব্যাপী জঙ্গলের আরম্ভ। ছোট বড় শালগাছ বুকে লইয়া, স্তরে স্তরে উন্নত সেই বিশাল অরণ্য, স্থিরতরঙ্গবক্ষ মহা-সিন্ধুর ন্যায় অনন্ত আকাশ নীলিমাকে আলিঙ্গন করিতেছিল; মাঝে মাঝে দুই চারিটী পাহাড় নোঙ্গরে আবদ্ধ ধূসরবর্ণ জাহাজের ন্যায় সেই শ্যাম সমুদ্রে ভাসিতেছিল। বাগানে বেড়াইতে

বেড়াইতে ব্রাউন সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব মহান অরণ্যের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

এমন সময়ে রতন সুবর্ণরেখার তীরভূমি পরিত্যাগ করিয়া প্রান্তরে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার মাথায় উষ্ণীষ, গায়ে বেনিয়ান, পরিধান মালকোচা করা ধুতি, পায়ে নাগরাজুতা, এবং হস্তে তৈল-নিষেকোজ্জ্বল-লোহিতাভ বংশযষ্টি। বহুদিন হিন্দুস্থানীদের সংশ্রবে থাকিয়া তাঁহার আচার ব্যবহার অনেকটা তাহাদেরই মতন হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাসিতেন। ঘরে থাকিলেও তিনি কখন মলিন বস্ত্র পরিধান করিতেন না।

প্রান্তরে আসিয়াই রতন সর্ব্বাগ্রে বটবৃক্ষের সমীপস্থ হইলেন, এবং তাহার একটী ভূমিলগ্ন শাখায় কমণ্ডলু, মৃগচর্ম্ম, কাপড়ের পুঁটুলি ও লাঠি গাছটী রক্ষা করিলেন, এবং রিক্তহস্তে কালাবাধের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কাছারী বাড়ীতে যাইতে হইলে, বরাবর পূর্ব্বমুখে সরোবরের তীর ধরিয়া, বাঙ্গলাকে পশ্চাতে রাখিয়া, আবার তাঁহাকে পশ্চিম-মুখী হইতে হইবে।

পূর্ব্বমুখে ফিরিতে রতনের মুখে প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ পতিত হইল। তাঁহার কষিত-কাঞ্চনোজ্জ্বল বর্ণ বয়সের আধিক্যে গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার বিশাল বক্ষ, অত্যুন্নত দেহ, সৌম্য ও ধীরতাব্যঞ্জক মুখশ্রী, পক্বকেশ-মণ্ডিত শুভ্র মস্তক, মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্রাউনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। প্রান্তরপথে চলিতে চলিতে মন্থরগামী বৃদ্ধ, সুশুভ্র পরিচ্ছদে অরুণ কিরণে প্রতিফলিত হইয়া, গতিশীল কাঞ্চনজঙ্ঘার ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।

জনার জঙ্গলের শোভা দেখিতে দেখিতে ব্রাউনের ভাব-রাজ্যে একটা তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। অরণ্যের বিশালতায় আপনাকে নিক্ষেপ করিয়া, তন্ময় যুবক সেই দূরদেশ হইতেই ধ্যান-মগ্ন যোগীর ন্যায় আত্মবিস্মৃতির সুখে মুহুর্ম্মুহু আন্দোলিত হইতে-ছিলেন। জীবনটা তাঁহার, স্বপ্নকুহেলিকাবৃত ফুলরাশির ন্যায়, তাঁহার মনশ্চক্ষুর উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে রতনের দিব্যমূর্ত্তি, একাধার-নিবিষ্ট পুষ্পগুচ্ছের ন্যায়, তাঁহার স্বপ্নাবিষ্ট দৃষ্টির উপর সহসা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। ব্রাউনের বোধ হইল, যেন পশ্চিমাকাশ হইতে ভূতলাবতীর্ণ প্রভাতারুণ স্নাত দেবদূত প্রান্তরে বিচরণ করিতেছে। বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তিনি হার্‌লিকে ডাকিলেন। হার্‌লি তখনও ঘুমাইতেছিলেন। ঘুমাইতে ঘুমাইতে, তিনি এজলাসে বসিয়া এক বৃদ্ধ বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে, শুদ্ধমাত্র বলিষ্ঠতার অপরাধে, কিছু কালের জন্য শ্রীঘরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। এমন সময় সহ-চরের কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

চোখ মুছিতে মুছিতে হার্‌লি বাহিরে আসিলে, ব্রাউন তাহাকে ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া বলিলেন—"দেবদূত দেখিয়াছ?"

দেবদূত দেখিয়াই হার্‌লি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।—বলিলেন—"কিছুদিন এদেশে থাকিয়া, এ স্থানের জলবায়ুতে অভ্যস্ত হইয়া নেটিভ দেখিবার চক্ষু প্রস্তুত কর। তারপর উহার পানে চাহিও। দেখিবে উহার মূর্ত্তি কত কুৎসিৎ!"

ব্রাউন এ সকল কথার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন—"চক্ষুর কি অবস্থা হইলে এরূপ সুন্দর কুৎসিত দেখায়!"

এদিকে দীঘীর পাড়ের আড়ালে পড়িয়া, রতন সাহেবদিগের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ব্রাউনের হাত ধরিয়া হার্‌লি তাঁহাকে বাঙ্গলার ভিতর লইয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে ব্রাউন একবার ফিরিলেন—ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন না। হার্‌লির কথায় তাঁহার মনটা বড়ই বিষণ্ণ হইয়া গেল। তথাপি ব্রাহ্মণ যে ছবি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, সেটী আর বিলুপ্ত হইল না।

এদিকে রতন ধীরে ধীরে কাছারী বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। মুকুন্দও সেইপথ দিয়া সাহেবদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিল। আসিতে আসিতে সম্মুখে দেখিল রতন। মুকুন্দের মুখ শুকাইয়া গেল। দেওয়ানের কথা জানিবার জন্য রতন তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন।

এমনি সময়ে চারিজন সিপাহী, কাছারীর কাজে, সেই পথ ধরিয়া কোথায় যাইতেছিল। দেখিল, মনিবের সম্মুখে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রতন। কৌতূহল পরবশ হইয়া তাহারা উভয়ের নিকটে আসিল। প্রত্যেকেরই হস্তে একগাছি করিয়া দীর্ঘ যষ্টি ছিল। যষ্টি স্কন্ধন্যস্ত করিয়া তাহারা মুকুন্দের পার্শ্বে দাঁড়াইল।

সিপাহীদের দেখিয়া মুকুন্দের সাহস ফিরিল। ভাবিল—"ব্রাহ্মণকে নিজের শক্তি দেখাইবার এই একটী শুভ অবকাশ। ব্রাহ্মণ কথায় কথায় আমার ও আমার পিতার অপমান করিত। আমিই বা এই অবকাশ ছাড়িব কেন।" ব্রাহ্মণ সমীপস্থ হইবা মাত্র রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি চাও।" রতনের সম্মুখে মাথা তুলিয়া মুকুন্দ জীবনে এই প্রথম কথা কহিল।

স্বরের রুক্ষতায় রতন বিরক্ত হইলেন। তথাপি সাবধানে

মনোভাব গোপন করিয়া উত্তর দিলেন—"তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।"

মুকুন্দ পূর্ব্ববৎ রুক্ষস্বরে রতনকে বুঝাইল, তাহার পিতার ন্যায় মাননীয় ব্যক্তির সহিত, রতনের ন্যায় দরিদ্র ভিক্ষুকের সাক্ষাতের অভিলাষ ধৃষ্টতা। মুকুন্দের বড়ই ধৈর্য্য যে, বৃদ্ধের ধৃষ্টতার শাস্তি না দিয়া, সে এখনও পর্য্যন্ত তাহার অসভ্য-জনোচিত মূর্ত্তি সম্মুখে অবস্থিত হইতে অনুমতি প্রদান করিয়াছে। রুক্ষতর স্বরে মুকুন্দ বৃদ্ধকে স্থানত্যাগ করিতে আদেশ করিল।

সিপাহীগণও বৃদ্ধের আগমন প্রভুর অপ্রীতিকর বুঝিয়া, তাহাকে গমনে বিরত করিতে অগ্রসর হইল। ইহাদের মধ্যে একজন রতনকে বহুকাল হইতে জানিত। অপর তিনজন নবাগত। তাহারা একেবারে রতনের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, এরূপ করিলে বৃদ্ধ ভয়ে আপনা হইতেই স্থানত্যাগ করিবে।

রতন কিন্তু প্রতিনিবৃত্ত হইতে আসেন নাই। সুতরাং মুকুন্দের রূঢ় আদেশবাক্য ও সিপাহীদিগের বীরত্ব কার্য্যকর হইল না। বৃদ্ধ বরং মুকুন্দের দিকে অগ্রসর হইবার ভাব দেখাইল।

পরিচিত সিপাহী ভাবিল, গতিক ভাল নয়। অপর সিপাহীরা স্থির করিল বৃদ্ধ উন্মাদ। মুকুন্দ বুঝিল, ব্রাহ্মণ কি একটা কাণ্ড করিতে আসিয়াছে। তথাপি সাহসে ভর করিয়া বলিল—"বৃদ্ধ, যদি মঙ্গল চাও, তাহা হইলে এই দণ্ডেই স্থান ত্যাগ কর।

রতন দেখিলেন মিষ্টবাক্যে কার্য্য হইবে না, তাহাতে বৃথা সময় নষ্ট। অগ্রসর হইয়া তিনি একেবারে মুকুন্দকে ধরিয়া ফেলিলেন। সিপাহীগণ হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল।

রতন তাহাদের চীৎকার কাণে তুলিলেন না। একজন সিপাহী ছুটিয়া রতনকে ধরিল। রতন ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। কিঞ্চিৎ বল প্রয়োগে মুকুন্দকে দাঁড় করাইয়া. ঈষৎ গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"মূর্খ! স্থানত্যাগ করিবার জন্য আমি সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এতটা পথ আসি নাই। তুমি যদি মঙ্গল চাও,—তোমার পিতা যদি মঙ্গল চায়, তাহা হইলে আমাকে তাহার কাছে লইয়া চল।"

তখন মুকুন্দ প্রকৃতিস্থ হইল। রতনের প্রকৃত মূর্ত্তি তাহার চক্ষে প্রতিভাত হইল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, বাগ্‌রহিত মুকুন্দ কাতর নেত্রে প্রহরীদিগের পানে চাহিল। প্রভুকে অপমানিত দেখিয়া সিপাহীগুলা রতনকে আক্রমণ করিল। বিনা আয়াসে তাহাকে কুটুম্বিতা প্রদান করিয়া. প্রেমবিহ্বলচিত্তে সবলে আকর্ষণ করিল এবং মুকুন্দের হস্ত হইতে তাহার হস্তমুক্ত করিবার চেষ্টা করিল।

চেষ্টায় ফল হইল না। সিপাহীগুলার বোধ হইল, মানুষ ধরিতে গিয়া তাহারা নরদেহধারী কি এক প্রস্তরবৎ কঠিন পদার্থে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। অতি আকর্ষণেও তাহারা ব্রাহ্মণকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না। মুকুন্দেরও মুক্তিলাভ হইল না। বিস্ময়ে তিনজনে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিল। রতনের পরিচিত সিপাহী দূরে দাঁড়াইয়া প্রমাদ গণিতেছিল।

প্রাণপণে মুকুন্দ চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রাতঃকৃত

সমাধা করিতে অনেক সিপাহী কালাবাঁধের তীরে উপস্থিত হইয়াছিল। পরপার হইতে তাহারা মুকুন্দের চীৎকার শুনিল, শুনিয়া উর্দ্ধশ্বাসে তাহারা মুকুন্দের রক্ষার্থে ছুটিল।

চীৎকার সাহেবদিগেরও কাণে পঁহুছিয়াছে। কারণ নির্দ্ধারণের জন্য তাঁহারাও বাঙ্গলার বাহিরে আসিয়াছেন। সাহেবদের দেখিয়া মুকুন্দ চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল। বলিল—"সাহেব! দস্যুর হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রতন পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, তুইজন সাহেব। সম্মুখে দেখিলেন, দলে দলে সিপাহী মুকুন্দের উদ্ধারার্থ ছুটিয়া আসিতেছে; পরিণাম বুঝিতে ব্রাহ্মণের বাকী রহিল না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন "করিলাম কি? নারায়ণীর উপকার করিতে গিয়া, তাহার অধিকতর অনিষ্ট করিয়া বসিলাম।" বুঝিলেন, কার্য্য নিষ্পন্ন হওয়া সুদূরপরাহত। এত লোকের বাধা অতিক্রম করিয়া, আনন্দদেবের সমীপস্থ হওয়া তাঁহার সাধ্যাতীত। পরন্তু মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিলে তাঁহাকে বন্দী হইতে হইবে।

এরূপ অবস্থায় আর অধিকদূর অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য নয় বুঝিয়া, রতন মুকুন্দের হাত ছাড়িয়া দিলেন। প্রহরীগুলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তখনও পর্য্যন্ত তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছিল। ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে বলিলেন।

কথা শেষ করিতে তাহারা ব্রাহ্মণকে অবকাশ দিল না। প্রভুপুত্রকে ছাড়িতে দেখিয়াই, ব্রাহ্মণের চপেটাঘাতের মধুরত্ব তাহাদের অঙ্গের পক্ষে বিশেষ প্রীতিকর হইবে না বুঝিয়া, তাহারা মুহূর্ত্তের মধ্যে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। মুকুন্দও সাহেব-দিগের আশ্রয় গ্রহণের অভিলাষে সেস্থান হইতে ছুটিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিল। ভয়ে যুবক মৃতবৎ হইয়াছিল। তাহার অঙ্গে শিথিলতা আসিয়াছিল। পদদ্বয় ঘনঘন কম্পিত হইতেছিল। সুতরাং ইচ্ছা সত্ত্বেও মুকুন্দ একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না। রতন তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া আবার তাহাকে ধরিলেন। বলিলেন, "ভয় নাই আমা হইতে বিন্দুমাত্রও অনিষ্টের আশঙ্কা করিও না। তবে আমি যা বলি শুন। কি নিমিত্ত তোমার পিতার কাছে চলিয়াছি; তোমাকেই বলিতেছি।"

কথা মুকুন্দের কাণে পৌঁছিল না। সে কেবল সাহেব দুইজনের আগমন প্রত্যাশায় তাঁহাদের দিকে চাহিয়াছিল। তাঁহারাও মুকুন্দকে বিপন্ন বুঝিয়া তাহার দিকে আসিতেছিলেন। রতনের কথা শেষ হইতে না হইতে, হার্লি তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। হার্লিকে সমীপস্থ দেখিয়াই, মুকুন্দ পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিল "সাহেব আমাকে রক্ষা কর।" প্রহরিগণ সেলাম করিতে করিতে সরিয়া সাহেবকে পথ দিল। রতনও সাহেবকে দেখিবার জন্য পশ্চাতে ফিরিয়াছেন, অমনি হার্লির বজ্রমুষ্টি দ্বারা নাসিকা দেশে বিষম প্রহৃত হইলেন। দেখিতে দেখিতে শোণিতস্রোতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখ প্লাবিত হইয়া গেল। বিষম আঘাতে ব্রাহ্মণ চারিদিক

অন্ধকারময় দেখিলেন। নাসিকায় হস্ত দিয়া তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে ভূমির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

অবকাশ পাইয়া, মুকুন্দ উপবিষ্ট ও অবনত মস্তকে ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠে দুই চারিটা মুষ্টি প্রহার করিয়া অপমানের শোধ লইল। প্রহরীগুলাও ব্রাহ্মণকে ধরিয়া ফেলিল। কালাবাঁধের অপর পার হইতে অনেক সিপাহীও ইতিমধ্যে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

হারলি মুকুন্দকে বৃদ্ধের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুকুন্দের উত্তরে বুঝিলেন, বৃদ্ধ পাগল রাজার সঙ্গী। বৃদ্ধ সম্বন্ধে বুঝিতে, তখন আর তাঁহার কিছু বাকী রহিল না! ইতিমধ্যে ব্রাউন তথায় উপস্থিত হইলেন। হাসিতে হাসিতে হারলি, সহচরকে তাঁহার প্রিয় দেবদূতের মানসিক বিকারের কথা বিবৃত করিলেন। এবং তাঁহাকে 'দেব দূতের' দুই একটী কথা শুনাইবার জন্য, ও পাগল রাজার সঙ্গীর পাগলামির পরিমাণ কত, এবিষয়েরও একটা মীমাংসা করিবার জন্য, মধুর আত্মীয়তাজ্ঞাপক বাক্যবিন্যাসে ও মধুরতর পদপ্রহারে বৃদ্ধকে উঠাইবার চেষ্টা করিলেন।

এরূপ সদ্ব্যবহার ব্রাউনের প্রীতিকর হইল না। বৃদ্ধ পাগল, একথা শুনিয়াও তৎপ্রতি তাঁহার প্রীতির হ্রাস হইল না। ব্রাহ্মণের নাসিকাস্রুত রক্তে প্রায় বর্গগজ পরিমিত ভূমি সিক্ত হইয়াছে। দেখিয়া ব্রাউন দুঃখিত হইলেন। হারলিকে বলিলেন, "আর কেন বৃদ্ধকে প্রহার কর। বৃদ্ধের যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে।" ব্রাউনের কথায় হারলি ব্রাহ্মণকে আর প্রহার করিলেন না। তবে মনে মনে স্থির করিলেন, বৃদ্ধের পাগলামীর

শাস্তি দিতে হইবে। সিপাহীদের ডাকিলেন, তাহারা নিকটে আসিলে বৃদ্ধকে বাঁধিতে আদেশ করিলেন। বলিলেন, "বৃদ্ধকে বাঁধিয়া রাঁচি লইয়া যাও। আমি যখন শীকার করিয়া ঘরে ফিরিব, তখন বৃদ্ধের অপরাধের বিচার করিব।"

একজন সিপাহী ব্রাহ্মণকে বাঁধিবার জন্য দড়ীর চেষ্টায় চলিল। অপরে ব্রাহ্মণকে আগুলিয়া রহিল। আর আপনা আপনির ভিতর যে যার পরাক্রমের প্রশংসা আরম্ভ করিল। যে তিন জন প্রথমে ব্রাহ্মণকে বাধা দিতে গিয়া পরাভূত হইয়াছিল, তাহারা কেবল ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের উপর দোষারোপ করিতে লাগিল। রতনকে শিক্ষা দিতে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা কোন মতেই তাহারা প্রয়োগ করিতে পারে নাই। রতন ব্রাহ্মণ বলিয়া, বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে সে শক্তির চতুর্থাংশ খরচ করিতে হইয়াছে।

ব্রাউন দেশীয় ভাষা বুঝিতেন না। সুতরাং সিপাহীগুলার সহিত হার্‌লির কথা শুনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলিতেছ?"

হার্‌লি। বৃদ্ধকে রাঁচি লইয়া যাইতে আদেশ করিতেছি।

ব্রাউন। কেন?

হার্‌লি। চক্ষের উপর অপরাধ দেখিলাম। বিচার করিয়া শাস্তি দিব।

ব্রাউন। বিনা বিচারে শাস্তি দিয়াও কি তৃপ্তি হইল না?

হার্‌লি। একি শাস্তি? এত শিক্ষা—পাগলের ঔষধ।

ব্রাউন। স্বদেশে তোমার এরূপ ঔষধের প্রয়োগ দেখিলে, আমার বিশ্বাস, জনসাধারণ বৃদ্ধকে ছাড়িয়া তোমাকে একটী গারদে পূরিয়া রাখিত।

কথা শুনিয়া হার্লির মুখ লাল হইয়া উঠিল। বলিল, অনুগ্রহ করিয়া শাসন ব্যাপারে কোনও কথা কহিও না। এ উষ্ণ প্রধান দেশ,—ব্রিটেন্ নয়।

ব্রাউন। তা বোধ হয় আমিও জানি। কিন্তু উষ্ণপ্রধান দেশে আসিলে, ব্রিটন্ সন্তানের মস্তিষ্ক এত উষ্ণ হয়, তা জানিতাম না।

হার্লি কোন উত্তর দিলেন না। তবে ব্রাউনের কথায় তাঁহার বড়ই বিরক্তি হইল। মনে মনে সহচরের উপর তাঁহার ঘৃণা জন্মিল। হার্লি ভাবিলেন, এ পুরুষ-বেশী স্ত্রীলোকটা হইতে জগতের কি কার্য্য হইতে পারে!

ব্রাউনও আর দাঁড়াইলেন না। এক অসহায় বৃদ্ধের উপর এত অত্যাচার, তাঁহার দেখা সহিল না। ধীরে ধীরে তিনি বাংলার দিকে ফিরিতে লাগিলেন।

রতন এতক্ষণ অধোমুখেই বসিয়া ছিলেন। নাসিকা হইতে তখনও রক্ত ঝরিতেছিল। তিনি যথাসম্ভব সেই রক্তরোধের চেষ্টা করিতেছিলেন।

রক্ত পড়া কতক বন্ধ হইলে, পাগড়ীর খানিকটা খুলিয়া তাহারই প্রান্তভাগ দিয়া মুখ মুছিলেন। প্রান্তভাগ আবার মাথায় জড়াইলেন। কাছে দাঁড়াইয়া সিপাহীগুলা তাহার কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল। ইত্যবসরে সাহেব ও মুকুন্দে আবার কথা চলিতেছিল।

মুকুন্দ সাহেবকে বুঝাইতেছিল যে, বৃদ্ধ তাহার পিতাকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিল। ইংরাজের হস্তে বীরচন্দ্রের জমীদারীর ভার আসিবার কারণ, একমাত্র তাহার পিতা।

এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছিল, আনন্দদেবই রাজাকে পাগল করিয়াছে। তার পর তাঁর হাত হইতে সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া ইংরাজকে দিয়াছে। সেইজন্য ব্রাহ্মণ তার পিতাকে হত্যা করিবার জন্য প্রতিদিন ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রতিদিন সুযোগ সন্ধান করে।

মুকুন্দ বলিতেছিল, হার্‌লি শুনিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, এরূপ লোককে অনন্তপুর হইতে দূর করা হয় নাই কেন? রাজার সঙ্গে ব্রাহ্মণের কোনও সম্পর্ক নাই। এখানে তার ঘর নাই, পরিবার নাই। এরূপ লোকের অনন্তপুরে অবস্থানের উপযোগিতা তিনি কিছু দেখিতে পাইলেন না। তাই তিনি মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এরূপ লোককে অনন্তপুর হইতে দূর করা হয় নাই কেন?"

মুকুন্দ কৌশলে বুঝাইল, শুধু বড় সাহেবের অসন্তুষ্টির ভয়ে কেহ বৃদ্ধকে কিছু বলিতে পারে না। সকলেই তাই নীরবে তাহার অত্যাচার সহ্য করে। রাজার অনুরোধে, বড় সাহেব বৃদ্ধকে অনন্তপুরে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। এখন তাঁহার আশ্বাস পাইলেই, পিতা ও পুত্রে নিশ্চিন্ত হয়।

হার্‌লি আশ্বাস দিলেন। বলিলেন, প্রথম কিছুদিনত বৃদ্ধকে শ্রীঘরে রাখি। তারপর অন্য ব্যবস্থা।

আনন্দের আবেগ মুকুন্দ চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে সাহেবকে যত পারিল, ধন্যবাদ দিল। এবং এরূপ কার্য্যে যে একটা মহৎ ফল আছে, আর অনন্তপুরের রাজপ্রতিনিধিরূপী আনন্দদেবের হস্তেই যে, সে ফলের অস্তিত্ব, এটাও সে সাহেবকে বুঝাইতে ছাড়িল না।

সাহেব রতনকে উঠিতে আদেশ করিলেন। তিনি আপ-নিই উঠিতেছিলেন, সুতরাং সাহেবের আদেশের আর অপেক্ষা রহিল না। নবাগত সিপাহীদিগের মধ্যে দুই চারিজন তাঁহাকে ধরিল। অপরে লাঠী ধরিয়া ঘেরিয়া রহিল। যে ব্যক্তি দড়ী আনিতে গিয়াছিল, সেও ফিরিয়া আসিল।

ব্রাহ্মণ মাথা তুলিয়া দেখিলেন, সম্মুখে জয়োল্লসিত সাহেব। পার্শ্বে মুকুন্দ, চারিধারে সিপাহী।

একবার ঘাড় ফিরাইয়া, তিনি সিপাহীগুলাকে দেখিয়া লইলেন। দুই একজন পরিচিত সিপাহী মাথা হেঁট করিল। অপরিচিতের মধ্যে কেহ করিল, কেহ করিল না। যে করিল না, সে কেবল লাঠি কাঁধে করিয়া বুক ফুলাইয়া খাড়া হইতে জানে। লাঠি খেলিতে জানেন না। যাহারা খেলোয়াড়, তাহারা মাথা তুলিয়া রাখিতে পারিল না। ব্রাহ্মণের প্রখর দৃষ্টিতে তাহারা আপনাদিগকে যথেষ্ট তিরস্কৃত বোধ করিল। দড়ী লইয়া যে বাঁধিতে আসিতেছিল, সে সহসা দাঁড়াইয়া গেল। যাহারা তাঁহাকে ধরিয়াছিল, তাহারা ব্রাহ্মণের চক্ষু দেখে নাই। দেখিলে কি করিত বলা যায় না।

মুকুন্দের কিন্তু বিলম্ব সহিতেছিল না। ব্রাহ্মণকে আবদ্ধ দেখিতে পাইলেই সে নিশ্চিন্ত হয়। দড়ী হাতে লোকটাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া, তাহাকে সত্বর কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার আদেশ করিল। হারলিও বৃথা বিলম্ব দেখিয়া বিরক্ত হইলেন। এবং বৃদ্ধকে বন্দী করিবার জন্য রুক্ষস্বরে আদেশ করিলেন। সক-লেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বৃদ্ধের বন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

ব্রাহ্মণ আর একবার সাহেবের মুখ পানে চাহিলেন। একটু

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া হার্‌লি বলিলেন,—"বৃদ্ধ পাগল? মুখপানে কি দেখিতেছ? মনে মনে বড়ই রাগ হইতেছে, না?"

রতন। যদিই হয়, তাহাতে আমার কি অপরাধ আছে, সাহেব?

হার্‌লি। বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, আমাকে কোন রকমে শাস্তি দাও।

রতন। এক একবার হইতেছে, এক একবার হইতেছে না।

হার্‌লি। ইচ্ছা হইলে কি হইবে? আমি ত আর দুর্ব্বল ছাতুখোর নই।

রতন। ইচ্ছা হইলে খুবই হয়। এক একবার মনে করিতেছি বিনাপরাধে প্রহার খাইয়া চুপ করিয়া থাকিব? আবার ভাবিতেছি অদৃষ্ট।

একটা সিপাহী রতনের হাত টানিতে লাগিল, দড়ী দিয়া সে হাত বাঁধিবে। রতন বলিলেন, "ক্ষণেক অপেক্ষা কর।" তথাপি সে হাত টানিতে লাগিল, রতন তাহার হাত ধরিলেন। সিপাহী বুঝিল, অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

রতন বলিতে লাগিলেন,—"ভাবিতেছি, অদৃষ্ট। অদৃষ্টে আমার রক্তপাত ছিল। নতুবা, চলিয়াছি আনন্দদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে; পথে তোমার মার খাইব কেন?"

হার্‌লি। আনন্দদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে, না তাহাকে হত্যা করিতে?

রতন। এই ছোকরা তোমাকে বুঝাইয়াছে বুঝি?

রতন ও সাহেবের দৃষ্টি যুগপৎ মুকুন্দের উপর পড়িল। মুকুন্দের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সাহেব বুঝিলেন, মুকুন্দ ভীত

হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেছে। তাহাকে অভয় দিবার জন্য ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"যে বুঝাক্, তোমাকে রাঁচি যাইতে হইবে।"

রতন। কেন?

হার্লি। অনন্তপুরে তোমার আর থাকা চলিবে না।

রতন। সে আমিও বুঝিয়াছি। অনন্তপুর ত্যাগ করিব বলিয়াই বাটীর বাহির হইয়াছি। যাইবার পূর্ব্বে রাজকুমারীর জন্য দুইটা কথা বলিতে আনন্দদেবের কাছে চলিয়াছিলাম। তার ফল পাইয়াছি। আর বলিতে ইচ্ছা নাই। সাহেব আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি অনন্তপুর ছাড়িয়া চলিয়া যাই।

হার্লি। অমনি ছাড়িতে ইচ্ছা নাই। রাঁচিতে লইয়া, তোমার সহিত দিন কয়েক আমোদ করিব, তারপর ছাড়িয়া দিব।

রতন বুঝিলেন সাহেব রহস্য করিতেছে। রাঁচিতে লইয়া, শাস্তি দিবে। হয়ত কারাগারে নিক্ষেপ করিবে। বুঝিয়া উত্তর করিলেন "রাচিতে না লইয়া ছাড়িবে না?"

হার্লি। এমন প্রিয় বস্তুটী পাইয়াছি, কেমন করিয়া ছাড়ি!

রতন। আমি রাঁচি যাইব না।

হার্লি। অবশ্যই যাইতে হইবে।

রতন। এমন ক্ষমতাবান ত দেখি নাই, যে রতনকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন স্থানে লইয়া যায়।

হার্লি। এখনি দেখাইতেছি।

রতন। তুমি! যে বিনাপরাধে একজন বৃদ্ধের গায় চুরি করিয়া হস্তক্ষেপ করিতে পারে, আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্ম্ম করান, সে বানরের কর্ম্ম নয়।

মুকুন্দের সম্মুখে সিপাহীদের সম্মুখে অপমানিত হইয়া হার্লি একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া গেলেন। কুটুম্বিতাজ্ঞাপক দুই চারিটা মধুর বাক্যে ব্রাহ্মণকে আপ্যায়িত করিয়া, তাঁহার অঙ্গে পদ প্রহার করিলেন।

বারম্বার অপমান রতনের সহ্য হইল না। মুহূর্ত্তে তাঁহার ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ভগ্ন-লাঙ্গুল সিংহের ন্যায় ব্রাহ্মণ এক ভীষণ হুঙ্কার প্রদান করিলেন। কাছারি-বাড়ী ও রাজ-প্রাসাদে প্রতিহত হইয়া সে হুঙ্কার সহস্র প্রতিধ্বনিতে প্রান্তর সমীরণ আলোড়িত করিয়া ফেলিল। সকলেই স্তম্ভিত।

হার্লিও চমকিত। মনুষ্যের কণ্ঠ হইতে এরূপ ভীম হুঙ্কার আর কখনও তিনি শুনেন নাই। এতগুলা সিপাহীর মধ্যেও, তিনি আপনাকে নিঃসহায় বোধ করিলেন। মুকুন্দ একবারে সাহেবের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

হুঙ্কারের পরই, ব্রাহ্মণ একবার ভীমবেগে অঙ্গ সঞ্চালন করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রহরীগুলা ভারহীন তুলা-সমষ্টিবৎ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। ব্যাপার দেখিয়া সাহেব কতকটা হতভম্ব হইয়া গেলেন। বুঝিলেন, পলায়ন ভিন্ন জীবন রক্ষার অন্য উপায় নাই। কিন্তু এতগুলা লোকের সম্মুখে প্রাণ লইয়া পলায়ন, তাঁহার ন্যায় শক্তিমান পুরুষের অসম্ভব হইয়া উঠিল।

রতনও তাঁহাকে পুনঃ প্রহারের অবকাশ দিলেন না। সাহেব কর্ত্তব্যস্থির করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। বজ্রমুষ্টিধৃত হার্লি ভূতলপ্রোথিত দণ্ডবৎ নিশ্চল। তাঁহার হস্তপদ সঞ্চালনেরও শক্তি রহিল না।

সাহেবকে ধৃত দেখিয়া, মুকুন্দ চক্ষের নিমেষে পলাইল

পলাইবার কালে একজন ভৃত্যকে দেখিয়া বলিল, "আমার পিতাকে এইবেলা খবর দাও। তার প্রাণ বাঁচাও।"

সাহেবকে বিপন্ন বুঝিয়া, সিপাহীরা প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া রতনকে আক্রমণ করিল। তিনি উচ্চ চীৎকারে তাহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। তাহারা নিষেধ মানিল না। রতন এইবার লাঠীর অভাব অনুভব করিলেন। ভাবিলেন লাঠী সঙ্গে না আনিয়া ভুল করিয়াছি! ইতিমধ্যে দুই চারি ঘা লাঠী তাঁহার পৃষ্ঠে পড়িয়াছে। তখন কাপুরুষ সিপাহীগুলাকে কিছু শিক্ষা দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল।

রতন সাহেবকে অভয় দিলেন। বলিলেন, আমা হইতে জীবনের কোনও আশঙ্কা করিও না। আমি নরঘাতী নই। আমি তোমাকে কিছু বলিব। ক্ষণেক অপেক্ষা কর। আমি এই কাপুরুষগুলাকে একজন নিরস্ত্র বৃদ্ধের পৃষ্ঠে যষ্টি প্রহারের ফলটা দেখাইয়া দিই। যদি পুরুষত্বের অভিমান রাখ, স্থান ত্যাগ করিও না।"

এই বলিয়া রতন সাহেবকে পরিত্যাগ করিলেন। সাহেবের অঙ্গে আঘাত লাগিবার ভয়ে, সিপাহীরা তাঁহাকে মনোমত প্রহার করিবার সুবিধা পাইতেছিল না। এইবারে পাইল। প্রবলতর বেগে দুই চারি ঘা লাঠী রতনের পৃষ্ঠে পাড়ল। ব্রাহ্মণ উদ্ধশ্বাসে বটবৃক্ষাভিমুখে ছুটিলেন।

সিপাহীরা ভাবিল, বৃদ্ধ প্রাণভয়ে পলাইতেছে। তখন জয়োল্লাসে কোলাহল করিতে করিতে সকলে তাঁহার পশ্চাতে ছুটিল। সকলের আগে, লাঠীহাতে সিপাহী। তৎপশ্চাৎ অপর সিপাহী। সকলের পশ্চাৎ জনতা। দুই চারি জন

করিয়া, গ্রামের চতুর্দ্দিক হইতে পুরুষ স্ত্রী, বালক, বালিকা ঘটনাস্থলে সমবেত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সকলেই কিন্তু রতনকে দেখিতে পাইতেছিল না। সকলে ব্যাপারটাও ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। এখন সিপাহীদিগকে ছুটিতে দেখিয়া তাহারাও হৈ হৈ করিতে করিতে ছুটিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হুঙ্কার শব্দ ব্রাউনেরও কাণে পৌঁছিয়াছিল। তিনিও শব্দে চমকিত হইয়াছিলেন। এবং সহচরকে বিপন্ন বুঝিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থে আসিতেছিলেন।

আসিতে আসিতে দেখিলেন, বৃদ্ধ পলাইতেছে। শুধু তাই নয়। অসংখ্যলোকে তাহার অনুসরণ করিতেছে। তিনি অনুমান করিলেন, বুঝি বৃদ্ধ হার্লিকে হত্যা করিয়াছে। অথবা বিষম আহত করিয়াছে। নতুবা এত লোক বৃদ্ধকে ধরিতে ছুটিবে কেন? বৃদ্ধের বেনিয়ানটীও নাসিকারক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। সুতরাং ব্রাউনের সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল।

প্রথমেই তিনি হার্লির কাছে ছুটিয়া চলিলেন।—দেখিলেন অক্ষত দেহে হার্লি দণ্ডায়মান। বৃদ্ধ কর্তৃক আঘাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তর পাইলেন না।

তখন ব্রাউনের অন্যরূপ ধারণা হইল। তিনি বুঝিলেন, আর কিছু নয়; বৃদ্ধ কোন সুযোগ পাইয়া পলাইতেছে। সিপাহীরাও হার্লির আদেশে, তাহাকে বন্দী করিতে ছুটিয়াছে।

ইহাও বুঝিলেন, অহঙ্কৃত হার্‌লি বৃদ্ধের কাছে অপমানিত হইয়াছে। তাই কথা কহিল না।

বৃদ্ধের পরিণাম দর্শনে কৌতুহলী ব্রাউন তন্মুহূর্ত্তেই স্থানত্যাগ করিলেন।

হার্‌লি বৃদ্ধের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। বৃদ্ধের অমানুষিক বল তাঁহাকে বিস্মিত করিয়াছিল। শক্তিমান বলিয়া হার্‌লির স্বদেশে একটা গৌরব আছে। ব্যায়াম কৌশল ও মুষ্টিচালন প্রদর্শনে, তিনি দেশে অনেকবার পুরস্কার পাইয়াছেন। আজ তাঁহার সেই বলগৌরবে আঘাত লাগিয়াছে।

হার্‌লি ভাবিতেছিলেন, এরূপ বৃদ্ধ কি 'পাগল'? যেরূপ বলে বৃদ্ধ তাঁহার হাত ধরিয়াছিল, ইচ্ছা করিলে চক্ষের নিমেষে সে হাত খানি ভাঙ্গিয়া দিতে পারিত। কিন্তু বৃদ্ধ তাহার কোনও অনিষ্ট করে নাই। তাহার চক্ষে ক্রোধের সামান্য লক্ষণও দেখিতে পায় নাই। এরূপ বৃদ্ধকে পাগল ভাবিতে হার্‌লির আর সাহস হইল না। কথোপকথনে বৃদ্ধের মুখে হার্‌লি যে সব কথা শুনিলেন, তাহাও কি পাগলের কথা?

বিশেষতঃ, মুকুন্দের আচরণে তিনি বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন। মুকুন্দকে রক্ষা করিতেই তাঁহার সেখানে আগমন। মুকুন্দের উদ্ধারার্থেই তিনি বৃদ্ধকে প্রহার করিয়াছেন। বৃদ্ধের মুখের একটা কথা শুনিবারও অবকাশ গ্রহণ করেন নাই! সহচরের নিকট অপমান লাঞ্ছনা সমস্তই মুকুন্দের জন্য। সেই মুকুন্দ তাঁহাকে বিপন্ন দেখিয়া পলাইল!

লজ্জা আসিয়া, অহঙ্কারের স্থান অধিকার করিল। অনুতাপে হার্‌লির হৃদয় বিদ্ধ হইতে লাগিল। মুকুন্দের

উপর ঘৃণা, তাহার পিতা আনন্দদেবের স্কন্ধেও পতিত হইল।

বৃদ্ধের সঙ্গে কথোপকথনে হার্লি বুঝিয়াছেন, রাজকুমারীর কোন অভাব মোচনের জন্য, বৃদ্ধ আনন্দদেবের কাছে আবেদন করিতে চলিয়াছিল। সেই জন্যই মুকুন্দের সহিত তাহার সাক্ষাৎ। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে ফল বিপরীত হইয়াছে। বৃদ্ধ প্রতীকারের পরিবর্ত্তে প্রহার উপহার পাইয়াছে।

চিন্তার জ্বালায়, হার্লি ক্রমে অস্থির হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া—মুকুন্দ, আনন্দ, রাজকুমারী, রাজা, ইংরাজ, ইংরাজের শাসননীতি প্রভৃতি শত চিন্তার বিভিন্নমুখ প্রখরাবর্ত্তে পড়িয়া তাঁহার মস্তিষ্কটা যেন খণ্ডিত হইতে লাগিল।

তিনি অল্পদিন বাঁচি আসিয়াছেন। যদিও ইতিমধ্যে অনন্তপুরের সংবাদ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছে, তথাপি তিনি সমস্ত বিষয়টা ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই। শুনিয়াছেন, রাজা বিকৃত মস্তিষ্ক। সেইজন্য রাজ্যশাসন ভার তাঁহাদেরই উপর। আনন্দদেব তাঁহাদেরই মনোনীত দেওয়ান।

দুই একবার ইহার পূর্ব্বে তাঁহার অনন্তপুরে আসাও হইয়াছে। আসিয়া আনন্দদেবকে দেখিয়াছেন, তাহার পুত্র মুকুন্দকে দেখিয়াছেন। রাজাকেও দেখেন নাই, তৎসম্পর্কীয় অন্য কাহাকেও দেখেন নাই। রাজবাটী দূর হইতে দেখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ভিতরে প্রবেশ করেন নাই।

রাজা, রাজকুমারী, এবং রাজ-সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপারটা তাঁহার প্রহেলিকাময় বোধ হইল। তিনি চিন্তাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আপনাকে একটা স্বপ্নময় কূলের সমীপস্থ অনুভব

করিলেন। বৃদ্ধকে দেখিয়াছেন; এক্ষণে বৃদ্ধ যার সহচর, সেই রাজাকেও যেন তিনি দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন সেই কুলে দাঁড়াইয়া রাজা, রাণী রাজকুমারী, রাজ সহচর—সকলে হাত ধরাধরি করিয়া, তাহাদের ধর্ম্ম, জ্ঞান, সভ্যতা, প্রিয়চিকীর্ষা, সত্যপ্রিয়তা এক একটী ফুটন্ত সৌরভময় ফুল, নিষ্ঠীবনসিক্ত করিয়া, আবর্জনাময় ঘনাবর্ত্তে নিক্ষেপ করিতেছে!

দূর হইতে আবার একটা ভীষণ শব্দ আসিয়া হার্লির চিন্তাস্রোতে বাধা দিল। তিনি মাথা তুলিয়া দেখিলেন, ব্রাউন একটা উচ্চভুমির উপর দাঁড়াইয়া কি যেন দেখিতে দেখিতে অতি আনন্দে করতালী দিতেছে।

তাঁহারও দেখিবার কৌতুহল হইল। তিনি সেই উচ্চ স্থান লক্ষ্যে ছুটিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কঠোর দুর্ভর, চিন্তামগ্ন হার্লিকে পরিত্যাগ করিয়া, ব্রাউন ব্রাহ্মণের পরিণাম দেখিতে ছুটিয়াছেন। কিছুদূর যাইয়া তিনি বুঝিলেন, বৃদ্ধের সমীপস্থ হওয়া এখন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। হার্লির কাছে আসিতে, ও সেখান হইতে ফিরিতে, অনেক বিলম্ব হইয়াছে। তাই তিনি দূর হইতে দেখিবার সুযোগ খুঁজিলেন। কালাবাঁধের এক অংশে একটী উচ্চ অর্দ্ধভগ্ন ইটের পাঁজা ছিল। মাটী চাপা পড়িয়া তৃণ গুল্মাদি জন্মিয়া সেটা একটী ছোট পাহাড়ের মত হইয়াছে। ব্রাউন খড়া বহিয়া তাহার উপরে উঠিলেন।

উঠিয়া তিনি দেখিলেন, বৃদ্ধ এখন পর্য্যন্ত ছুটিতেছে! সিপাহীগুলাও সমভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে। এখন যদিও ধরিতে পারে নাই, তথাপি ব্রাউনের বোধ হইল, বৃদ্ধের ধরা পড়িতে আর বড় বিলম্ব নাই। বৃদ্ধের বুদ্ধিহীনতায় তাঁহার মনে বিশেষ কোন কষ্ট হইল। বৃদ্ধ বটবৃক্ষাভিমুখে বা ছুটিতেছে কেন? সেখানে কে তাহাকে এত অধিক লোকের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে? কোন লোকালয় উদ্দেশে ছুটিলে, বৃদ্ধের রক্ষা পাইবার অনেক সম্ভাবনা ছিল। তাহা করিল না দেখিয়া, ব্রাউন তাহার নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচয় পাইলেন!

মুহূর্ত্তে তাঁহার মতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ব্রাউন ভাবিলেন, তবে বোধ হয়, মতিহীন বৃদ্ধ হার্‌লির কোন বিশেষ অমর্য্যাদা করিয়াছে! হার্‌লি বিশেষ ক্ষমাশীল নয় বলিয়াই বৃদ্ধকে প্রহার করিয়াছে। হার্‌লির উপর তাহার যতটা ক্রোধ হইয়াছিল, বৃদ্ধের এই এক নির্ব্বুদ্ধিতায় তাহার অর্দ্ধেক প্রশমিত হইয়া গেল।

তথাপি ব্রাউন দেখিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ধরা পড়ে পড়ে এমন সময়, তিনি দেখিতে পাইলেন, ঘণোৎকীর্ণাবিদ্যুল্লতার ন্যায় যবনিকান্তরালের কোন অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী বালিকা বৃদ্ধের কাছে ছুটিয়া আসিল। আসিয়াই তাহার হাতে একগাছি লাঠী দিল। বৃদ্ধ সাগ্রহে সেই যষ্টি গ্রহণ করিল। বালিকাও দেখিতে দেখিতে সেই অজ্ঞাতদেশে মিলাইল!

ব্রাউনের দৃষ্টি সেই নর-প্রাচীর ভেদ করিয়া সেই অনিশ্চিতদেশ আলোড়িত করিয়া,—সেই অপূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুটির সন্ধান

করিল। সন্ধান মিলিল না। চক্ষু একবার বটবৃক্ষের ফলস্বরূপ তাহাকে ভিক্ষা করিল। সে ফল আর ঝরিল না।

এইবারে ঘটনাস্থলের কথাটা বলিব। রতনের হাতে লাঠী আসিয়াছে। তাহার গতিরও নিবৃত্তি হইয়াছে। রতনকে দাঁড়াইতে দেখিয়াই সিপাহীগণও দাঁড়াইল। জনতার গতিও রুদ্ধ হইল।

লাঠীয়ালগণ এতক্ষণে বুঝিতে পারিল ব্রাহ্মণ ছুটিতেছিল কেন। এ ছোটা পলায়ন নয়। এ শুধু তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য একটু দ্রুত অগ্রগমন! সুতরাং অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, কে আর এমন সাক্ষাৎ কৃতান্তের মুখে অগ্রসর হইবে! কাজেই সকলেই অগ্র পশ্চাৎ ভাবিবার জন্য দাঁড়াইয়া গেল। বৃদ্ধকে বন্দী করিবার ফল যখন অতি সামান্য, তখন সকলের আগে গিয়া প্রাণটাকে বিপন্ন করা কেহই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল না।

রতন উচ্চৈঃস্বরে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"এক একজনে লড়িতে চাও, না সকলে এক সঙ্গে লড়িতে চাও?"

এই বলিয়া রতন দীর্ঘদেহ উন্নত করিয়া, দীর্ঘতর যষ্টিতে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে সে বরবপু নিরীক্ষণ করিতে লাগিল—কেহ কোনও কথা কহিল না।

রতন তেমনি উচ্চকণ্ঠে আর একবার তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। এবারেও কেহ উত্তর দিল না। সকলে এক সঙ্গে ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করিলেও অনেকে মরিবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে? ঘড়বড়সিং ভাবিল, "ব্রাহ্মণ কট্‌মট্‌ করিয়া আমার পানে চাহিয়াছিল। কাজেই, আগে সে

আমাকে মারিয়া ফেলিবে।” ফতুয়া খাঁ মনে করিল, “আমি দড়ীর গায়ে হাত দিয়াছিলাম, সুতরাং আমার প্রাণটাই আগে যাইবে।” এইরূপ আপন আপন বিপদ কল্পনা করিয়া সিপাহীরা চুপ করিয়া রহিল। তৃতীয় বার, রতন তাহাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সিপাহীদের মধ্যে একজন সাহস করিয়া অগ্রসর হইল। সে ব্যক্তি রতনের কাছে গিয়া, তাঁহার পাদমূলে লাঠী গাছটী রক্ষা করিল এবং তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া ক্ষমা চাহিল। বলিল—“গুরুজী, চরণে অপরাধ করিয়াছি।”

রতন এতক্ষণ তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। কথা শুনিয়া চিনিলেন। বলিলেন, “সদাশিব!” সদাশিব মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সদাশিব ক্ষত্রিয় সন্তান। দশ বৎসর পূর্ব্বে, সে রতনের কাছে কুস্তি ও লাঠী খেলা ও শাস্ত্র শিখিয়া সরগুজা, পদ্মা, ধলভূম প্রভৃতি নানা রাজার অধীনে চাকুরী করিয়া অল্পদিন হইল অনন্তপুরে ফিরিয়াছে।

অনন্তপুরে আসিয়াই সদাশিব রাজ্য সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়াছিল। আনন্দদেব তাহাকে সুবেদারী পদ দিয়াছেন। কোন একটী কার্য্য হানি হইবার ভয়ে, সদাশিব গুরুজীর সহিত দেখা করিতে পারে নাই। সেইজন্য অন্য সিপাহীদের সঙ্গে তাহাকেও গুরুজীর পশ্চাৎ ছুটিতে হইয়াছে। কিন্তু লজ্জায় সে দলের সম্মুখে আসিতে পারে নাই। বরাবর পিছনেই ছিল। ব্রাহ্মণের বারম্বার আহ্বানে অনুতপ্ত, গুরুজীর পদে প্রণত হইল। অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিল।

গুরুজী কাহারও অপরাধ গ্রহণের লোক নহেন, বিশেষতঃ

শিষ্যের। অকৃতদার ব্রাহ্মণ এক একটী শিষ্যকেই পুত্র জ্ঞান করিতেন। তিনি সদাশিবকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাহার সঙ্গীদের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন।

সদাশিব বলিল, "গুরুজীর সম্মুখে লাঠি ধরে এমন শক্তি-মান তাহাদের মধ্যে কেহ নাই। তবে গুরুজীর অভয় পাইলে তাহারা সকলে মিলিয়া তাঁহার সঙ্গে একবার লাঠি খেলে।"

ঈষৎ হাসিয়া রতন অভয় দিলেন। সদাশিব ফিরিয়া সঙ্গী-দের সংবাদ দিল। প্রাণের আশঙ্কা নাই শুনিয়া, সকলেই লাঠী খেলিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। মহোল্লাসে সকলে একটা চীৎকার করিয়া উঠিল। জনসাধারণ বুঝিল,—এইবার লড়াই বাধিয়াছে। সকলেই পলাইবার পথটা ঠিক্ করিয়া রাখিল। তেমন তেমন দেখিলে, সেই পথে পলাইবে।

এদিকে সিপাহীগণ রতনের আক্রমণ নিবারণের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। রতন আক্রমণের প্রারম্ভে, একটা ভীষণ হুঙ্কার দিলেন। তারপর প্রতিদ্বন্দ্বী সিপাহীদিগের বিপরীত দিকে কিছুদূর ছুটিয়া গেলেন। আবার বিদ্যুৎবেগে ফিরিলেন। আবার এক ভীষণ হুঙ্কার করিয়া 'হর-হর' শব্দে ভীষণ লম্ফে জনতার মধ্যে পড়িলেন। লাঠির ঠকাঠক্ শব্দে প্রান্তরসমীরণ ভরিয়া গেল।

ব্রাউন ইষ্টক-স্তূপ হইতে এই অদ্ভুতদৃশ্য দেখিতেছিলেন। এবং অতি আনন্দে হাততালি দিতেছিলেন।

হার্লিও ব্যাপারটী দেখিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। অল্পক্ষণ পরে তিনিও সেই পাঁজার উপর উঠিলেন। উঠিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা জীবনে ভুলিবার

নয়! হার্‌লি দেখিলেন, এক দিকে একা বৃদ্ধ,—অন্যদিকে শতাধিক প্রহরী লাঠী লইয়া যুদ্ধ করিতেছে! আর দেখিলেন, ক্ষিপ্রকারিতায় ও প্রহেলিকাময় রণকৌশলে সেই বৃদ্ধ যেন দৈব যৌবনবলে শতস্থানে যুগপৎ আবির্ভূত হইতেছে।

দেখিতে দেখিতে সেই শতাধিক প্রহরী পরাস্ত হইয়া রণে ক্ষান্ত দিল। এবং সকলে নতজানু হইয়া বৃদ্ধকে অভিবাদন করিল। জনসাধারণ ব্যাপারটা কি ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহারা লাঠালাঠীর ব্যাপার দেখিয়া, আগে হইতেই পলায়ন আরম্ভ করিয়াছিল। এক্ষণে প্রহরীরাও ফিরিতে আরম্ভ করিল।

যুদ্ধে কেহই আহত হয় নাই। যে দু'একজন ভাল খেলোয়াড় প্রাণপণে ব্রাহ্মণের সঙ্গে লড়িয়াছিল, তাহারাই স্থানে স্থানে সামান্য আঘাত পাইয়াছিল। আঘাত পাইয়াই তারা বুঝিয়াছিল, ব্রাহ্মণ দয়া করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করেন নাই। ব্রাহ্মণের অঙ্গে কেহই কিন্তু যষ্টিস্পর্শ করিতে পারে নাই।

অল্পক্ষণ মধ্যেই, প্রান্তর জনশূন্য! ব্রাউন ব্রাহ্মণকেও আর দেখিতে পাইলেন না। তখন ধীরে ধীরে পাঁজা হইতে নামিতে লাগিলেন। নামিবার সময় হার্‌লিকে দেখিলেন,—এতক্ষণ দেখিতে পান নাই। দেখিয়াও, ব্রাউন কোনও কথা কহিলেন না। পরন্তু মুখ ফিরাইয়া নামিয়া গেলেন। যেদিকে সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব বালিকামূর্ত্তিটী প্রথম বিকশিত হইয়াছিল, মুগ্ধ-যুবক সেই দিকে চলিলেন।

আবার তাঁহার চক্ষে ব্রাহ্মণের দেবমূর্ত্তিটী ফুটিয়া উঠিয়াছে! এবারে তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে, যে সেরূপ বিজয়শ্রীসেবিত

মহাকায় পুরুষ, সেরূপ অনৈসর্গিকশক্তির অধিকারী বৃদ্ধ কখন 'মানুষ' হইতে পারে না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সহচরের অবজ্ঞায় হার্‌লি মর্ম্মাহত হইলেন। তথাপি তিনি তাঁহার উপর বিরক্ত হইতে পারিলেন না। ব্রাউনের ঘৃণা প্রকাশে অধিকার আছে; কিন্তু ব্রাউনের উপর ক্রোধ প্রকাশে তাঁহার অধিকার কই?

হার্‌লি অনেকক্ষণ পাজ্ঞার উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন। বৃদ্ধ ফিরিয়া তাঁহাকে কি জিজ্ঞাসা করিবে বলিয়া গিয়াছে। তিনি বৃদ্ধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ব্রাউনের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়িল।

ব্রাউন বাংলায় না ফিরিয়া, বটবৃক্ষের দিকে চলিয়াছেন।

হার্‌লি দেখিলেন, ব্রাউন বটবৃক্ষের তলদেশে উপস্থিত হইয়া, বৃক্ষের উপরে, নীচে, চারিদিকে কি যেন সন্ধান করিল। তারপর সে স্থান ত্যাগ করিয়া সুবর্ণরেখার তীরে উপস্থিত হইল। তিনি বুঝিলেন, ব্রাউন অন্বেষণের বস্তুটী খুঁজিয়া পাইতেছে না।

হার্‌লি ভাবিলেন, সে বস্তুটী কি?—সে কি বৃদ্ধ? তাঁহার আচরণে ব্যথিত হইয়া, ব্রাউন কি তাঁহারই জন্য বৃদ্ধের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে চলিয়াছে?

দেখিতে দেখিতে ব্রাউন অদৃশ্য হইলেন। অনুতপ্ত হার্‌লি ভাবিলেন, "কি করিলাম? অকারণ ঔদ্ধত্য দেখাইতে গিয়া সহচরের কাছে মাথা হেঁট করিলাম!" তাঁহার আচরণের জন্য, ব্রাউন হয়ত বৃদ্ধের কাছে ক্ষমা চাহিবে। বলিবে সকল ইংরাজ 'হার্‌লি' নয়। ইংরাজযুবক বৃদ্ধকে দেখিলে শ্রদ্ধা করে। অসহায় দেখিলে, প্রাণপণে সেবার জন্য অগ্রসর হয়। 'বর্ণে'র প্রশ্ন তখন তার মনে উঠে না। লোলঅঙ্গে বজ্রপাদুকার স্পর্শসুখ অনুভব করাইয়া, প্রীতি সম্ভাষণ করে না।

হার্‌লি মনে মনে স্থির করিলেন, বৃদ্ধ ফিরিলে, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিবেন। তারপর, তাঁহার অভি-প্রায় বুঝিয়া—যদি কিছু করিতে হয়—সে কার্য্য নিষ্পন্ন করিবেন। বৃদ্ধ যদি অর্থের প্রত্যাশী হয়, ত যথেষ্ট অর্থ দিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না।

বৃদ্ধ কিন্তু ফিরিল না। হার্‌লি চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন —কোথাও বৃদ্ধের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। নীচে আসি-লেন। যেখানে বৃদ্ধ দাঁড়াইতে বলিয়াছিল, সেইখানে ফিরিলেন। তাহার প্রত্যাগমন প্রত্যাশায়, বহুক্ষণ ধরিয়া, ইতস্ততঃ পাদচারণ করিলেন। বৃদ্ধের ফিরিবার লক্ষণ দেখা গেল না।

হতাশ হইয়া হার্‌লি বাংলায় ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, একজন যুবক তাঁহার দিকে আসিতেছে।

যুবক—সদাশিব। সদাশিব সাহেবের নিকট আসিয়া, সেলাম করিয়া বলিল, "সাহেব! তুমিই কি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অপেক্ষা করিতেছ?"

হার্লি উত্তর করিল, "হাঁ।"

সদাশিব। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।

হার্লি। তিনি যে আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন!

সদা। বলিয়াছিলেন। কিন্তু যে প্রয়োজনে তিনি আপনার কাছে আসিতেন, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে।

হার্লি। আমি যে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।

সদা। তিনি অনন্তপুর ত্যাগ করিয়াছেন।

হার্লি কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, বৃদ্ধ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার ভয়ে তাঁহার সহিত দেখা করিতে সাহস করিতেছে না। তাই, সদাশিবকে অভয় দিয়া বলিলেন,—"বৃদ্ধকে আমার কাছে আসিতে বল। আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি,—তাহার কোনও অনিষ্ট করিব না।

সদাশিব বলিল, "সাহেব, আমি মিথ্যা বলি নাই। সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ অনন্তপুর ত্যাগ করিয়াছেন।"

হার্লি। কবে ফিরিবেন?

সদা। ফিরিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। তোমাকে জানাইবার জন্য, তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।

হার্লি। প্রয়োজনটা কি ছিল, জানিতে পারি কি?

সদা। বলিতে পারি। কিন্তু তাহাতে আমার অনিষ্ট হইবে।

হার্লি। অনিষ্ট?—কে করিবে? তুমি আমা হইতে অনিষ্টের কোনও আশঙ্কা করিও না।

সদা। তোমা হইতে অনিষ্ট না হইতে পারে,—কিন্তু আনন্দদেব জানিতে পারিলে অনিষ্ট হইবে—আমার চাকরী যাইবে।

সাহেব অভয় দিলেন। সদাশিব বলিতে লাগিল। রাজকুমারী সঙ্গিনীর অভাবে কষ্ট পাইতেছেন। তাহার অভাব দূর করিবার ইচ্ছায়, ব্রাহ্মণ আনন্দদেবের কাছে আবেদন করিতে যাইতেছিলেন। অবশ্য আবেদনের উদ্যোগেই ব্রাহ্মণ যে ফল পাইয়াছেন, তাহা ত সাহেবেরও অবিদিত নাই! যাই হ'ক, সে কথা সাহেবকেও জানাইতে তাঁর ইচ্ছা ছিল; কিন্তু একটী সঙ্গিনী মিলিয়াছে বলিয়া, তাঁহার আর আসিবার প্রয়োজন হইল না।

হার্লি। আগে কি সঙ্গিনী ছিল?

সদা। আগে সবই ত ছিল সাহেব! শুধু কি সঙ্গিনী!—কত দরিদ্র রমণী রাজ-অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছে!

হার্লি। এখন?

সদা। আনন্দদেব সব দূর করিয়া দিয়াছে। যে দুই এক জন আছে, তাহাতে রাজা ও রাণীর সম্যক্ পরিচর্য্যা হয় না।

হার্লি। সঙ্গিনী রাখিবে,—তার খরচ যোগাইবে কে?

সদা। সঙ্গিনী আমার স্ত্রী। তাহার অন্য খরচ লাগিবে না। তাহার পিতার যথেষ্ট অর্থ আছে। তবে আমি আনন্দদেবের অধীনে চাকরী করি। যদি কেহ একথা জানিতে পারে, আমার চাকরিটী যাইবে।

হার্লি। ভয় নাই। আমা হইতে একথা প্রকাশ পাইবে না। তবে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ;—তোমরা কেমন করিয়া এ সম্বন্ধ গোপন রাখিবে?

সদা। অনন্তপুর থাকিতে আমাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ হইবে না।

বিস্মিত হইয়া হার্‌লি সদাশিবের মুখের পানে চাহিলেন। দেখিলেন, সুন্দর যুবক স্থিরনেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। তাহার কথায় তিনি অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বুঝিলেন বৃদ্ধ সম্বন্ধে সকলি প্রহেলিকাময়।

সদাশিব সাহেবকে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। হার্‌লি আনন্দদেবের কাছে চলিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সিপাহীগণ ও জনতা যে সময় প্রান্তর ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন রতন প্রতিশ্রুতি পালন করিতে সাহেবের কাছে ফিরিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ও অত্যধিক রক্তস্রাবে তিনি বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণের জন্য তাঁহার বিশ্রামের প্রয়োজন হইল। তিনি বটবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন।

বৃক্ষের অনেকগুলি জটা ভূমি স্পর্শ করিয়া, বহুকাল ধরিয়া ভূমির রস গ্রহণে পরিপুষ্ট, এক একটী স্তম্ভের আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের অন্তরালে বসিয়া, রতন ব্রাউনের দৃষ্টি-পথের বাহিরে পড়িয়াছিলেন।

বসিয়া ব্রাহ্মণ নারায়ণীর কথা ভাবিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, ব্রাউন দূর হইতে যে বালিকাকে দেখিয়াছিলেন, সে নারায়ণী। নারায়ণীই আজ রতনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। নিজের লাঠিগাছটী পাইতে পলমাত্র বিলম্ব হইলে, আবার তাঁহাকে লাঞ্ছিত হইতে হইত।

কিন্তু কেমন করিয়া কোন্ পথ দিয়া নারায়ণী আসিল?

কে তাহাকে দাদার সংবাদ দিল ? আসিল ত এত শীঘ্র ফিরিল কেন ?

রতনের বড় সাধ হইল, পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নগুলার মীমাংসা করিবেন। কিন্তু নারায়ণী আসিল না। বটবৃক্ষের পাশ দিয়া ব্রাউন যাইতেছিলেন। রতন দেখিলেন, কিন্তু দেখা দিলেন না। কিয়ংক্ষণ অন্বেষণ করিতে করিতে, ব্রাউন সুবর্ণরেখার দিকে চলিয়া গেলেন।

পশ্চাৎ হইতে সদাশিব আসিয়া ডাকিল—"পণ্ডিত জী !"

রতন মুখ ফিরাইলেন, এবং সদাশিবকে ফিরিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"পথে আসিতে সাহেবকে দেখিয়াছ ?"

সদা। কোন সাহেব ? যে এইমাত্র চলিয়া গেল, না, যে আপনার অপমান করিয়াছে ?

রতন। আমি তাহারই কথা বলিতেছি।

সদা। সে এখনও সেখানে পায়চারি করিতেছে।

রতন। একটী বালিকাকে দেখিয়াছ ?

সদা। বালিকা অনেক দেখিয়াছি। আপনার লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া, অনন্তপুরের বালক বালিকা পর্য্যন্ত আপনাকে দেখিতে আসিয়াছিল। আপনি বোধ হয় রাজকুমারীর কথা বলিতেছেন।

রতন। তুমি তাহাকে চেনো ?

সদা। দেখিয়া অনুমান করিয়াছি।

রতন। আমাকে লাঠি দিয়া বালিকা কোথায় গেল ? আমি তাঁর জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।

সদা। উৎকণ্ঠার কারণ নাই,—তিনি ঘরে ফিরিয়াছেন।

সাগ্রহে রতন জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি দেখিয়াছ?"

সদাশিব বৃদ্ধকে আশ্বাস দিয়া বলিল—"আমি তাঁহাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিলাম।"

ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার শ্রান্তি দূর হইয়াছে। এইবারে তিনি হার্‌লির কাছে যাইবার উদ্যোগ করিলেন।

সদাশিব কিন্তু অনেক কথা জানিবার জন্য ব্রাহ্মণের কাছে আসিয়াছে। প্রাতঃকালে—কোথাও কিছু নাই সহসা নিরীহ ব্রাহ্মণের এ লাঞ্ছনা কেন হইল? রাজকুমারীই বা ঘরের বাহিরে কেন আসিলেন? সদাশিব এ সমস্ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না।

ভদ্রোচিত হয় না বলিয়া, সদাশিব এ সকল কথা নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করে নাই। এখন সে ব্রাহ্মণের কাছে আসিয়া সকল কথা জানিবার জন্য প্রশ্ন করিল। রতন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা তাহাকে বিবৃত করিলেন। সদাশিব বলিল, সাহেব ব্রাহ্মণেরই অপেক্ষায় এক স্থানে পায়চারি করিতেছে। তাই রতনকে উঠিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সে নরাধমের কাছে আবার আপনার যাইবার প্রয়োজন?"

রতন প্রয়োজনের কথাও তাহাকে বলিলেন। শুনিয়া সদাশিব কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া রহিল। রতন দেখিলেন, যুবকের প্রশস্ত ললাট গভীর চিন্তায় কুঞ্চিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সদাশিব! কি ভাবিতেছ?"

সদাশিবের চমক ভাঙ্গিল। বলিল—"এ কার্য্যের ভার দাসকে দিলে ক্ষতি কি?"

রতন বলিলেন—"ক্ষতি কিছুই নাই। বরং তুমি যদি

সাহেবের কাছে যাও, এবং আমার হইয়া দু'কথা বল, তা হইলে আমি নিশ্চিন্ত হই।”

সদাশিব বলিল—“আমিই যাইতেছি। তবে আমার ফিরিবার পূর্ব্বে আপনি অনন্তপুর ত্যাগ করিবেন না।”

রতন বুঝাইলেন, অনন্তপুরে আর বেশীক্ষণ থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। থাকিলে, আরও বিপদ যে না ঘটিবে, তা কে বলিতে পারে?

তথাপি সদাশিব ব্রাহ্মণকে থাকিতে অনুরোধ করিল। বলিল, “কাশীপুরে আমার শ্বশুরালয়। আপনাকে তাহারই নিকট দিয়া যাইতে হইবে। আমি শ্বশুর মহাশয়কে একখানি পত্র দিব। আপনি যদি দয়া করিয়া পত্র খানি লইয়া যান।”

এরূপ অনুরোধে রতন “না” বলিতে পারিলেন না। তিনি সেই খানেই বসিয়া রহিলেন। সদাশিব সাহেবের কাছে চলিয়া গেল। উভয়ে কি কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সাহেবের সঙ্গে কথা সারিয়া সদাশিব চিঠি লিখিতে ছুটিল, চিঠি লিখিয়াই ব্রাহ্মণের কাছে ছুটিয়া আসিল। ব্রাহ্মণ তাহার হস্ত হইতে পত্র গ্রহণ করিলেন, এবং উষ্ণীষের ভিতর রাখিলেন।

সদাশিব অনেকদূর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে গেল। অনন্তপুরের প্রান্তে আসিয়া রতন দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিলেন। সদাশিব ভূমিষ্ঠ হইয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিল। তাহার মস্তকে করস্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিদায়-কালে গুরু-শিষ্যে কোনও কথা হইল না। রতন নীরবে মুখ

ফিরাইলেন। সদাশিব প্রত্যাশা করিল, ব্রাহ্মণ নারায়ণী সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবেন—এক আধবার তার তত্ত্ব লইতে আদেশ করিবেন। প্রত্যাশায় সদাশিব অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রাহ্মণ আর ফিরিলেন না। সদাশিবের চক্ষু অল্পক্ষণ পরেই ব্রাহ্মণের পবিত্রমূর্ত্তির দর্শনসুখ হইতে বঞ্চিত হইল।

সাহেবদের শিকারে যাওয়া হইল না। ব্রাউন এদিক ওদিক ঘুরিয়া বাংলায় ফিরিলেন। ব্রাহ্মণকে আর দেখিতে পাইলেন না, বালিকারও দেখা মিলিল না।

অল্পক্ষণ পরে হারলিও ফিরিয়া আসিলেন। আনন্দদেবের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল মাত্র—কোনও কথা হয় নাই। পালঙ্কের তলায় পড়িয়া শারীরিক যন্ত্রণায় ও প্রাণভয়ে দেওয়ান একরূপ অজ্ঞানই হইয়া পড়েন। ভৃত্যেরা আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিলেও সম্পূর্ণ-প্রকৃতিস্থ হইতে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হয়। হারলি, তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া যথাযথ উত্তর পাইলেন না। অগত্যা তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। তবে আসিবার সময় আদেশ করিলেন, যেন পিতা ও পুত্রে তাঁহার সহিত বাংলায় সাক্ষাৎ করে।

বাংলায় ব্রাউনের সহিত হারলির পুনঃ সাক্ষাৎ হইল। অপরাধ স্বীকার করিয়া, তিনি সহচরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। দুই বন্ধুতে আবার সদ্ভাব স্থাপিত হইল।

বীরচন্দ্র সম্বন্ধে যতদূর জানা ছিল, সমস্ত ব্রাউনকে বলিয়া, হারলি রাজার উপকারে প্রতিশ্রুত হইলেন। বলিলেন, "যেরূপ করিয়া পারি, রাজপরিবারের কষ্টের লাঘব করিব।"

অপরাহ্ণে ব্রাউন ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। বালিকার পুন-

দর্শনের আশা এখনও তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। হার্লি আনন্দদেবের আগমন প্রত্যাশায় বাংলাতেই বসিয়া রহিলেন।

তখন ফাল্গুনের শেষ—বসন্তের পূর্ণযৌবন। রাজবাটী সংলগ্ন উদ্যানের বৃক্ষ সকল নবপল্লবশোভিত। আম্রবৃক্ষের কতকগুলি মুকুলিত, কতকগুলি তাম্রোদর কিসলয় সমাচ্ছন্ন।

সমীরাভিহত বৃক্ষশাখা ঈষৎ ঈষৎ দুলিতেছিল। দিগন্তলম্বী সূর্য্যের কিরণ পল্লবে পল্লবে প্রতিফলিত হইতেছিল। উদ্যানটী দূর হইতে সফেন-তরঙ্গতাড়িত প্রবালদ্বীপের ন্যায় শোভা পাইতেছিল!

দেখিতে দেখিতে ব্রাউন অগ্রসর হইতেছিলেন। একটী জঙ্গমা উদ্যানলতার অভাবে সে সৌন্দর্য্য তাঁহার চক্ষে যেন অসম্পূর্ণ বোধ হইতেছিল। চলিতে চলিতে তিনি সুবর্ণরেখার তীরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বামে কিছুদূরে রতনের কুটীর। আরও কিছুদূরে বীরচন্দ্রের প্রাসাদ। দক্ষিণভাগে সুবর্ণরেখা বক্রগতিতে অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

প্রাসাদটী দেখিতে ব্রাউনের ইচ্ছা হইল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তিনি বুঝিলেন, সেদিকে প্রাসাদ প্রবেশের দ্বার নাই। কোন্ দিকে যে দ্বার তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। প্রাসাদ প্রাচীর সুবর্ণরেখার জলস্পর্শ করিয়াছিল। ব্রাউন দেখিলেন, একটী হরিণ জলের উপর হাঁটিয়া প্রাচীরের অপর দিক হইতে এদিকে আসিল। তিনি বুঝিলেন, নদীতে অতি অল্প জল। প্রাচীর প্রান্ত দিয়া জলের উপর হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়।

পার হওয়াই তিনি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। প্রাচীরে হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে তীর হইতে অবরোহণ করিতে লাগি-

লেন। হরিণটা তাঁহাকে দেখিয়া আবার একলাফে প্রাচীর পারে অদৃশ্য হইল।

ব্রাউন জলে নামিলেন। হাঁটু পর্য্যন্ত জল হইল। এইখানে প্রাচীরের শেষ। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সে স্থানটী বীরচন্দ্রের অন্তঃপুরসংলগ্ন ঘাট। একটী অনতিবৃহৎ দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বেতপ্রস্তর সোপানাবলী নদীজলে প্রবৃষ্ট হইয়াছে। অন্তঃপুরচারিণীরা সেই ঘাটে স্নানাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পুরুষমাত্রেরই সে স্থানে প্রবেশাধিকার ছিল না। ব্রাউন এদেশের আচার ব্যবহারে সম্পূর্ণ অপরিচিত; তথাপি তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে এখানে আসা তাঁহার অনধিকার প্রবেশ হইয়াছে।

দ্বার বন্ধ ছিল। সেখানে জন প্রাণীর অস্তিত্ব-চিহ্ন ছিল না। পুরী নিস্তব্ধ। কেহ দেখিবার পূর্ব্বেই তিনি স্থান পরিত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন। ফিরিবার পূর্ব্বে, সেই স্থান হইতেই তিনি একবার চারিদিকে দেখিয়া লইলেন; বুঝিলেন, স্থানটী পূর্ব্বে অতি মনোরম ছিল; এখন যত্নের অভাবে তাহার পূর্ব্বশ্রী ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে।

ব্রাউন ফিরিতেছেন, এমন সময়ে, দ্বারের কবাটে শব্দ হইল। তিনি বুঝিলেন, ভিতর হইতে কে দ্বার খুলিতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি প্রাচীর-পারে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

নারায়ণী দ্বার খুলিতেছিল। সে সমস্ত দিন তাহার প্রিয় হরিণটীর সংবাদ লইতে পারে নাই। বালিকা সমস্ত দিনটা অতি মনোকষ্টেই যাপন করিয়াছিল। দাদার অপমান দর্শনে, অবশেষে তাঁহার বিচ্ছেদে সে মর্ম্মাহত হইয়াছিল। সমস্তদিন

সে ব্রাহ্মণের বিষয়ই ভাবিয়াছিল। হরিণের চিন্তা করিবার অবকাশ পায় নাই। রাজা ও রাণী তাঁহারই মতন মর্ম্মপীড়ায় দিন যাপন করিয়াছেন। হরিণের কথা কাহারও মনে ছিল না।

এখন মনে পড়িয়াছে, তাই নারায়ণী খাদ্য লইয়া হরিণটীকে খুঁজিতে আসিয়াছে। বাহিরে আসিয়া নারায়ণী ডাকিল, "শারী"।

"শারী" কোথায় ছিল, ছুটিয়া আসিল। এক বৎসর পূর্ব্বে শারীর সহিত পাঠকের সাক্ষাৎ হইয়াছে। এই এক বৎসরে, সে অনেকটা বড় হইয়াছে। সমস্ত দিবসের পর নারায়ণীকে দেখিয়া "শারীর" আনন্দ উথলিয়া উঠিয়াছে। সে নারায়ণীর সম্মুখে আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। নারায়ণী দুই হাতে পাত্রটী ধরিয়া তাহার মুখের কাছে তুলিয়া রহিল। "শারী" আহারে নিযুক্ত হইলে, তাহার সঙ্গে কথা আরম্ভ করিল। সুখ দুঃখের কথা শুনিতে "শারী" এখন বালিকার এক মাত্র সঙ্গী।

"শারী" কথা ব্রাউনের কাণে গেল। কি বীণার কোমল ঝঙ্কার! সমীরণে মাখামাখি হইয়া সে মধুময় কণ্ঠস্বর অপর পারের নদীসৈকতে যেন খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ব্রাউন প্রাচীর পার্শ্বে জলের উপর দাঁড়াইয়া। ফিরিতেও পারেন না, অগ্রসর হইয়া দেখিতেও পারেন না। পিছাইতে শক্তি নাই, অগ্রসর হইয়া দেখিতেও সাহস নাই। চুরি করিয়া দেখা অসভ্যতা। ব্রাউন বড়ই বিপন্ন হইলেন। কেহ দেখিলে, লজ্জার কথা। ফিরিয়া আসাই কর্ত্তব্য বোধ করিয়া, তিনি উপরে উঠিতে লাগিলেন।

আবার কণ্ঠস্বর! এবারে সুধার স্রোত ছুটিল। যুবক তাহাতে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান ভাসিয়া গেল।

সুধার প্রস্রবিণীটীকে দেখিতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল। তিনি ভাবিলেন, চুরি করিয়া দেখিয়া, চলিয়া যাই।

অতি ধীরে ব্রাউন্ জলে পদবিক্ষেপ করিলেন, পাছে জলের শব্দে কথার স্রোত রুদ্ধ হয়।

নারায়ণী "শারীর" সঙ্গে কত কথাই কহিতেছিল। "দাদা আমা হইতেও তোমাকে অনেক ভাল বাসিত, অধিক যত্ন করিত, আমাকে মাঝে মাঝে তিরস্কার করিত, কিন্তু তোমাকে করিত না। শারী! সেই দাদা চলিয়া গিয়াছে,—উভয়কেই ভুলিতে চলিয়াছে, আর বুঝি আসিবে না, গাছের ডাল নোয়াইয়া, আর তোমাকে আম্রের মুকুল খাওয়াইবে না" -এইরূপ নানা দুঃখের কথা সঙ্গীটীকে শুনাইতেছিল। "শারী" একবার করিয়া নারায়ণীর মুখপানে চাহিতেছিল। ধীরে ধীরে মুখ বাড়াইয়া ব্রাউন এই ছবিটী দেখিতে পাইলেন।

বালিকার ঈষন্নমিত অঙ্গযষ্টি—দুই হাতে ধরা থালা—সম্মুখে মুখ তুলিয়া, চোখের পানে চাহিয়া, চোখে চোখে সাদৃশ্য খুঁজিতে অবস্থিত হরিণ! -চারিদিক বেড়িয়া—নিম্নে, উপরে, অস্তগামী সূর্য্যকিরণে অরুণিম দিগ্‌বলয়,—কি সুন্দর ছবি! নবযৌবনশ্রী—সুবর্ণময়ী প্রকৃতির উপহার, চারিদিক হইতে ভারে ভারে আসিয়া, বালিকার দেহ যষ্টি নোয়াইয়া দিয়াছে।

এক দৃষ্টে ব্রাউন নারায়ণীর মুখ দেখিতে লাগিলেন। হরিণের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বালিকার মধুময় কণ্ঠস্বর, হৃদয়গত আবেগরাশির সঙ্গে সঙ্গে পরদায় পরদায় উঠিতেছিল।

ব্রাউন এরূপ মূর্ত্তি কখন দেখেন নাই, এরূপ স্বরও কখন শুনেন নাই। তিনি এদেশের ভাষা জানিতেন না, সুতরাং

নারায়ণীর কথার এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেছিলেন না। বুঝিতে পারিতেছিলেন না বলিয়া, সে স্বর তাঁহার পক্ষে বড়ই মধুর লাগিতেছিল—স্বর্গচ্যুতা কল্পনাময়ী দেবগীতির ন্যায় তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল।

স্বদেশে, "হ্রদ প্রদেশের" সুনীল-জল শৈল-সরোবরের তীরে বসিয়া কতদিন তিনি বাসন্তী সন্ধ্যার অভ্যুদয় দেখিয়াছেন। অরুণিম গগনের যবনিকান্তরাল হইতে, প্রহেলিকাময়ী 'চাতকী'র অজস্র বর্ষিত স্বরসুধায়, কতদিন নিজের হৃদয় সিক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এমন সন্ধ্যাও কখন দেখেন নাই, এমন তৃপ্তিও কখন পান নাই।

সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব্বে, নারায়ণীর মুখে একবার কিরণ মাখাইয়া দিল। সোনার কমল সহস্র গুণ শোভা ধারণ করিল। আত্মহারা যুবক বলিয়া উঠিল "আহা! কি দেখিলাম!"

ব্রাউন সম্ভ্রান্ত ইংরাজের উত্তরাধিকারী—রূপবান, গুণবান যুবক। এরূপ পাত্রে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলে, বিলাতের বহু সুন্দরী আপনাদিগকে ভাগ্যবতী বিবেচনা করিতেন। বিলাতে, ব্রাউনের বহু সুন্দরীর দর্শন লাভ ঘটিয়াছিল। স্বদেশে, তিনি অনেক বরাঙ্গনাকে সন্ধ্যারুণে সুন্দর মুখশ্রী রঞ্জিত করিতে দেখিয়াছেন; কিন্তু কষিত কাঞ্চন-গৌরী অরুণ-কিরণে প্রতিফলিত হইলে কিরূপ দেখায়, তাহা তিনি স্বপ্নেও কখন অনুভব করেন নাই। নারায়ণীর সৌন্দর্য্য, ও চিত্রলিখিতবৎ অবস্থানভেদ ব্রাউনের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত করিয়াছিল। মুগ্ধ যুবক বলিয়া উঠিল, "আহা কি দেখিলাম!"

একটা কিম্ভূত দুর্ব্বোধ্য স্বর শুনিয়া নারায়ণী চমকিয়া উঠিল। প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরাইয়া, যেমনি ব্রাউনকে দেখিল, অমনি বালিকা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। হাত হইতে থালা পড়িয়া গেল। পলাইবার জন্য যেমন দ্বারের দিকে ছুটিবে, অমনি দ্বারের চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়া 'মা' বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। "ভয় নাই, ভয় নাই" বলিয়া, কারণ নির্দ্ধারণের জন্য, অন্তঃপুর হইতে রাণী ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, প্রাণপ্রতিমা নারায়ণী, বিলুপ্তসংজ্ঞায় ভূলুণ্ঠিতা। রাণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। নাতিনীকে বুকে তুলিয়া ডাকিলেন, "মা, আমার!" উত্তর পাইলেন না। তখন কোলে তুলিয়া, রাজাকে ডাকিতে ডাকিতে গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

হতবুদ্ধি ব্রাউন, চোরের ন্যায়, সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। বালিকার কি ঘটিল—বাঁচিল কি মরিল, জানিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না।

নারায়ণীর চীৎকার শুনিয়া, রাজাও ছুটিয়া আসিতেছিলেন। আসিতে আসিতে উপর হইতে তিনি দেখিলেন, একজন সাহেব স্ুবর্ণরেখার তীর ধরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ইতিমধ্যে রাণী নারায়ণীকে কোলে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নারায়ণী তখনও মূর্চ্ছিতা। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"হইল কি!" রাণী নারায়ণীর মূর্চ্ছার কথা মাত্র জ্ঞাপন করিলেন। কারণ জানেন না, সাহেবকে তিনি দেখেন নাই, কাজেই আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

পলায়নপর সাহেবকে দেখিয়া, রাজা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, নারায়ণীর মূর্চ্ছার কারণ কি। তিনি ভাবিলেন একি অত্যাচার!

আর কোন্ কাপুরুষইবা এ অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে পারে? প্রভাতে ব্রাহ্মণের অপমানে তিনি আপনাকেই অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের অঙ্গে প্রহারযাতনা তাঁহার শরীরে বিষের জ্বালা উৎপন্ন করিয়াছিল। এখন আবার একি! তাঁহারই পৌত্রীর উপর অত্যাচারের উদ্যোগ! বৃদ্ধ রাজার অবসাদময় নিষ্ক্রিয় ধমনীতে উষ্ণ রক্তের স্রোত ছুটিল। একবার ভাবিলেন, ছুটিয়া গিয়া এই মুহূর্ত্তেই এই বিষম অপমানের শোধ লই। কিন্তু ব্রাউন তখন বহুদূরে. দেখিতে দেখিতে দৃষ্টিপথের অন্তরালে। রুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় তিনি অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

পিতামহীর কোলে থাকিতেই নারায়ণীর সংজ্ঞা ফিরিল। রাণী তাহাকে ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; রাজা নিষেধ করিলেন, বলিলেন, কারণ আমার কাছে শুনিও; বালিকাকে প্রশ্নে পীড়িত করিও না—গৃহে লইয়া সুশ্রূষা কর। আর সতর্ক থাকিও, নারায়ণীকে কখন একা গৃহের বাহিরে আসিতে দিওনা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সমস্ত রাত্রি ব্রাউনের নিদ্রা হইল না। নীচ কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন, মনকে অশেষ প্রবোধ দিয়াও, তিনি সে কার্য্যের সমর্থন করিতে পারিলেন না। অনুতাপে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। বালিকার কোনও অনিষ্ট ঘটিল কিনা জানিবার উপায় নাই। দেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ তিনি কাহাকে কি বলিবেন! কেমন করিয়া

নিজের নির্দ্দোষতা প্রতিপন্ন করিবেন! কেই বা তাঁহার ক-
বিশ্বাস করিবে! সহচরের কাছে মনোভাব প্রকাশ করিতে
তাঁহার সাহস হইল না। প্রকাশে কোনও ফল নাই, পরন্তু
নিরপরাধ হইয়াও, অপরাধী হার্‌লির কাছে তাঁহাকে মাথা
হেঁট করিয়া থাকিতে হইবে। অনুতাপ-দগ্ধ যুবক সমস্ত রাত্রি
অনিদ্রায় যাপন করিলেন।

প্রভাতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া, পদব্রজেই ব্রাউন রাঁচি
প্রস্থান করিলেন। স্থির করিলেন, "দেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞ
হইয়া, আর একবার আমি অনন্তপুরে ফিরিব। বালিকার
হৃদয়ে পিশাচ মূর্ত্তির ছবি রাখিয়া জীবন ধারণ করিব না।"

হার্‌লিও বিশেষ কোন কাজ করিতে পারেন নাই। আনন্দ-
দেব আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইল, রাজকুমারীর জন্য অতিরিক্ত
ব্যয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষ। সাহেব যদি আদেশ দিতে
পারেন, তাহা হইলে দেওয়ানও রাজকুমারীর জন্য যত ইচ্ছা
দাসী নিযুক্ত করিতে পারে। হার্‌লি সে আদেশ দিতে সাহসী
হইলেন না। স্থির করিলেন, "ডেপুটী কমিসনারের সঙ্গে
পরামর্শ করিয়া আদেশ দিব।"

আহারের সময় উভয় বন্ধুতে একত্রিত হইলেন। নিজ
নিজ মনোভাব পরস্পরের কাছে গোপন করিয়া কথাবার্ত্তা
কহিলেন।

প্রভাতে উঠিয়া হার্‌লি সহচরকে দেখিতে পাইলেন না।
ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কিছু বলিতে পারিল না।
ভাবিলেন, ব্রাউন বেড়াইতে গিয়াছেন; অনন্তপুরের মধ্যেই
কোথাও আছেন। প্রাতরাশের সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও

আ৴ ।দেখিলেন ব্রাউন আসিলেন না, তখন তাঁহার মনে সন্দেহ হইল, হয়ত তাঁহার উপর ব্রাউনের ঘৃণা এখনও দূর হয় নাই। তথাপি তিনি ব্রাউনের সন্ধানে লোক নিযুক্ত করিলেন। মুকুন্দ আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন; সে বলিতে পারিল না। লোক সকল ফিরিয়া আসিল; তাহারা সাহেবকে দেখিতে পাইল না। একজন কেবল ব্রাউনের রাঁচিগমনের সংবাদ দিল; কতকগুলা কোল মজুরী করিতে অনন্তপুরে আসিতেছিল, তাহারা সাহেবকে রাঁচির পথে দেখিয়াছে।

তথাপি হার্‌লি ব্রাউনের অপেক্ষায় সে দিনের মত অনন্তপুরে থাকিবেন স্থির করিলেন। বিকালে রাঁচি হইতে এক পত্র আসিল। ডেপুটী কমিসনর তাঁহাকে অচিরে রাঁচি ফিরিতে আদেশ করিয়াছেন।

পত্র পাঠে হার্‌লি বিস্মিত হইলেন। তাঁহার এত শীঘ্র রাঁচি ফিরিবার প্রয়োজন ছিল না। অনিচ্ছায় তাঁহাকে অনন্তপুর ত্যাগ করিতে হইল। ত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে আনন্দদেব তাঁহাকে বিদায় দিতে আসিলেন। অশুভশঙ্কী মন লইয়া হার্‌লি দেওয়ানের কাছে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কাশীপুরে একজন সমৃদ্ধিশালী জমীদারের বাস। এবং তাঁহাকেই উপলক্ষ করিয়া বহুলোক এই স্থানে অবস্থিতি করে। অনেকেই সঙ্গতিসম্পন্ন। কেহ রাজার আত্মীয়, কেহ বা কর্ম্ম-চারী। সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় রাজবাড়ী, কাছারীবাড়ী, দেবালয় প্রভৃতিতে সুসজ্জিত এই ক্ষুদ্র গ্রাম, দূর হইতে এক খানি ছবির ন্যায় দেখাইত।

দুই দিন পরে রতন কাশীপুরে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের বহিস্থ প্রান্তরে যখন তিনি পা দিলেন, তখন সূর্য্য প্রান্তর সীমায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। গ্রামে উপস্থিত হইতে সন্ধ্যা হইল। কাশীপুরের শোভা দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণ গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সদাশিবের শ্বশুরের নাম শৈলজানন্দ সিংহ। পত্রের পৃষ্ঠে ওই নামই লেখা ছিল। তবে অতবড় নামটা সর্ব্বদা মুখে আনা সুবিধা হয় না বলিয়া, লোকে নামটাকে খাটো করিয়া 'শলুই' করিয়া লইয়াছিল। ক্রমে 'শলুই' আখ্যাটাই প্রাধান্য লাভ করিল। এমন কি, দুই চারি জন আত্মীয় ও ভদ্রলোক ছাড়া অনেকেই ভাল নামটী ভুলিয়া গিয়াছিল। গ্রামের মধ্যে পশার প্রেতিপত্তি থাকিলেও, শৈলজানন্দ বলিলে অনেকেই তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন না।

রতন একজন আগন্তুককে শৈলজানন্দের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—"শৈলজানন্দ বলিয়া কেহ সে গ্রামে নাই।" রতন মনে করিলেন, লোকটা গ্রামবাসী হইলেও গ্রামের সকলকে চিনে না। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করাতে, সে বলিল, "শৈলজানন্দ বলিয়া রাজার একটা হাতী ছিল; তা সেটা বছর খানেক হইল মরিয়া গিয়াছে।"

এইরূপ, ব্রাহ্মণ যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, সেই ব্যক্তিই একটা উদ্ভট রকমের উত্তর দেয়। কেহ বলে "শৈলজানন্দ রাজার পূর্ব্বপুরুষ। তিনি শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন।" কেহ বলে, "সে একজন বড় গোছের জোয়ারী। একদিন রাজার সঙ্গে প্রেমারা খেলিতে খেলিতে লাখো টাকা জিতিয়া লয়। রাজা তাঁহাকে খেলা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলেন। লোকটা কিন্তু লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, আরও খেলিতে লাগিল। শেষে এক ডাকে সমস্ত টাকা হারিয়া গেল। রাজার হাতে ছিল "মাছ," আর তার হাতে ছিল "কাতুর"। লোকটা কাতুর কাতুর করিয়া দম ফাটিয়া মরিয়া গেল। এখন আর শৈলজানন্দ নাই—তাহার ভুত আছে। সে এখনও রাজবাড়ীর কানাচে রাত্রিকালে কাতুর কাতুর বলিয়া চীৎকার করে।" এইরূপ নানাকথা শুনিতে শুনিতে রতন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন, "সদাশিব কি শ্বশুরের নাম লিখিতে ভুলিয়া গেল?"

পথের ধারে একটী সুন্দর সরোবর দৃষ্ট হইল। রতন মনে করিলেন, শৈলজানন্দের সংবাদ লইতে আর বৃথা রাত্রি করি কেন? এই বেলা সময় থাকিতে থাকিতে রাজার দেবালয়ে

অতিথি হই। সমস্ত দিন পথে আহার করিবার সুবিধা পান নাই। পূর্ব্ব দিন সামান্য আহার জুটিয়াছিল মাত্র। ব্রাহ্মণের হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলা। পদ ধৌত করিতে তিনি সরোবরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সেখানে, সরোবর সোপানে একটী যুবতী একটী বালককে প্রহার করিতে নিযুক্ত ছিল। বালক দৃঢ়রূপে রমণীর অঞ্চল ধরিয়াছিল। রমণী তাহার হস্ত হইতে অঞ্চল চ্যুত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। বালকও অঞ্চল ছাড়ে না, রমণীরও প্রহার কার্য্যের বিরাম নাই।

ঘাটে নামিতে নামিতে রতন তাহাদিগকে দেখিতে পাই-লেন। দেখিয়া বুঝিলেন, উভয়েই বিপন্ন। বালক নিজের জেদ কিছুতেই ছাড়িবে না, রমণীরও প্রহার ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

বিপন্ন বুঝিয়া তিনি তাহাদের কাছে চলিলেন। নিকটে গিয়া দেখেন, যুবতীটী যেমন সুন্দরী, বালকটীও তেমনি সুন্দর। রমণীর বয়স অনুমান পঞ্চবিংশতি, বালকের বয়স দশ। বালক কর্ত্তৃক আকৃষ্ট বসন, অঙ্গ হইতে অর্দ্ধ-বিচ্ছিন্ন চেলাঞ্চল, আলু থালু কেশ পাশ, আলু থালু বেশ—পূর্ণ যৌবন-লাবণ্যে ঢলঢল সুন্দরী! সম্মুখে ক্রোধরাগরঞ্জিত মুখখানি লইয়া চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া গড়া পুতুল—অপূর্ব্ব জেদী দুরন্ত বালক! যেন পূর্ণ প্রস্ফুটিত কমলের পার্শ্বে নবাবতার কমল-কোরক মুখামুখি দাঁড়াইয়া যে যার রূপ কাড়াকাড়ি করিতেছে।

নীরবে প্রহার কার্য্য চলিতেছিল। সরোবরের পার্শ্ব দিয়া কত লোক যাতায়াত করিল, কেহ দেখিল না। রতন তাহা-দের সমীপস্থ হইলেও তাহারা ফিরিয়া চাহিল না। রমণী

বালকের পৃষ্ঠে যেমন চাপড় মারিতেছিল, তেমনই মারিতে লাগিল; বালক যেমন কাপড় ধরিয়া টানিতেছিল, তেমনই টানিতে লাগিল।

রতন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"কর কি মা! বালক যে মারা যায়!" অপরিচিত পুরুষকে সমীপস্থ দেখিয়া, রমণী অঙ্গ ঢাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বালক কিছুতেই তাহা করিতে দিল না। রতন তখন বুঝিলেন যে, রমণীই অধিকতর বিপন্না। তিনি আর সময়ক্ষেপ না করিয়া বালকের হাত ধরিলেন, অতি কষ্টে কাপড় হইতে হাত ছাড়াইলেন। বালক কাপড় ছাড়িয়া, রতনকে ধরিল। হাত ছুঁড়িয়া, পা ছুঁড়িয়া, ক্ষুদ্র মুষ্টিদ্বারা অবিরত প্রহার করিয়া রতনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল; নখাঘাতে জর্জরিত করিল। বালকের অত্যাচারে রতন বড়ই আনন্দ অনুভব করিলেন। নারায়ণীর পরে, আর কেহ তাঁহাকে এরূপ মধুময় অত্যাচরে উৎপীড়িত করে নাই। বৃদ্ধের লাঞ্ছনা দেখিয়া রমণী কিন্তু লজ্জিতা হইল। সর্ব্বগাত্র সাবধানে আবৃত করিয়া আঁচলে কোমর বাঁধিয়া, আগে সে আপনাকে বালকের সহিত যুঝিবার উপযোগী করিয়া লইল। তারপর বালককে পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল। বলিল—"এ দুষ্ট বালক আপনি রাখিতে পারিবেন না, আমাকে দিন।"

রতন বলিলেন—"আমি ইহাকে আয়ত্তে আনিয়াছি। কোথায় যাইতে হইবে বল, কোলে লইয়া যাই।"

বস্তুতঃ, বালক তখনও পর্য্যন্ত আয়ত্তে আসে নাই। রতন ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহাকে আয়ত্তে আসিতে দেন নাই। বালককে

তাঁহার বক্ষে, স্কন্ধে, মস্তকে যথেচ্ছা প্রহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এই অল্পমাত্র সময়ের মধ্যে তাঁহার উষ্ণীষটী মৃত্তিকা আশ্রয় করিয়াছে, মাথার দুই চারি গুচ্ছ পক্ক কেশ স্থানচ্যুত হইয়াছে।

যুবতী ব্রাহ্মণের কথায় প্রতিবাদ করিল না। বৃদ্ধের উষ্ণীষটী ধূলায় মাখামাখি হইতে ছিল, সেইটী তুলিয়া তাঁহার হাতে দিতে গেল। উষ্ণীষ তুলিতে দেখিতে পাইল, সেই সঙ্গে একখানি পত্রও পড়িয়া রহিয়াছে। উষ্ণীষের সঙ্গে পত্রখানি ব্রাহ্মণের হাতে দিতে গিয়া, সে দেখিতে পাইল, পত্র শিরে "শৈলজানন্দ সিং" নাম লেখা।

যুবতী বৃদ্ধের মুখ পানে চাহিল। ব্রাহ্মণ তখনও বালকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। অবসর পাইয়া, সে শিরোনামাটা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। চারিদিক হইতে অন্ধকার মেদিনীকে আবৃত করিতে আসিতেছিল; তাহার কিছু অংশ পত্রশিরে পতিত হইল; এবং রমণীর পিপাসিত দৃষ্টিকে অতৃপ্ত রাখিয়া, অক্ষরগুলির সমীপ হইতে ধীরে ধীরে সরাইয়া দিল। ব্রাহ্মণ উষ্ণীষের সঙ্গে পত্রখানি গ্রহণ করিতে গিয়া বুঝিলেন, রমণীর হস্ত ঈষৎ কম্পিত হইতেছে।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমার মতন রসজ্ঞ হইলে স্থির করিতেন, অক্ষর কয়টীর গায়ে একটু সোমরস মাখান ছিল। দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইয়া, যুবতীর মনে একটু মাদকতার সঞ্চার করিয়াছিল। হৃদয়তরঙ্গের একটু অংশ বাহুবল্লীতে ভর করিয়া পত্রপুষ্পখানিকে ঈষৎ ঈষৎ আন্দোলিত করিয়াছিল। রসহীন ব্রাহ্মণ স্থির করিল, ওটা অতি পরিশ্রমের [illegible]

কের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিশ্রান্তা রমণীর হাতখানি প্রহার-প্রযত্নে অবসন্ন হইয়াছে।

পত্রখানি পুনর্গ্রহণ করিয়া রতন যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন —"শৈলজানন্দকে জান ?"

"জানি।"

"বাঁচাইলে। তাহার অনুসন্ধান করিয়া আমি হতাশ হইয়াছি।"

"আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ?"

"বহুদূর হইতে। দুই দিন ধরিয়া পথ চলিতেছি।"

"আমার সঙ্গে আসুন।"

রমণী. শৈলজানন্দের ঘর দেখাইতে ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া চলিল। প্রহারে প্রতিপ্রহার না পাইয়া, বৃদ্ধকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অনভিজ্ঞ জ্ঞানে, বালক দয়া করিয়া রণে ক্ষান্ত দিল। এবং অনন্যোপায় হইয়া ব্রাহ্মণের কাঁধে মাথা রাখিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এমন সুন্দর শ্রুতিমধুর "শৈলজানন্দ" নাম, ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, সুতীব্র কটকটে "শলুই" হইল কেন ? শৈশবের "গুয়ী," কৌমারে "গোবরা," কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অলঙ্কারশোভিত "গোবর্দ্ধন" হয়। আর শৈলজানন্দের অদৃষ্টে, এমন অনুলোম-প্রক্রিয়া কোন্ দৈবদুর্ব্বিপাকে বিলোম হইল ! আদ্যন্ত বিচ্ছিন্নাঙ্গ

হইয়া, নাম বেচারী, কি ঘোর অপরাধে এমন বিপন্ন হইল! শ্রীভ্রষ্ট—গ্রামবাসীর পর্য্যন্ত অপরিচিত, একজন রমণীর নির্দ্দেশে, নামটীকে যদি অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সে নামের মূল্য কই! রমণীর দর্শনলাভ না ঘটিলে. ব্রাহ্মণকে আজ অতিথিশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত! চিন্তার কথা। ব্রাহ্মণও পথ চলিতে চলিতে, বিষম চিন্তায় আক্রান্ত হইলেন। গ্রামবাসী যার নাম জানেনা, সে কেমন লোক! একবার মনে করিলেন রমণীকে জিজ্ঞাসা করি। আবার ভাবিলেন. একটু পরেইত শৈলজানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইবে; তখনই সন্দেহটা মিটাইয়া লইব।

রমণী দূর হইতে শৈলজানন্দের বাড়ী দেখাইয়া দিল। বলিল, "চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে যে দ্বার, তাহা দিয়া বাটীতে প্রবেশ করিবেন না। আরও কিছু আগে, একটা সরু পথের ধারে একটী ক্ষুদ্র দ্বার আছে। সেই দ্বার দিয়া ভিতরে যাইবেন। নতুবা দেখা হইবে না।" রতনের বিস্ময় বাড়িয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?"

রমণী উত্তর দিলনা। বালককে ব্রাহ্মণের কোল হইতে নামিতে আদেশ করিল।

রতন বলিলেন, "অতি পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, বালক আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়াছে।"

তখন তাঁহার কোল হইতে বালককে গ্রহণ করিয়া, রমণী অন্য পথে প্রস্থান করিল।

রমণী যদি নিষেধ না করিত, তাহা হইলে বোধহয় রতন ছোট দ্বারটী দিয়াই বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতেন। রমণীর

নিষেধে, রতনের কৌতুহল হইল। তিনি ভাবিলেন, সদর দরজা দিয়াই বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি না কেন?

দরজার দুই পার্শ্বে বাঁধান রোয়াক। একটীর উপর বসিয়া, একজন লোক সিদ্ধি ঘুঁটিতেছিল। আর চারি পাঁচজন তাহাকে ঘেরিয়া গল্প জুড়িয়াছিল। গল্পের বিষয় অবশ্য সিদ্ধি। এবং সেই সঙ্গে মিশ্রিত 'সেকাল' ও 'এ কাল'। 'সেকাল'টা চিরদিন ভদ্রলোক; কিন্তু দুঃখের বিষয় 'একাল' কিছুতেই সেরূপটী হইতে পারিল না। সেকালের সিদ্ধি ছুঁইলেই নেশা হইত, একালের সিদ্ধি এক পেট খাইলেও নেশার আমেজটী পর্য্যন্ত আসে না। বেশি যে আহার করিয়া নেশাটা গুছাইয়া লইবে, তাহারও উপায় নাই। কেন না, একালের উদর কত তফাৎ! সেকালের উদর স্থিতিস্থাপক, অনন্ত আহার্য্যের স্থান ছিল। একালের উদর সঙ্কোচব্যাধিগ্রস্ত—খাদ্য আছে, রাখিবার স্থান নাই। আর খাদ্য বা দেয় কে! সেকালের লোক পরকে খাওয়াইতেই তৃপ্তিলাভ করিত, একালের লোক পরের অন্ন কাড়িয়া খায়। তারপর, কে কার কাড়িয়াছে, কেমন করিয়া কাড়িয়াছে, ইত্যাদি নানা কথার ভিতরে শৈলজানন্দ সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা অনতিউচ্চস্বরে চলিয়া গেল। এমন সময় রতন তাহাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গল্পে সন্নিবিষ্টচিত্ত, তাহারা প্রথমে রতনকে দেখিতে পাইল না, আপনার মনে কথাই কহিতে লাগিল। কথার মধ্যে, দুই চারিটা 'শলুই' শব্দ রতনের কাণে গেল! সুতরাং তাহাদের গল্প রতনের সম্যক বোধগম্য হইল না। তিনি আর অপেক্ষা না করিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই কি শৈলজানন্দ সিংএর বাড়ী?"

একজন উত্তর দিল—"না।"

ইহাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে রতনের পূর্ব্বে দেখা হইয়াছিল। সে পরিচিতস্বর শুনিয়া মাথা তুলিয়া বলিল—"এখনও তুমি ঘুরিয়া বেড়াইতেছ ?"

রতন বলিলেন, "শৈলজানন্দের গৃহ অন্বেষণ করিতেছি।"

ব্রাহ্মণের মুখে দ্বিতীয়বার শৈলজানন্দের নাম শুনিয়া, লোকটা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। বলিল—"তাঁহাকে খুঁজিতে চাও, যমের বাড়ী যাও; এখানে কেন? বন্ধুবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"শৈলজানন্দ ব'লয়া যে ভুতটা রাজার বাড়ীর কানাচে ঘুরিয়া বেড়ায়, এ বৃদ্ধ তাহারই অন্বেষণ করিতেছে।"

বন্ধুবর্গ বৃদ্ধের দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাইয়া বড়ই বিস্মিত হইল; এবং লোকটাকে উন্মাদ স্থির করিল। তখন সকলেই সেই প্রেতাত্মা সম্বন্ধে দুই একটা গল্প করিল। একজন তাহার সানুনাসিক স্বর শুনিয়াছিল, একজন গাছের ডাল ভাঙ্গিতে দেখিয়াছিল, আর একজন তালবৃক্ষসম জঙ্ঘাদ্বয়ের চাপে একটা হাতীকে মারিয়া ফেলিতে দেখিয়াছে। সকলেই বৃদ্ধকে শৈলজানন্দের অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হইতে বন্ধুভাবে নিষেধ করিল।

রতন, বাটীর মালিকের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকগুলা নাম বলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল—"এ বাটীর মালিকের সঙ্গে তোমার কি প্রয়োজন?"

রতন বলিলেন,—"প্রয়োজন না থাকিলেও, নাম জানিতে দোষ কি?"

প্রয়োজন নাই শুনিয়া, সে লোকটা নাম বলিল, 'শলুই সিং।'

তখন, রতনের বুঝিতে আর বাকী রহিল না। "শলুই" নাম তিনি এই একটু আগে শুনিয়াছেন। বুঝিলেন, শলুই শৈলজানন্দের অপভ্রংশ।

আর কোনও কথা না বলিয়া, ব্রাহ্মণ দ্বারসমীপে উপস্থিত হইয়া কবাটে ঘা মারিলেন। দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। দুই চারিবার ঘা দিলেন, "ভিতরে কে আছ, দুয়ার খোল"—বলিয়া বার দুইচার চীৎকার করিলেন—দ্বারমুক্ত হইবার লক্ষণ দেখা গেল না। রোয়াকের লোকগুলা চুপ করিয়া দেখিতে লাগিল। বিফলমনোরথ হইয়া, যখন রতন ফিরিলেন, তখন সকলে 'হো হো' করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রতন ভাবিলেন, "ভ্যালা আপদ! সারাদিন উপবাসী থাকিয়া, এ কোথায় আসিলাম!" চিঠিখানা দিতে পারিলেও, নিশ্চিন্ত হইতে পারেন ভাবিয়া, তিনি ক্ষুদ্রদ্বারের সন্ধানে চলিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অন্ধকার গাঢ়তর হইয়াছিল। সদরপথ ছাড়িয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে রতনের পদস্খলন হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি রমণীকথিত সঙ্কীর্ণপথে উপস্থিত হইলেন। পথ এত সরু, যে দুইজনের পাশাপাশি চলা অসম্ভব। দুইধারেই ছোট জঙ্গল—ঘনসন্নিবিষ্ট গুল্মরাজি—অধিকাংশই কণ্টকময়। মধ্যে ভূমিপৃষ্ঠে মনুষ্যের পদপ্রহারজাত একটী মাত্র ক্ষীণরেখা, কোন স্থানে দৃশ্য, কোন স্থানে লুপ্ত প্রায়।

সেই সঙ্কীর্ণপথে পদ দিতে বৃদ্ধ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এরূপ পথে চলিয়া কি সাপের মুখে প্রাণ দিব! সদাশিবের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ না হইলে, রতন ফিরিতেন। সমস্তদিন অনাহারে পথ চলিয়া, তিনি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্রামের বড়ই প্রয়োজন হইয়াছিল। তথাপি রতন অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর যাইতেই, একজনের সঙ্গে দেখা হইল। সে বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিল। রতনকে দেখিয়াই সে প্রশ্ন করিল "কে তুমি?" রতন প্রথমে কোনও উত্তর দিলেন না, চলিতে লাগিলেন। পরস্পরে মুখোমুখি হইলেন। তখন একজনকে পথ ছাড়িয়া না দিলে অন্যের চলা অসম্ভব। লোকটা উত্তর না পাইয়া পুনঃ প্রশ্ন করিল, "কে তুমি?"

রতন এবারেও উত্তর দিলেন না, যথাসম্ভব সরিয়া লোকটাকে যাইতে পথ দিলেন।

উত্তর না পাইয়া লোকটা বিরক্ত হইল। কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে বলিল, "উত্তর দাওনা কেন, চোর নাকি?"

"আমি বিদেশী।"

"পথ ভুলিয়াছ; ফিরিয়া যাও।"

"এ পথে কি কোথাও যাওয়া যায় না? কোন গৃহস্থের বাড়ী—যেখানে অন্ততঃ এক রাত্রের জন্য বিশ্রাম করিতে পারি?"

"তোমার কি দৃষ্টিভ্রম হইয়াছে? এ জঙ্গল দেখিতেছ না? এখানে বাড়ী কোথা!"

"তুমিও কি জঙ্গলের সামিল? না গাছের ডালে ডালে

বাস কর। বাড়ী যদি না থাকে, পথ যদি না থাকে, ত তুমি কেমন করিয়া আসিলে?”

লোকটা এবারে বড়ই রাগিল। তাহার রাগ হইবারই কথা! একটা কোথাকার কে বিদেশী আসিয়া তাহাকে সমান উত্তর দিতে সাহস করে! অন্ধকারে সে ব্রাহ্মণের মুখখানা একটু কষ্ট করিয়া দেখিয়া লইল—দেখিল বৃদ্ধ। তখন ক্রোধ-কর্কশ-স্বরে বলিল “বৃদ্ধ বয়সে অপঘাতে মরিবে কেন? মানে মানে ফিরিয়া যাও।”

রতন ধীরভাবেই উত্তর দিলেন—বলিলেন “যথেষ্ট পথ দিয়াছি, ইচ্ছা হয় যাইতে পার।”

তাহার যাইবার উদ্দেশ্য ছিল না; রতনকে ফিরানই উদ্দেশ্য। সে অগ্রসর হইয়া রতনকে ধাক্কা দিল। রতন তাহার কথার ভাবে পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন; বুঝিয়া ধাক্কা খাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। লোকটা ধাক্কা মারিয়া নিজেই পা সামলাইতে পারিল না, পড়িয়া গেল। পথের পার্শ্বে ত্রিশিরার কাঁটায়, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। রতন তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। হাতধরা ও তোলাতেই সে রতনের শক্তি বুঝিল। রতন বলিলেন “দেখাইয়া দাও, কোন দরজা দিয়া গেলে শৈলজানন্দের সঙ্গে দেখা হয়।”

লোকটা শৈলজানন্দেরই ভৃত্য, জাতিতে কাহার,—বলিষ্ঠ। যে গুপ্তদ্বার দিয়া রতন প্রবেশ করিতে যাইতে ছিলেন, সেই দ্বার-রক্ষা করাই তাহার কার্য্য ছিল। রতনের আদেশ শুনিয়া লোকটা ফাঁফরে পড়িল। কাতরস্বরে বলিল “প্রভু! সে পথ দিয়া আপনাকে লইয়া গেলে যে আমার চাকরী যাইবে।”

"যাহাতে না যায়, তাহার ব্যবস্থা করিব। আমি তার জামাতার নিকট হইতে পত্র আনিয়াছি। তাহাকে দিয়া চলিয়া যাইব।"

"তাহা হইলে, পত্রপাঠ আমার চাক্‌রী যাইবে। শুধু চাক্‌রী —হয় ত প্রাণ যাইবে। জামাতার সঙ্গে তার সদ্ভাব নাই।"

"জামাতার সঙ্গে সদ্ভাব নাই!"

"দুনিয়ার কারও সঙ্গে সদ্ভাব নাই।"

"এরূপ লোককে দেখিতে রতন কৃতনিশ্চয় হইলেন। বলিলেন, বাবু! তোমার চাক্‌রী থাক্ আর যাক্, আমি তাকে দেখিব।"

লোকটা কপালে হাত দিল; আর বলিল,—"এতকাল পরে দেখিতেছি, আমার রুটী মারা গেল।" রতন বলিলেন, "সহজে মারা যাইতে দিব না। তবে একান্তই যদি যায়, তোমার দুরদৃষ্ট।"

বাধ্য হইয়া সে ব্যক্তি রতনকে দ্বারটী দেখাইতে অগ্রসর হইল। রতন পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতে উভয়ের সম্মুখে একটী পরিখা পড়িল। পরিখা পার হইতে পারিলেই দ্বার। দ্বারটী দেখাইয়া লোকটা স্থানত্যাগের উদ্যোগ করিল। রতন বলিলেন—"দ্বার ত দেখাইলে; এখন পরিখা পারের উপায় বলিয়া দাও।" সে ব্যক্তি জল দেখাইল, আর বলিল—"সাঁতারিয়া পার হউন।" রতন তাহার বস্ত্র দেখিলেন। দেখিয়া বুঝিলেন, এ ব্যক্তি অন্য কোন উপায়ে পার হইয়া থাকিবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেমন করিয়া পার হইলে?" সে চুপ করিয়া রহিল। রতন আর কালক্ষেপ

না করিয়া, তার ঘাড়টা ধরিয়া ফেলিলেন; এবং বলিলেন. "যদি উপায় বলিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব কর, ত তোমাকে পাঁকে পুতিয়া রাখিব।"

ঘাড় ধরাতেই তার অর্দ্ধেক প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তখন সে করজোড়ে বলিল, "ভৃত্যকে ছাড়িয়া দিন; পারের ব্যবস্থা করিতেছি।" রতন পরিত্যাগ করিলে, সে জলের ভিতর হইতে একখানি ছোট ডোঙা বাহির করিয়া ভাসাইল। রতন তাহাতে চড়িয়া পার হইলেন; এবং এক ধাক্কা দিয়া ডোঙাখানাকে পরপারে ভাসাইয়া দিলেন। ভৃত্য সেটীকে আবার জলের ভিতরে ডুবাইয়া রাখিল; আর বলিল, "হুজুর! মনিবের কাছে আমার নাম করিবেন না।" রতন আশ্বাস দিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল, রতন ও উপরে উঠিলেন।

কিন্তু হইল কি! এখানেও যে দরজা ভিতর হইতে বন্ধ! ব্রাহ্মণ এবারে যথার্থই বিপন্ন। আশ্রয় গ্রহণেরও উপায় নাই, ফিরিবারও উপায় নাই। চারিদিকে বন, লতা-গুল্ম মধ্যে সর্পভয়, সমস্ত দিবসের উপবাসে ক্ষুধার্ত্ত, পথপর্য্যটনে ক্লান্ত—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ব্রাহ্মণ নিরাশায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। যে পথে আসিয়াছেন, সে পথ দিয়া ফেরা সহজ কথা নয়—বিশেষতঃ হতাশের হৃদয় লইয়া। দ্বারে করাঘাত করিলেই কেহ খুলিয়া দিবে, এরূপ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না।

ব্রাহ্মণ সেই অন্ধকারময়, আবর্জ্জনাময়, ভীষণ স্থানে দাঁড়াইয়া নিজের দুরদৃষ্টচিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন। মনে মনে বলিলেন, —"কি কুক্ষণেই বাড়ীর বাহিরে পা দিয়াছিলাম। বিনাপরাধে একটা কাপুরুষ ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইলাম। তাহাতেও ত

ভোগের শেষ হইল না! অবশেষে কোন্ অপরিচিত, অনাতিথেয়, দুর্ব্বোধ্য, নরাধমের বাড়ীর দ্বারে নরকতুল্য স্থানে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে আসিলাম!

একমাত্র আশা, ভৃত্যটা যদি ফিরিয়া আসে। তাহারই আগমন প্রত্যাশায়, ব্রাহ্মণ কবাটে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সে স্থানে বসিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

চারিদিক নিস্তব্ধ। বাটীর ভিতরের একটা স্বরের অপেক্ষায়, ব্রাহ্মণ ভিখারীর ন্যায় কাণ পাতিয়া রহিলেন; প্রহরেক অতীত হইয়া গেল, তথাপি সেখানে জীবের অস্তিত্ব অনুভূত হইল না। লোকটাও ফিরিয়া আসিল না।

ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, এইভাবে দাঁড়াইয়া রাত্রি যাপন করা অপেক্ষা, পরিখা পার হইয়া কোন বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করাও শ্রেয়স্কর। বুঝিলেন, যুবতীর কথায় এ অরণ্যপথে প্রবৃষ্ট হইয়া ভাল কাজ করেন নাই। তাঁহার বোধ হইল, শৈলজানন্দের চরিত্রজ্ঞা রমণী দুষ্টামি করিয়া তাঁহাকে বিপদে ফেলিয়াছে। রমণীর উপর তাঁহার ক্রোধ হইল। ভাবিলেন, কেন আপনাকে বিপন্ন করিতে তাহাকে দুষ্ট বালকের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিলাম? সর্ব্বনাশীকে দেখিতে পাইলে, আবার তাহাকে তদবস্থায় সরোবরতীরে বালকের হাতে সমর্পণ করিয়া আসি। এমন কোমল সৌন্দর্য্যের ভিতরে এমন নিষ্ঠুরতা অকৃতজ্ঞতা!

সদাশিবেরও উপর তাঁহার ক্রোধ হইল। জানিয়া শুনিয়া সে মূর্খ এমন নরাধম শ্বশুরের কাছে তাঁহাকে প্রেরণ করিল কেন? আর সেই পাপিষ্ঠ শ্বশুরটার উপর তাঁহার ক্রোধের

সমস্ত ভারটা চাপিয়া পড়িল! ব্রাহ্মণের বড়ই আক্ষেপ, এখনও পর্য্যন্ত তাহাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে পারিতেছেন না। দুই এক-বার শৈলজানন্দকে শিক্ষা দিবার ব্যগ্রতা আসিল। ব্রাহ্মণ এক-বার মনে করিলেন, "এই ক্ষুদ্র দ্বারটা এক পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করি। এবং শৈলজানন্দের গলদেশ ধরিয়া মুষ্ট্যাঘাতে তার পৃষ্ঠদেশের কতকটা স্থান. অপরাংশ হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক করিয়া দিই।" আবার ভাবিলেন, শৈলজানন্দকে ধরিতে, যদি কোন গবানন্দকে ধরিয়া ফেলি! এই মুষ্ট্যাঘাত কার্য্যটা যদি তাহারই পৃষ্ঠে নিষ্পন্ন হইয়া যায়!"

পরিখা পার হওয়াই ব্রাহ্মণ যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন। গৃহপ্রবেশের আশায় এতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সান্ধ্যকৃত্য সমাধা করিতে পারেন নাই। তিনি সেই অন্ধকারে হাতে ভর দিয়া, তীর হইতে অবরোহণ করিলেন। হস্তপদ প্রক্ষালিত করিয়া ভগবানের ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন।

ধ্যান করিতে গিয়া, ভগবানের উপর ব্রাহ্মণের অভিমান আসিল। তাঁহার মুদ্রিত অক্ষিপক্ষ্মমধ্যে অশ্রুর রাশি সঞ্চিত হইল। ধ্যানান্তে যেই ব্রাহ্মণ চক্ষু মেলিলেন, অমনি দুটি গণ্ড দিয়া জল বহিয়া গেল।

চক্ষু মুছিয়া জলে পদক্ষেপ করিতে রতন দেখিলেন, পর-পারে কে আলোক লইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন. এইবারে প্রাণ পাইলাম। আশার পুনঃসঞ্চারে হৃদয়নিবদ্ধ বায়ুরাশি নাসিকারন্ধ্র হইতে প্রবল বেগে বাহির হইয়া গেল। করযোড়ে তিনি ইষ্টদেবের কাছে ভিক্ষা চাহিলেন, "প্রভো! এ দুর্দ্দশা হইতে আমাকে রক্ষা কর।"

আলোক ক্রমশঃই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই সঞ্চারিণীদীপশিখাপুলকিত পরিখাতীরে দাঁড়াইয়া, রতন দীপ্যমান শৈলজানন্দের প্রাসাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, উচ্চ প্রাচীরের উপরে মাথা তুলিয়া, সেই অতিথিসঙ্গে অনভ্যস্ত নির্ম্মম প্রাসাদচূড়া, নীরব অবজ্ঞার হাসির সহিত, তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। শৈলজানন্দের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া রতন বিস্মিত হইলেন! এরূপ ধনীর জামাতা, সামান্য অর্থের জন্য, নরাধম আনন্দদেবের কিনা দাসত্ব করিতেছে! শৈলজা-নন্দকে দেখিতে তাঁহার জেদ হইল। মনে করিলেন, অপ-মানিত, লাঞ্ছিত হইয়াও যদি পুরী প্রবেশ করিতে হয়, অনা-হারে অনিদ্রায় সমস্ত রাত্রি যাপন করিতে হয়, তথাপি লোক-টাকে না দেখিয়া আমি কাশীপুর ত্যাগ করিব না।

অন্ধকার স্তূপাকারে পশ্চাতে রাখিতে রাখিতে, আলোকটা পরিখার পারে রতনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। রতন দেখিলেন, আলোকধারিণী সেই দৃষ্টপূর্ব্বা রমণী।

দেখিয়াই রতন ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন,—"বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মরিয়াছে কিনা দেখিতে আসিয়াছ?"

রমণী। আমি না বুঝিতে পারিয়া অপরাধ করিয়াছি, আপনি চলিয়া আসুন।

রতন। কেমন করিয়া যাই। ডোঙা ওপারে জলের ভিতরে লুকান আছে।

রমণী জলে নামিল; ডোঙাটাকে উঠাইবার চেষ্টা করিল, —পারিল না। তখন ব্রাহ্মণকে আরও কিয়ৎক্ষণের জন্য অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিল। বলিল, "জলে নামিবেন

না ; কণ্টকাদিতে ঝিল পরিপূর্ণ, চরণ বিক্ষত হইবে। আমি শীঘ্র ভৃত্যকে লইয়া ফিরিতেছি”—বলিয়াই রমণী স্থান ত্যাগ করিল, রতনের নিকট উত্তরের অপেক্ষা রাখিল না।

রূপেই হউক, কি আলোকেই হউক, কিয়ৎক্ষণের জন্য সেই প্রাণহীন প্রদেশের জীবন সঞ্চার করিয়া, আবার সুন্দরী গাঢ় অন্ধকার ঢালিয়া গেল। রতন আবার যে তিমিরে সেই তিমিরে। যুবতীকে দেখিয়াই রতন সাহায্যের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। এখন আবার তাহার কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন, তাহার উপকারের চেষ্টা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাহার উপর যে এতটুকুও অভিমান আসিয়াছিল, তাহা সেই তিমিরে বিসর্জ্জন দিলেন। বলিলেন—“আয় মা—শীঘ্র ফিরিয়া আয়, আমাকে কষ্ট বন্ধন হইতে মুক্ত কর্।”

খুট্ করিয়া কবাটে শব্দ হইল। রতন বুঝিল, এইবার বোধহয় ভিতর হইতে কে দ্বার খুলিতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে নিঃশব্দ ক্ষিপ্রগতিতে তিনি দ্বারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দ্বার উন্মুক্ত হইল। একজন খর্ব্বকায় কৃষ্ণবর্ণপুরুষ লাঠী হস্তে বাহিরে আসিল ; এবং রতন যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার পার্শ্বদিয়া কি যেন অন্বেষণ করিতে করিতে কতকটা দূরে চলিয়া গেল। অবকাশ পাইয়া তিনি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়াই লোকটা বাহিরে আসিয়াছিল। সে অনুচ্চ গম্ভীর স্বরে ডাকিল—“ঝম্মন !” উত্তরের অপেক্ষায় সে ক্ষণেক দাঁড়াইল। আবার বলিল—“কে কথা কহিল? ঝম্মন ?”

রতন শুনিলেন ; গ্রাহ্য না করিয়া শৈলজানন্দের সন্ধানে চলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চলিতে চলিতে রতন শৈলজ্ঞানন্দের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কি বিস্তীর্ণ শিলাবদ্ধ প্রাঙ্গণ! কৃষ্ণপক্ষীয়া রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া, ব্রাহ্মণের দৃষ্টি প্রাঙ্গণপ্রান্তে পহুঁছিতে সমর্থ হইল না। প্রাঙ্গণ বেড়িয়া উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন শস্যসম্পত্তির নিদর্শনস্বরূপ অসংখ্য মরাই। মধ্যে সুচিত্রিত সুনির্ম্মিত দেবমন্দির। পরিখাতীরে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণ তাহারই অগ্রভাগ দেখিতে পাইয়াছিলেন। দেবালয়ের সম্মুখেই নাটমন্দির। ব্রাহ্মণ প্রথমেই দেবদর্শনোদ্দেশে সেই-খানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন মন্দিরদ্বার রুদ্ধ। নাট-মন্দিরেও জনপ্রাণীর সমাগম নাই। উদ্দেশেই ব্রাহ্মণ, মন্দিরা-ভ্যন্তরস্থ অজ্ঞাত দেবতাকে প্রণাম করিলেন। আর বলিলেন, "ঠাকুর," তুমি ত নিজেই এক সময় বলিয়াছ :—

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।

সুতরাং তোমার মূর্ত্তি লইয়া, তোমার নাম লইয়া কথা নয়। তুমি যে মূর্ত্তিতেই এই মন্দির মধ্যে অবস্থান কর,—পিতাই হও কি মাতাই হও—বিষ্ণুই হও, শিবই হও, কি অনন্ত-শক্তিধারিণী জগদ্ধাত্রীই হও, অন্ধকারে অপরিচিত পরগৃহে বিপত্তিভীত বৃদ্ধ আজ তোমার শরণাগত।" বলিয়াই ক্লান্ত, অবসন্নদেহ ব্রাহ্মণ মন্দির সম্মুখে চত্বরে বসিয়া পড়িলেন। স্থির করিলেন, দেবতা উঠাইয়া দেন উঠিব, নতুবা এ রাত্রির মত আর স্থানত্যাগ করিতেছি না।

না; অজ্ঞাত-দেবতা-সম্মুখে, দেবতা-প্রীত্যর্থ বারকতক ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া, ব্রাহ্মণ মৃগচর্ম্ম খুলিয়া বিছাইলেন। উষ্ণীষমধ্যস্থ পত্র পরিধেয় বস্ত্রে বাঁধিবার জন্য বাহির করিলেন। অপঠিতাক্ষর, অজ্ঞাতমর্ম্ম পত্রখানিকে বার দুই নাড়িয়া বলিলেন, "হে লিপি, কোথা হইতে কোথায় আনিয়া, কত প্রকারের অবস্থায় ফেলিয়া, তুমি আমার পক্ষে পরিদৃশ্যমানা বিধিলিপির কার্য্য করিয়াছ। শেষে তোমার কৃপায় আমি দেবতার দ্বারে। বলপূর্ব্বক অনাহারে রাখিয়া তুমি আমার জন্য পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত করিলে। তোমায় আমি পরিত্যাগ করিতে পারি না। তুমি এই দেবতার সম্মুখে আজই যা হউক একটা অদৃষ্টের মীমাংসা করিয়া ফেল"—এই বলিয়া, পত্র বাঁধিয়া, কাপড়ের পুঁটুলীটী মাথায় দিয়া, ব্রাহ্মণ শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। অল্প সময় মধ্যে ব্রাহ্মণের নিদ্রা আসিল। নিদ্রার মুখে স্বপ্নরাজ্যের প্রবেশদ্বারেই এক মধু-নিস্যন্দিণী বাণী তাঁহার সুষুপ্ত কর্ণে ধ্বনিত হইল। "ঠাকুর! আলোক আনিয়াছি, পারের ব্যবস্থা করিয়াছি, উঠিয়া আসুন।" স্বর যেন পরিচিত, কথা যেন শোনা, লোক যেন চেনা; স্থান যেন কতদিন হইতে, কত যুগের সম্বন্ধ বহন করিয়া কত ক্লান্ত অনাহার পীড়িত বিপন্নের আশ্রয়! রতন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

প্রথম সত্যের সঙ্গে স্বপ্নরূপসীর কতকটা বাগ্‌বিতণ্ডা চলিল—কতকটা কলহের ভাব ধারণ করিল। সত্য নির্গুণ পুরুষ, সুতরাং কতকটা রসশূন্য। কোন গুণ নেই, তার কপালে আগুন। করুণাময়ী, রসময়ী স্বপ্নসুন্দরী ব্রাহ্মণের ক্ষুধা ভুলাইয়া, তৃষ্ণা ভুলাইয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য তাঁহাকে মধুময় রাজ্যে

লইয়া যাইবে, নীরস সত্যপুরুষটা তাহা কিছুতেই সহিতে পারিল না।

স্বপ্ন বলিল, "ব্রাহ্মণ! চাহিয়া দেখ, কোথায় আসিয়াছ।"

সত্য বলিল, "আর চাহিতে হইবে না; তুমি সেই মন্দির সম্মুখেই পড়িয়া আছ।"

স্বপ্ন। দেখিতেছ না, কেমন স্থিরছায়াক্রমাকীর্ণ, সর্ব্বর্তু-ফলশোভিত, শস্যশ্যামল দেশ!

সত্য। মিছা কথা—মরুভূমি। তুমি নির্ম্মম নির্দ্দয় হৃদয়-হীন গৃহস্থের আশ্রয়ে ক্ষুৎপিপাসাকাতর, শক্তিহীন।

ব্রাহ্মণ স্বপ্নপ্রলোভনে আকৃষ্ট হইলেন না। তিনি চোখ মেলিয়া চাহিলেন;—দেখিলেন, সম্মুখে সেই মন্দির, নিদ্রিত দেবতাকে হৃদয়-আসনে শায়িত করিয়া, মৃত্তিকা স্তূপের ন্যায় জড় অস্তিত্ব বহন করিতে, আকাশে মাথা লুকাইয়াছে। মন্দির সম্মুখে সেই নাটমন্দির; আর তাহার ভিতরে রাশীকৃত, স্তরের পর স্তরে সজ্জিত, গাঢ় অন্ধকার।

ব্রাহ্মণ আবার চক্ষু মুদিলেন। সেই অবস্থাতেই মনে মনে দেবতাকে বলিলেন—"ঠাকুর! সুস্বপ্ন দাও, আর আ-
...দিত
প্রলোভনে আকৃষ্ট করিও না।" করুণায় জীবের
...লত হইয়া
করুণায়, মরজগৎ সহস্র বিভীষিকার আলয় হই...
সৌন্দর্য্যময়ী কথা
সুখস্থান। করুণার পরিবীক্ষণে প...
লাবণ্যময়ী। মৃত্তিকা বৃক্ষলত...
তিনি চারিদিক চাহিলেন।
শিলাস্তূপ নির্ঝর সৌন্দর্য্যে ...
...াবগুণ্ঠিতা রমণী।
মহাপুরুষ নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ—
কোন নিরালম্ব দেশে নিশি...
...বস্থা করিয়াছি।"

জন্মমুহূর্ত্তেই লয় প্রাপ্ত হইত। করুণা, শুধু করুণা করুণার ধারাবর্ষণে নিত্যস্নাত সংসার, জীবনে মরণে, শুধু অনন্ত অস্তিত্বের পথেই অগ্রসর হইতেছে।

ভগবানের করুণায় ব্রাহ্মণ আবার কিয়ৎক্ষণের জন্য ক্লেশের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন—আবার তাঁহার নিদ্রা আসিল। নিদ্রার সঙ্গে সঙ্গে আবার স্বপ্ন। কি সুখের স্বপ্ন! মধুনিষিক্ত কুঙ্কুম-কেশরা কুহেলিকার ন্যায় চারিদিক হইতে স্বপ্নসৌন্দর্য্য ভারে ভারে যেন তাঁহার প্রাণটী আবৃত করিয়া বসিল।

ব্রাহ্মণ দেখিলেন, তিনি একটী খরস্রোতা নদীতীরে দাঁড়াইয়া। পরপারে শোভাময়ী নগরী, উপরে নীল মেঘ। মেঘ বেড়িয়া, অনাবৃতা,—উদ্দীপিত লাবণ্যে চিরাবস্থিতা বিদ্যুৎ। যেন রজতরেখাপ্রান্ত নীল শাড়ী হেমাঙ্গিনীর অঙ্গ ঢাকিয়াছে। নগরী মধ্যে হেমকিরীট তুল্য স্নিগ্ধোজ্জ্বল কাঞ্চনমন্দির, অজ্ঞাত নাম্নী দেবতাকে হৃদয়ে নিবদ্ধ করিয়া, জগতের কাছে লুকাইয়া আপনার রূপোল্লাসে আপনিই তন্ময়—আপনিই ভোগ্য, আপনিই ভোক্তা—নিস্পন্দ যোগীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে।

শোব্রাহ্মণের বড়ই ইচ্ছা পরপারের কাম্য-নগরে কোনও ক্রমে যুগের সম্বদ্বিপস্থিত হন। কেন না সেখানে শুধু নগর আছে. আশ্রয়! রতন খচে। দেবতার ঘরে রাশি রাশি প্রসাদ।

প্রথম সত্যের সঙ্গে পঞ্চাশৎব্যঞ্জনোপকরণ সঘৃত অমৃতোপম —কতকটা কলহের ভাব ধারণ সোণার নগরে সব আছে, সুতরাং কতকটা রসশূন্য। লোক নাই। তাঁহার বড় ইচ্ছা আগুন। করুণাময়ী, রসময়ী বটা পূরণ করেন। এমন সুদৃশ্য ইয়া, তৃষ্ণা ভুলাইয়া কিয়ৎক্ষণেরসহিতেছিল না। কিন্তু সম্মুখে

নদী; তিনি আবার বিদ্রুতগামিনী তরঙ্গিনী। মাঝে মাঝে দুই একটা হাঙ্গর কুম্ভীর জলের উপর মাথা তুলিয়া তীরস্থ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, ভাল বিপদ্! আমার হাত রহিয়াছে মুখ রহিয়াছে—দেহে অসীম ক্ষমতা, ভ্রমণে অতুলনীয় শক্তি—সবই আছে। সম্মুখেও যথেষ্ট অন্ন—দেবতার প্রসাদ; তথাপি কি না আমি খাইতে পাইলাম না!

"হে ভবসাগর-পারকর্ত্রী! আমাকে ক্ষুদ্র নদীটা পার করিয়া দাও।" কাতরকণ্ঠে ব্রাহ্মণ মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবতার আবাহণ করিলেন। দেবতার চরণোদ্দেশে কত অশ্রুবিন্দুর অঞ্জলি দিলেন।

কোথা হইতে কে যেন বলিল—"ঠাকুর, পারের ব্যবস্থা করিয়াছি; উঠিয়া আসুন।" কাতর প্রাণে ব্রাহ্মণ অদৃশ্যমানা-বয়বা সুধাস্রোতস্বিনীর মূলান্বেষণে চারিদিকে চাহিলেন। দেখিলেন, দেখিতে দেখিতে সোণার মন্দির যেন গলিয়া গেল। চারিদিক হইতে গলিত সুবর্ণস্রোত ধারায় ধারায় নিবদ্ধ হইয়া, পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়া, দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তিমতী দেবী হইল। তাঁর পৃষ্ঠে ঘন মেঘের আবরণ, সম্মুখে নবোদিত অরুণ-কিরণ। অলকাবৃত মুখে শতস্থানে প্রতিফলিত হইয়া শত স্থির দামিনীরেখায় দিগন্তে রূপ ছড়াইয়া সৌন্দর্য্যময়ী কথা কহিল, "ঠাকুর! উঠিয়া আসুন।"

রতনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চারিদিক চাহিলেন। দেখিলেন, পদতলে উপবিষ্টা অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা রমণী।

"কে মা তুমি?"

"উঠিয়া আসুন, পারের ব্যবস্থা করিয়াছি।"

রতন উঠিয়া বসিলেন; দুই হাতে চক্ষু মুছিলেন। স্বপ্নটা তখনও পর্য্যন্ত তাঁর মস্তিষ্কের উপর অধিকার ত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। সেই গলিত মন্দিরটা তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার অন্তশ্চক্ষুর চারিধারে ঘুরিতেছিল। সেই জঙ্গমা শাললতা—পুষ্পপত্রশোভিনী—তখনও পর্য্যন্ত অনাবৃত, স্ফুটন্ত রূপমাধুরী লইয়া, থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল। সুতরাং রমণীর পারের ব্যবস্থাটায় তাঁহাকে কিছু গোলে ফেলিল—তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে স্বপ্নটাকে নিষ্পীড়িত করিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—"মন্দির ভাঙ্গিয়া বাহির হইলি; তার সমস্ত উপাদান নিজস্ব করিয়া, গায়ে মাখিয়া নিজেই নিজের মূর্ত্তি গড়িলি; কোন ভাগ্যবলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখা দিলি; এখন কি মা তার ভবপারের ব্যবস্থা করিতে আসিয়াছিস্?" রমণী এ কথায় কোনও উত্তর দিল না, ব্রাহ্মণ কি বলিল, বুঝিতে পারিল না। সে গলবস্ত্রে ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে প্রণতা হইল; আর বলিল—"আমি আপনাকে বড়ই কষ্ট দিয়াছি। কন্যার অপরাধ ক্ষমা করিয়া, তার গৃহে পদধূলি প্রদান করুন।"

এতক্ষণে ব্রাহ্মণের সমস্ত ঘুমের ঘোরটা কাটিয়া গিয়াছে। তিনি তখন মনে মনে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন; বুঝিলেন, ভাল ক'রে চোখ না মুছিয়া, এ রমণীর কাছে এ প্রকার বেদান্ত ব্যাখ্যাটা ভাল হয় নাই। তিনি বেদান্তকে স্বপ্নের সঙ্গে বিদায় দিয়া, সহজ কথায় উত্তর দিলেন,—"তোমার ঘর এখান হইতে কতদূর?"

রমণী। আপনি কি পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত?

রতন। পথশ্রমে ক্লান্ত, ক্ষুধায় জর্জ্জরিত। মনের কথা

যদি জানিতে চাও, তা হ'লে বলি, দেবতার পদপ্রান্তে স্থান লইয়াছি, আজ রাত্রের মতন উঠিতে ইচ্ছা নাই।

রমণী। তবে কি হবে প্রভু! আমিই যে আপনার এই অবস্থার কারণ! আপনি এখানে অনাহারে রাত্রি যাপন করিলে, আমার যে সেই ক্ষুদ্র বালকটীর অকল্যাণ হইবে গৃহস্থের অকল্যাণ হইবে!

রতন। তোমার বালকটীর কথা বলিলে আমাকে উঠি হয়; কিন্তু গৃহস্থের অকল্যাণে তোমার কি? যে পামর অনাহারে প্রপীড়িত অতিথির প্রতি বিমুখ—সাধ্বী! তার কল্যাণ তুমি কামনা কর কেন?

রমণী। গৃহস্থ আপনার আগমন সংবাদ পাইলে, হয়ত প্রত্যাখ্যান করিতেন না।

রতন। গৃহস্থের ভৃত্য ত সংবাদ পাইয়াছিল। সে ব্যক্তি আতিথেয় হইলে, নিশ্চয় ভৃত্য তাঁহাকে সংবাদ দিত।

রমণী। সেটা ভৃত্যের অপরাধ। আমার বোধ হয়, গৃহস্থ এ কথা শুনিলে, সে ব্যক্তি তিরস্কৃত হইবে।

রতন। সে যা হউক, তোমার অতিথিসৎকারে গৃহস্থের কি? তুমি সেবা করিবে, তাহাতে গৃহস্থের কল্যাণ হইবে কেন?

রমণী। আমি তাঁর কন্যা।

রতন। তাঁর কন্যা! তুমিই সদাশিবের স্ত্রী।

রমণী আরও কিঞ্চিৎ মাথায় ঘোমটা টানিয়া মুখ অবনত করিয়া বসিল। ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন—"তুমিই মা লক্ষ্মী! সদাশিবের স্ত্রী? আর সেই সুন্দর বালক? সেটী কি মা তোমার পুত্র?

রমণী মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল,—"সেটী আমার দেবর। আমার স্বামীর বিমাতার গর্ভজাত সন্তান।"

শুনিয়া ব্রাহ্মণের মুখে হাসি আসিল। সেই সরোবর তীরের ছবিটী আবার তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তবে ত দেখিতেছি, তোমাকে রহস্য করিবার তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"

রমণী। আমি তাহাকে সূতিকা ঘর হইতে মানুষ করিয়াছি।

রতন। কেন? তার মা?

রমণী। তিনি পুত্র প্রসব করিয়াই দেহত্যাগ করিয়াছেন।

রতন। তাহা হইলে তুমিই বালকের মা?

রমণী। সে আমাকে ভিন্ন জগতের আর কাহাকেও জানে না। আমাকে মাতৃ সম্বোধন করে। আমার শ্বশুর জীবিত নাই, স্বামী থাকেন বিদেশে। শ্বশুরের শূন্যগৃহে সেই বালকই আমার একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র সঙ্গী। যেখানে যাই, তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়।

ব্রাহ্মণ এইবার বুঝিলেন, বালক এত দুষ্ট হইল কেন। জননী স্থানীয়া ভ্রাতৃজায়ার অত্যধিক আদরে সে অসহনীয় অত্যাচারী হইয়াছে।

রমণী। প্রভুর কি আমার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় আছে?

রতন। পরিচয় আর কি বলিব মা! সদাশিব আমার শিষ্য।

সদাশিব-পত্নী ভূলুণ্ঠিতা হইয়া ব্রাহ্মণের চরণে প্রণতা হইল। ব্রাহ্মণও তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর বলি-

লেন, "আমি তাহারই নিকট [illegible] তোমার পিতার নামে পত্র লইয়া আসিয়াছি।"

রমণী। পত্রের শিরোনামে [illegible]র হস্তাক্ষর অনুমান করিয়াছিলাম; কিন্তু অসম্ভব [illegible]মি জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হই নাই।

রতন। যাক্ তাহ'লে আমাকে যাইতেই

রমণী। এখন আর আমি কি বলিব? সে বা[illegible] আপনারই সম্পত্তি।

রতন আর কথা কহিলেন না। বিছানো মৃগচর্ম্ম আবা[illegible] বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। রমণীও উঠিয়া দাঁড়াইল।

বন্ধনকার্য্য সমাধা করিয়া রতনও দণ্ডয়মান হইলেন। রমণী বলিল, "ক্ষণেক অপেক্ষা করুন; বাহিরে আলোক রাখিয়াছি লইয়া আসি।"

রতন কিন্তু এতই ক্লান্ত যে, তাঁহার উঠিতে বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। রমণীর আগ্রহে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে চলিতে হইতেছিল। পিতার গৃহে আশ্রয় মিলিল না; কন্যাও অতিথিসৎকার কার্য্যে পিতার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিল না। পিতাপুত্রীর সম্বন্ধ, রতনের কেমন দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল। তিনি রমণীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন—"এমন ঐশ্বর্য্যবান্ পিতা তোমার, তুমি বালকটীকে লইয়া একা অবস্থান কর; ইহার কারণ ত আমি বুঝিতে পারিলাম না!"

"আমার অদৃষ্ট।"—এই বলিয়া সদাশিব-পত্নী আলোক আনিতে চলিল। অতৃপ্ত কৌতুহলে ব্রাহ্মণ সেই অন্ধকারাবৃত চত্বরে রমণীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় পুনরুপবিষ্ট হইলেন

দাঁড়াইয়া থাকিতে তাঁহার ক্লেশ বোধ হইতেছি[illegible] স্থান ত্যাগ করিতেও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা, কোনও প্রকারে রাত্রিটা যাপন করিতে পারিলে, প্রভাতে শৈলজা-নন্দকে একবার দেখিয়া যান। তাহার সঙ্গে দেখা না হইলেও ত রতনের কার্য্য সিদ্ধি হইল না। সদাশিবপ্রেরিত পত্র তিনি শৈলজানন্দ ভিন্ন আর কাহাকেও দিবেন না। শুধু ক্ষুধার পীড়নে ও সদাশিব-পত্নীর আগ্রহেই তিনি সে স্থান ত্যাগ করিতে ছিলেন।

একটু পরেই সদাশিব-পত্নী ফিরিয়া আসিল; এবং বলিল ঠাকুর আলোক দেখিতে পাইতেছি না যে!

রতন। কোথায় রাখিয়াছিলে?

রমণী। দ্বারের কাছে রাখিয়াছিলাম।

রতন। নিবিয়া গেল নাকি?

রমণী। নিবিবার ত উপায় নাই! আমি একটী সুগঠিত লণ্ঠনের ভিতরে পূরিয়া দীপ আনিয়াছি। নিশ্চয় কেহ লইয়াছে।

রতন। তাহা হইলে করিবে কি? আমি ত সে বনপথে এ বিষম অন্ধকারে চলিতে পারিব না।

রমণী। আমি যে বালককে একা ঘরে রাখিয়া আসিয়াছি।

রতন। তুমিই বা এ অন্ধকারে কেমন করিয়া ফিরিবে?

রমণী। তাহ'লে কি হবে প্রভু! আমি যে বড়ই বিপদে পড়িলাম!

রতন। আমি একজন খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণকায় পুরুষকে দ্বার খুলিয়া বাহির হইতে দেখিয়াছিলাম।

রমণী। কোন্ দিকে দেখিয়াছেন প্রভু?

রতন। দ্বার খুলিয়া সে বামদিকের পথ অবলম্বন করিয়াছিল।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার ন্যায় সদাশিব-পত্নী পুনরায় সে স্থান ত্যাগ করিল। রতন বুঝিলেন, বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে আজি আর আহার লেখেন নাই।

পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিল। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, এতক্ষণে বিধাতা তাঁহার আহারের একটা ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে অদৃষ্টবশে আহার্য্য গলাধঃকৃত না হইয়া গলপৃষ্ঠে সংলগ্ন! ক্ষুন্নিবৃত্তি উদরের নয়—অন্তরের! তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই একটা ঘোরতর দুরবস্থার আশঙ্কা করিতেছিলেন। সুতরাং এরূপ অবস্থায় পড়িয়াও তিনি বিস্মিত কিম্বা বিচলিত হইলেন না। ঘাড় ফিরাইয়া লোকটাকে দেখিবার জন্যও তিনি ব্যগ্রতা দেখাইলেন না। কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন— "কে বাপু তুমি?" লোকটা কর্কশস্বরে বলিল—"তুই কে?"

"আমি একজন অতিথি।"

"তুই কেমন করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলি?"

"তা যেমন করিয়াই প্রবেশ করি; তোমাদের কি অতিথি-সেবার এইরূপই ব্যবস্থা? ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দেবালয় সম্মুখে আহারের প্রত্যাশায় বসিয়াছিলাম। বড় বাড়ী বড় মন্দির দেখিয়া অনেক প্রকার চর্ব্ব্যচোষ্যের আশা করিয়াছিলাম। তা বাপু তোমরা কি দেবতাকে নিত্য এইরূপ গলাধাক্কার ভোগ দাও?"

লোকটা অপ্রতিভ হইয়াই যেন গলা হইতে হাত ছাড়িয়া দিল। রতন মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন, এ ব্যক্তি সেই দীর্ঘ যষ্টিধারী খর্ব্বকায় প্রহরী। সে অন্ধকারে বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিল; ব্রাহ্মণের মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল।

রতন বলিলেন, "পরিতোষ করিয়া ত খাওয়াইলে; এখন কি আবার মুখশুদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছ?"

"মুখশুদ্ধির জন্য আক্ষেপ করিতে হইবে না, এখনি মিলিবে। তুমি এত রাত্রে গৃহস্থের বাড়ী প্রবেশ করিয়াছ। তুমি যে চোর নও, আমি কেমন করিয়া বুঝিব?"

"কেন বৎস বাঁটুল! যে সময় তুমি লণ্ঠনটা চুরি করিয়াছ; সেই সময়েই তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, চোর তুমি—আমি নই।"

একজন ভিক্ষুবেশী অপরিচিতের এরূপ তীব্ররহস্যে লোকটা বড়ই ক্রুদ্ধ হইল। রুক্ষস্বরে বলিল—"সাবধান হইয়া কথা ক'। জানিস্ আমি কে?"

"দুর্ভাগ্য আমার, জানি না। তুমি নিজেই পরিচয়টা দিয়া আমাকে ভাগ্যবান কর।"

আত্মমর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা করিতে, ও ব্রাহ্মণকে ভয় দেখাইতে, প্রহরিবর গুরুগম্ভীরস্বরে বলিল,—"আমি মুন্না।"—নাম বলিয়াই মুন্না, রতনের মুখে বিস্ময়চিহ্ন দেখিবার জন্য তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

রতন মুন্নার নাম শুনিয়াছিলেন। মুন্না কোল জাতীয় প্রসিদ্ধ দস্যু। ছোটনাগপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা তাহার নাম জানিত। সকলেই তাহাকে ভয় করিত। প্রসূতি দুরন্তবালককে ঘুম পাড়াইতে মুন্নার নাম গ্রহণ করিত। এখন তাহার বয়স হইয়াছে। ছোটনাগপুর ইংরাজ-হস্তে আসিবার পর, দস্যু-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চাকুরি বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। শৈলজানন্দের গৃহে সে বহুকাল হইতে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত

যোগ্যের সম্মুখেই যোগ্যতার অভিমান হয়। সামান্য প্রহরী জ্ঞানে, রতন মুন্নার সহিত এতক্ষণ রহস্যের কথা কহিতেছিলেন ; এখন নাম শুনিয়া গম্ভীর হইলেন ; এবং মুন্না হইতেও গম্ভীরতর স্বরে বলিলেন—"আর, তুই জানিস্ আমি কে ?"

স্বরের পরিচয় পাইয়া, মুন্না বুঝিল, সম্মুখের বৃদ্ধটী সহজ লোক নয়। সে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যেন কোন অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কা করিল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, অবশেষে অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসিল—"কে তুমি ?"

"আমি রতন রায়"—বলিয়াই রতন দণ্ডায়মান হইলেন।

রতনের নাম মুন্নার অবিদিত ছিল না। তাঁহার শক্তির কথা, তাঁহার গুণগ্রাম, সে তাহার দস্যুসহচরদিগের মুখে অনেক বার শুনিয়াছে। প্রভু-জামাতা সদাশিবও অনেকবার তাহার কাছে রতনের নাম করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সহিত দেখার সুযোগ হয় নাই। আজ সে "যুগব্যায়তবাহুরংসলঃ কবাটবক্ষা পরিণদ্ধকন্ধরঃ গুরুপ্রকৃষ্টবপুঃ" বাঙ্গালী ব্রাহ্মণবীরকে জীবনে প্রথম দর্শন করিল। দেখিয়াই চরণে লুটাইল। বলিল "দেবতা ! না বুঝিয়া চরণে অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা কর।"

রতন মুন্নার হাত ধরিয়া তুলিলেন ; এবং বলিলেন, "মুন্না ! তুমি গাত্রোত্থান কর। প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত আছ, তোমার অপরাধ কি ? উঠিয়া তোমার প্রভু-কন্যার সন্ধান কর। তিনি আমার সঙ্গে এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার লণ্ঠন কে অপহরণ করিয়াছে, সেই জন্য আমরা স্থানত্যাগ করিতে পারিতেছি না।"

মুন্না বলিল, "লণ্ঠন আমিই লইয়াছি; আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

রতন মুন্নার সঙ্গে চলিলেন। পূর্ব্বোক্ত দ্বারসমীপে উপস্থিত হইতেই, সদাশিব-পত্নীর সহিত তাঁহার পুনঃসাক্ষাৎ হইল। মুন্না তাঁহাদিগকে দ্বারসমীপে অবস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিয়া লণ্ঠন আনিতে প্রস্থান করিল। লণ্ঠনের দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া সে একটা মরাইয়ের তলায় লুকাইয়া রাখিয়াছিল। অল্পক্ষণ পরেই আলো জ্বালিয়া মুন্না লণ্ঠনটী ফিরাইয়া দিল।

দুইজনে বাহিরে আসিবামাত্র মুন্না দ্বার রুদ্ধ করিল। সদাশিব-পত্নী ও মুন্না কেহ কাহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না। রতন বড়ই বিস্মিত হইলেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ বৃথাপ্রশ্নে সময়ক্ষেপ করিতে অভিলাষী হইলেন না, সদাশিব-পত্নীর সহিত নীরবে পরিখা পার হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিবস অপরাহ্ণে মন্দির প্রাঙ্গণে বিচরণ করিতে করিতে বয়োভারাবনত শৈলজানন্দ দেখিতে পাইলেন, একটী দীর্ঘ ছায়া তাঁহার পদপ্রান্তে সমুপস্থিত হইতে, ছুটিয়া আসিতেছে। মাথা তুলিয়া তিনি দেখিলেন, ছায়ানুরূপ উন্নত-দেহ এক অদৃষ্টপূর্ব্ব বৃদ্ধ, মন্দিরপার্শ্বস্থ দ্বারের দিক হইতে তাঁহার দিকে আসিতেছে। তিনি অনিমেষ দৃষ্টিতে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। আগন্তুক ধীর পাদক্ষেপে তাঁহার সমীপস্থ হইল। আসিয়া কোনও কথা না কহিয়া, তাঁহার হস্তে একখানি পত্র

দিল। পত্র দিয়া নীরবে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। শৈলজানন্দ আগন্তুকের আচরণে বিস্মিত হইলেন। নিজেও কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আগন্তুকই কথা কহিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। বলিল, "তোমার জামাতার নিকট হইতে এই পত্র আনিয়াছি। কল্য রাত্রে তোমার কন্যার সহিত এখানে আসিয়াছিলাম। তোমার দেখা না পাইয়া, ফিরিয়া তাহার পর্ণকুটীরেই আশ্রয় লইয়াছিলাম। দেখিলাম রাজযোগ্য-প্রাসাদাধিষ্ঠিত শৈলজানন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য্য সেই পর্ণকুটীরেই লুক্কায়িত আছে। তাহার উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত, দেবমন্দিরশোভিত সুসজ্জিত গৃহ, অসংখ্য রত্নরাজি গর্ভে ধারণ করিয়াও দরিদ্র—ক্ষীণ-জীবন-কীটাবরণ —হৃদয়হীন।

শৈলজানন্দ তথাপি নিস্তব্ধ। রতন তাহাকে অনেক কথা শুনাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু শৈলজানন্দকে দেখিয়া, তিনি আর বেশি কিছু বলিতে পারিলেন না। শৈলজানন্দের মূর্ত্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, বৃদ্ধ দারুণভূকম্পশিথিলিত-অঙ্গসন্ধি কোন্ পূর্ব্বকালের অভ্রংলিহ গৌরীশঙ্করের ভগ্নাবশেষ। সংসারের ঘটনাবৈচিত্র্যের ঘাতপ্রতিঘাতে, শোক দুঃখমর্ম্মবেদনার রেখাসম্পাতে. এক সময়ের দেবতুল্য কান্তি আজ নিষ্প্রভ,—ভূপতিত উল্কাপিণ্ডের ন্যায় কেবল পূর্ব্বকালের উচ্চসংস্থান সূচিত করিতেছে।

ব্রাহ্মণ আর কিছু বলিতে পারিলেন না। শৈলজানন্দকে দেখিতে দেখিতে তাঁর মনে দুঃখ উপস্থিত হইল। কন্যার নিকটে

তিনি পিতৃপরিচয় অবগত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। পথে আসিতে আসিতে তিনি কন্যাত্যাগী এই কঠোর বৃদ্ধের এক অপ্রীতিকর মূর্ত্তি কল্পনায় আঁকিয়া দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন ; কিন্তু আসিয়া তাহা দেখিতে পাইলেন না।

শৈলজানন্দ কোনও কথা না কহিয়া পত্র খুলিতে লাগিলেন। রতন বলিলেন,—"আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে ; এখন আমি আসিতে পারি।"

অতি ধীরভাবে শৈলজানন্দ বলিলেন, "ক্ষণেক অপেক্ষা করুন !"—এই বলিয়া তিনি ভৃত্যকে ডাকিলেন।

পূর্ব্ব রাত্রের ঝম্মন আসিয়া উপস্থিত হইল। সে প্রভুর সম্মুখে ব্রাহ্মণকে দেখিল। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

শৈলজানন্দ তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন—"কাল কি তুলসী এখানে আসিয়াছিল ?" শৈলজানন্দের কন্যার নাম তুলসী।

ভীতিকম্পিত কণ্ঠে ঝম্মন বলিল - "কই প্রভু ! আমি ত তাহাকে দেখি নাই !"—

রতন বাধা দিয়া বলিলেন—"ভৃত্য শুধু আমাকে দেখিয়াছিল, দেখিয়া বাধাও দিয়াছিল ; আমি বাধা মানি নাই। তুলসীকে ও ব্যক্তি দেখে নাই।"

শৈ। আপনি—

রতন। ব্রাহ্মণ।

শৈলজানন্দ হাত তুলিয়া প্রণাম করিলেন, আর ভৃত্যকে আসন আনিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য প্রাণ পাইল। সে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া আসন আনিতে ছুটিল।

রতন বলিলেন, "আমার আর অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন কি ?"

শৈ। "আমার প্রয়োজন আছে।"

রতন। আমি তীর্থে যাইবার জন্য বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছি। পথে বিলম্ব হইয়াছে। এখানে ও একদিন বিলম্ব হইল।

শৈ। আর একদিন বিলম্ব করুন।

এই বলিয়া বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরবে পত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। রতন দেখিলেন, বৃদ্ধের মুখের ভাব দেখিতে দেখিতে পরিবর্ত্তিত হইল; চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ঝম্মন আসন লইয়া আসিল, শৈলজানন্দেরও পত্রপাঠ সমাপ্ত হইল। অতি কষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া তিনি রতনকে বলিলেন, "আপনি কি একান্তই যাইতে ইচ্ছা করেন ?"

রতন। তুমি যে কি প্রয়োজনের কথা বলিলে ?

শৈ। তাহা একদিনে নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছিনা।

রতন। ভাল, দুইদিন না হয় রহিয়া গেলাম।

শৈলজানন্দ ঝম্মনকে বলিলেন, "আসন আমার ঘরে লইয়া যা—আর মুন্না কোথায় আছে, ডাকিয়া দে।"

মুন্নাকে আর ডাকিতে হইল না। সে আপনা হইতেই তাঁহাদের দিকে আসিতেছিল। ঝম্মন শুধু আসন রাখিতে চলিয়া গেল।

মুন্না নিকটে আসিলে, শৈলজানন্দ বলিলেন—"মুন্না! সম্মুখে এই যে বৃদ্ধটীকে দেখিতেছ, ইনিই বাঙ্গালী-বীর রতন রায়। ইনি মুলুক ছাড়িয়া চলিয়াছেন। বোধ হয় আর

ফিরিবেন না। বাঙ্গালা, তীর্থস্থ দেবতার পায় এ পুষ্প অঞ্জলি দিতে চলিয়াছে।—বুঝি আর ফিরিয়া পাইবে না।”

একটী গভীর দীর্ঘশ্বাসতরঙ্গে শৈলজানন্দের কথা কিয়ৎক্ষণের জন্য যেন আন্দোলিত হইয়া উঠিল। দীর্ঘশ্বাস মুন্নার। শৈলজানন্দের কণ্ঠ কম্পিত। রতন বার্দ্ধক্যনমিতাঙ্গ বৃদ্ধের মুখের প্রতি চাহিয়া নির্ব্বাক, নিশ্চল।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া শৈলজানন্দ বলিতে লাগিলেন—“শোন মুন্না! এ দেশে এরূপ সামগ্রী আর মিলিবে না। বাঙ্গালীর এ মুর্ত্তি জন্মের মত চলিয়া যায়। দুই দিন প্রাণ ভরিয়া সেবা করিয়া লও।”

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ একবার ব্রাহ্মণের দিকে মুখ ফিরাইলেন। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, বৃদ্ধের কঠোর দৃষ্টি, হৃদয়ের আবেগভরে কোমলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে মুখে তিনি হাসির অস্তিত্ব কল্পনায়ও আনিতে পারিতেছিলেন না, তাহা আজ শিলাবিদ্রাবী, নিরাশার তুষারকণসঞ্চয়ে কি মধুর সৌন্দর্য্যে সুপ্রসন্ন!

রতন সে মুখ দেখিয়া বৃদ্ধের মনোভাব সমস্তই যেন বুঝিতে পারিলেন। তিনিও নীরব থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন—“যথার্থ ব'লেছ শৈলজানন্দ! আর আসিবে না।”

শৈ। “আর আসিবে না। রতন রায় এ মুলুকে আর আসিবে না।

রতন। শৈলজানন্দও আসিবে না, মুন্নাও আসিবে না।

শৈলজানন্দ আর কথা কহিলেন না। ব্রাহ্মণকে লইয়া যাইতে মুন্নাকে ইঙ্গিত করিলেন। মুন্না ব্রাহ্মণকে সঙ্গে চলিতে

অনুরোধ করিল। রতন বলিলেন, "একবার দেবতা দর্শন করিয়া আসি।"

শৈ। কোথায় দেবতা? আপনি তীর্থদর্শনে চলিয়াছেন, কিন্তু তীর্থে দেবতা নিদ্রিত! এই মন্দিরে পূর্ব্বে অষ্টভূজার অধিষ্ঠান ছিল, শত্রুহৃদয়-শোণিতে তাঁহার পিপাসা মিটিত, এখন দেবতা নিদ্রিত।"

রতন। আছে ত?

শৈ। ছিল ত জানি।

রতন দেবীদর্শনে চলিলেন। শৈলজানন্দ মুন্নাকে বলিলেন —"চাবী আনিয়া মন্দির দ্বার খুলিয়া দে। ব্রাহ্মণকে অষ্টভূজার কঙ্কাল দেখাইয়া, আমার গৃহে লইয়া আয়।"

চলিতে চলিতে রতন শৈলজানন্দের কথা কয়টী শুনিলেন। প্রহেলিকাময় শৈলজানন্দকে তিনি বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রতন ভাবিলেন, শৈলজানন্দ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিবার এইবারে সুবিধা হইল। এখনও পর্য্যন্ত তিনি শৈলজানন্দ চরিত্র কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। শৈলজানন্দকে না দেখিয়া তাহার গৃহে প্রবিষ্ট হইতে বিফল মনোরথ হইয়া, পথের কষ্টে, ক্ষুধাতৃষ্ণার পীড়নে, অন্ধকারময় স্থানে বসিয়া বসিয়া, তাহার উপরে এতক্ষণ যে ক্রোধ পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, বৃদ্ধকে দেখিয়াই, পবন-তাড়িত ধূম্ররাশির ন্যায় তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে

অপসারিত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, বহুকাল হইতে, নানা বিষয়ে অর্জ্জিত, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় হৃদয়ের স্তরে স্তরে স্তূপীকৃত বেদনারাশি বহন করিয়া, কোন পূর্ব্বকালের মায়াময়, আনন্দময়, কার্য্যকুশল জীব, জড়ীকৃত দেহ-কঙ্কালে শুধু অস্তিত্ব-স্মৃতি বহন করিয়া দিন যাপন করিতেছে। কর্ত্তব্যপথে অন্তরায় হইয়া জগৎ আজ তাঁহার নিকট বিতাড়িত; কন্যা, জামাতা দূরীভূত; স্বজন-সহবাসসুখ আকাঙ্ক্ষার রাজ্য হইতে অপসারিত হইয়াছে।

মুন্না আসিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুন্না! তোর মনিব কি চিরকালই এমন ছিল?"

মুন্না। না।

রতন। কতদিন হইতে এরূপ হইয়াছে?

মুন্না। দশ বার বৎসর।

রতন। আগে কিরূপ ছিল?

মুন্না। আপনি কি জানিতে চান?

রতন। তুমি যা জান, তার সমস্তই আমি জানিতে চাই।

মুন্না। আমি সব ভাল রকম জানি না।

রতন। তুমি কত দিন এখানে আছ?

মুন্না। সে ত বহুদিন। যে দিন হইতে দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়াছি।

রতন। দস্যুবৃত্তি ছাড়িলে কেন?

মুন্না। যে জন্য ডাকাতি করিতাম, আর তার প্রয়োজন হইল না।

রতন। কি জন্য ডাকাতি করিতে, শুনিতে পাই না?

মুন্না। মনিবের মনস্তুষ্টির জন্য

রতন। এইত বলিলে, দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া চাকুরী লং.

মুন্না। চিরকালই মনিবের চাকুরি করিতেছি। তবে এখানে থাকিতাম না।

রতন। থাকিতে কোথায়?

মুন্না। পথে পথে ঘুরিতাম, বনে বনে দিন কাটাইতাম, আর যদি কোনও দিন ডাকাতী করিবার সুবিধা না পাইতাম, কোন গুহায় রাত্রি যাপন করিতাম।

রতন। তোমার ঘর বাড়ী ছিল না?

মুন্না। কস্মিন কালেও ছিল না, এখনও নাই. শুনিয়াছি বাল্যকালে মনিব আমাকে ব্যাঘ্রমুখ হইতে উদ্ধার করেন। সেইকাল অবধি আজ পর্য্যন্ত মনিবের ঘরেই মানুষ হইয়াছি; মনিবের কাছেই কুস্তি, লাঠীখেলা, অস্ত্রধরা শিখিয়াছি।

রতন। দস্যুবৃত্তি শিখিলে কোথায়?

মুন্না। সবই ত এক রকম বলিয়াছি ঠাকুর! এই আমার হাত, এই আমার দেহ, এই আমার প্রাণ, হাতের এই লাঠী —সমস্তই মনিবের। আমি শুধু পুতুলের মত, মনিবের হাতের টীপে ঘুরিয়া বেড়াই।

রতন মুন্নাকে পাইয়া, তার সঙ্গে দুই চারিটা কথা কহিয়া ভাবিয়াছিলেন, শৈলজ্ঞানন্দকে এইবারে হাতে পাইয়াছেন; কিন্তু আসিতে আসিতে শৈলজ্ঞানন্দ আবার যেন অতিদূরে সরিয়া গেল ধরা দিল না। ভাবিলেন, ছোটনাগপুরের বড় বড় জমীদারের ঘর লুটিয়া. দস্যু মুন্না যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহার মূলে কি ঐ সৌম্য প্রশান্ত ঋষিমূর্ত্তি বৃদ্ধ? তিনি কি আজ দস্যুর গৃহে অতিথি!

অপসরা মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দিল। বলিল—"ঠাকুর! দেবতা দর্শন করুন।"

রতন বলিলেন, "দেবতাকে পরে দেখিব। তুমি আর একটী কথা বল। আমার বড়ই কৌতুহল হইতেছে।"

মুন্না ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"জিজ্ঞাসা করুন। আমি যা জানি সমস্তই আপনাকে বলিব। আপনাকে কিছু গোপন করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই, প্রয়োজনও নাই। আজ দশ বৎসর যে মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় নাই, আমিও যা দেখিতে অনুমতি পাই নাই, মনিবের আদেশে আমি আপনাকে তাই দেখাইতে চলিয়াছি। আপনি কি জানিতে চান, জিজ্ঞাসা করুন।"

রতন জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন; কথায় বাধা দিয়া মুন্না আবার বলিতে লাগিল—"কিন্তু মনিব সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অতি অল্প। আপনি যে বিশেষ তৃপ্তি পাইবেন, তাহা ত বোধ হয় না।"

শেষ কথাটা শুনিয়া রতনের মনে কিছু খট্‌কা লাগিল। শৈলজ্ঞানন্দ সম্বন্ধে আদ্যোপান্ত জানিবার জন্যই তাঁর প্রশ্ন। বুঝিতেই যদি না পারিলেন, তাহা হইলে প্রশ্ন করিয়া ফল কি। তাঁহার সন্দেহ হইল, পাছে শৈলজ্ঞানন্দ বিপন্ন হয়, এই ভয়ে সে প্রভু সম্বন্ধে অনেক কথা ব্যক্ত করিবে না, তিনি সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইবেন না। তাই আগে হইতেই মুন্না মুখবন্ধ করিয়া রাখিতেছে।

মুন্না মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল। আপনার কথা শুনিয়া বহুবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ করিয়াছিলাম।

রতন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—কি? অস্ত্র লইয়া?

মুন্না। শুধু হাতে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ফল কি? আপনি বঙ্গদেশী ব্রাহ্মণ—পেটকোলা, হাত নলি, বাঙ্গালীর দেশ হইতে আসিয়া নাগপুরের বুকে বসিয়া, আজ প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিতেছেন। আপনার সহিত শুধু হাতে সাক্ষাৎ করিতে যাইলে কি আমার চতুর্বর্গ লাভ হইত?—ইচ্ছা ছিল, আপনাকে কিছু অস্ত্রঝনঝনার উপঢৌকন দিই। তাহাতে বরং একটা কোল সর্দ্দারের গৌরব হইত।

রতন। গেলেনা কেন?

মুন্না। প্রভুর নিষেধ ছিল।

রতন। কেন? দেখা নাই পরিচয় নাই, কোথা হতে আমার প্রতি তোমার প্রভুর অসম্ভব দয়া হইল?

মুন্না। তা বলিতে পারি না।

রতন। আমার বোধ হইতেছে, তুমি আমাকে কথাটা গোপন করিলে।

দাঁতে জিব কাটিয়া মুন্না বলিল—"গোপন করিব কেন? এরূপ কথা আপনার যোগ্য হয় নাই।"

রতন অপ্রস্তুত হইলেন। "বলিলেন তুমি কি একটা কারণও অনুমান কর নাই?"

মুন্না। বলিয়াছি ত ঠাকুর! প্রভুর আঙ্গুলের টীপে আমি পুতুলের মত ফিরিয়াছি। অনুমানে তাঁহার কার্য্যের তত্ত্ব বুঝিতে কখনও চেষ্টা করি নাই।

রতন। তুমি দস্যুতা করিয়া এ জীবনে অবশ্য লক্ষ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছ?

মুন্না। সংগ্রহ করি নাই লুঠ করিয়া আনিয়াছি এইমাত্র। রাত্রে ডাকাতি করিতাম, দিনমানে এই স্থানে আসিয়া অষ্টভুজার প্রসাদ খাইতাম। বহুদূরে যাইলে, যদি রাত্রের মধ্যে আসা অসম্ভব বোধ হইত, কিম্বা কোনও কারণে দুই চারি দিন বিলম্ব ঘটিত, মজুরি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতাম। মজুরি না জুটিলে ফলমূল—তাহাও দুষ্প্রাপ্য হইলে জলাশয়ের জল। আসল কথা অনাহারে মরিলেও ভিক্ষা করিতাম না।

রতন। কতকাল ডাকাতি করিয়াছ?

মুন্না। কতকাল, তার কি স্থির আছে, কতস্থান তারও কি ঠিক আছে।

রতন। কালেরও যখন স্থিরতা নাই, স্থানেরও যখন স্থিরতা নাই, তখন আমার বোধ হয় রাশি রাশি অর্থ দস্যুতায় উপার্জ্জন করিয়াছ?

মুন্না। রাশি রাশি—রাখিলে একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইতে পারিত।

রতন। অবশ্য, সমস্ত অর্থ মনিবকেই তোমার দিয়াছ?

মুন্না। আর কাকে দিব ঠাকুর! শুনিলেত, পথে মজুরি করিয়া দিনপাত করিতাম।

রতন। তা হ'লেত তোমার প্রভু ধনরাশির ঈশ্বর!

মুন্না। তা কেমন করিয়া বলিব।

রতন। সেটা অবশ্য ইচ্ছা করিলেই বলিতে পার।

মুন্না। আজ্ঞে প্রভু! তা বলিতে পারি না। অবশ্য ধনের খবর কখন লই নাই, কিন্তু কখনও ব্যবহার দেখি নাই। মনিব আমার হবিষ্যাশী, আর বেশত তাঁর স্বচক্ষেই দেখিয়া-

ছেন। প্রভুর স্ত্রীকে দেখিলে বাড়ীর দাসী বলিয়াই বোধ হইবে, ঘরের সমস্ত কার্য্যই তাঁহাকে নিজ হাতে করিতে হয়। কন্যাকে দেখিয়াছেন! জামাতা সদাশিব, আপনাদের ওখানেই সামান্য সেপাইয়ের কার্য্য করেন।

রতন। তোমার মনিবের কোন পৈত্রিক সম্পত্তি আছে?

মুন্না। আছে বিলক্ষণ। কিন্তু তাঁর সমস্ত জমীজমা আমরাই দখল করিয়া বসিয়া আছি।

রতন। তোমরা কে?

মুন্না। আমি আর আমার দল। অবশ্য আমি এই খানেই থাকি। কিন্তু আমার শিষ্যসম্প্রদায় স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসারী। প্রায় পাঁচ হাজার লোক মনিবের জমীর উপসত্ত্বে প্রাণধারণ করিয়া আছে।

অনুমানে শৈলজানন্দকে বুঝা রতনের পক্ষে বড় সহজ হইল না। একবার তাঁহাকে দস্যুপতি ভাবিয়া ঘৃণায় ব্রাহ্মণের ভ্রূকুঞ্চিত হইতে লাগিল, আবার পরক্ষণেই দেবতাবোধে তাঁহার প্রতি বীরজনোচিত শ্রদ্ধায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া যাইতে লাগিল। একবার মনে করিলেন, সরলচিত্ত কোলগুলাকে ঘৃণিত দস্যুতায় প্রবৃত্ত করিয়া প্রতারণায় তার সমস্ত ফল আপনি উপভোগ করিতেছে। আবার তাঁহার বোধ হইল, কোন মহদুদ্দেশ্য সাধন-কল্পে, দেবতাপ্রীত্যর্থ ফলাহরণের ন্যায়, এই প্রহেলিকাময় বৃদ্ধ এই গুপ্ত অলকায় ধনসঞ্চয় করিতেছে।

সন্ধ্যা হইতে বড় বিলম্ব ছিল না। মুন্না বিস্ময়াবিষ্ট ব্রাহ্মণকে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিল। বলিল, বেলা যায়। এই সময়ে মন্দিরে প্রবেশ না করিলে কিছুই দেখিতে পাইবেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রতন মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; মুন্না প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

আলোক হইতে অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমে রতন কিছুই দেখিতে পাইলেন না। প্রবেশদ্বার ব্যতীত মন্দির মধ্যে আলোক প্রবেশের অন্য পথ ছিল না। উপরে অন্ধকার, চারিধারে অন্ধকার; সম্মুখে দুর্ভেদ্য শৈলের ন্যায় ঘনীভূত অন্ধকার আগন্তুকের পথরোধ করিয়া, কতকালের কি যেন রত্নরাজি বক্ষপঞ্জরে লুকাইয়া, অবিকম্পিত ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে।

রতন ভাবিলেন, এরূপ ঘনতম অন্ধকার সম্মুখে রাখিয়া আর কতদূরই বা অগ্রসর হইব। কোথায় দেবতা? কিরূপেই বা তাঁর দর্শন পাই? আর এ ভাবে অন্ধকার নিষ্পিষ্ট করিয়া মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে, কোন উদ্দেশ্যে শৈলজানন্দ লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছে। রতন একবার মনে করিলেন, আর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই। শৈলজানন্দের গৃহদেবতা শৈলজানন্দেরই গৃহে বন্দিনী, আমি তাকে অন্বেষণ করিতে যাইয়া, অপঘাতে মরি কেন? আবার ভাবিলেন, শৈলজানন্দের হাতে দেবতারই যখন এইরূপ দুর্দ্দশা, তখন অপঘাত ভিন্ন আমিই বা তাহার নিকটে আর কি প্রত্যাশা করিতে পারি?

রতন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অন্ধকারে প্রতিপদে তাঁহার পদস্খলন হইতে লাগিল; তথাপি তিনি ফিরিলেন না।

একবার মাত্র পশ্চাতে চাহিলেন। ভাবিলেন, চক্ষু দুইটা আলোক স্নাত করিয়া, আর একটু দর্শনের উপভোগ করিয়া লই। কিন্তু একি! মন্দির দ্বার যে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে!

ব্রাহ্মণ প্রথমে ব্যাপারটা ভাল বুঝিতে পারিলেন না। আর কেহ পাছে মন্দির দ্বার উন্মুক্ত দেখে, এই জন্য কি মুন্না বাহির হইতে কবাট বন্ধ করিয়া দিল সশঙ্কচিত্তে ব্রাহ্মণ ডাকিলেন "মুন্না!"—উত্তর পাইলেন না।

কেবল কতকগুলা প্রতিধ্বনি মন্দিরগোলকে প্রতিহত ও সমষ্টিবদ্ধ হইয়া তাহার কর্ণে শত গুণ শক্তিতে 'মুন্না' নাম প্রবিষ্ট করাইয়া দিল।

ব্রাহ্মণের সন্দেহ হইল। ভাবিলেন, এতদিন পরে একটা নির্ম্মম দস্যুর আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়া,—তাহার ছলনা বুঝিতে অসমর্থ—এই তমোময় কারাগৃহে অনাহারে ভীষণ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে জন্মের মত কি আবদ্ধ হইলাম! স্মরণেই তাঁহার বজ্রসম কঠোর হৃদয়ও একবার ঘন বিকম্পিত হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, কি করিলাম! নিজেই সচেষ্ট হইয়া নিয়তিকে আলিঙ্গন করিলাম!

মুহূর্ত্ত মধ্যেই ব্রাহ্মণ প্রকৃতিস্থ হইলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, ফিরিব না। যদিই শৈলজানন্দের মনে দুরভিসন্ধি না থাকে! তাঁহার সাহস পরীক্ষার জন্যই যদি বৃদ্ধ এই অভাবনীয় উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে।

মৃত্যুভয় মাথায় [illegible] সম্মুখের অন্ধকার ভেদ করিতে চলিলেন,—প[illegible]সী হইলেন না।

ক্রমে যেন [illegible] দৃষ্টি চলিতে লাগিল; যেন

একটী একটী করিয়া কত কি তাঁহার চোখের উপর পড়িতে লাগিল। রতন প্রথমেই দেখিলেন পার্শ্বের একটী প্রকোষ্ঠ ক্ষীণ আলোকে ঈষৎ আলোকিত রহিয়াছে।

এ গবাক্ষহীন মন্দিরমধ্যে এ স্নিগ্ধরূপজ্যোতি কোথা হইতে আসিল! মুগ্ধনেত্রে রতন চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, মন্দিরগোলক হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রাচীরমূল পর্য্যন্ত মন্দিরের সমস্ত গাত্র, বন্দুক ও তরবারি দ্বারা আচ্ছাদিত! দুই দশ, সহস্র সহস্র,—অগণ্য অস্ত্র, মন্দির গাত্রস্থ দুই একটী ছিদ্র মধ্য দিয়া আগত অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের লোহিত কিরণ রেখায় প্রতিফলিত হইয়া, মুহূর্ত্তমধ্যে মন্দিরমধ্য আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। তরবারির উপর তরবারি, বন্দুকের উপর বন্দুক—রতন দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ আত্মজ্ঞান বিমোহিত স্থানুর ন্যায় নিশ্চলভাবে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া রহিলেন। চক্ষু পলকহীন, কেবল শৈলজানন্দের ধ্যানগম্য মুর্ত্তির সহিত এই অগণ্য অস্ত্র গুলির সামঞ্জস্য অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু পারিল না—এ সমস্ত জীবনাশী আয়ুধের ভিতরে বৃদ্ধের ভীমভৈরব মূর্ত্তির চিহ্ন পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইল না।

আলোক অল্পে অল্পে স্থানচ্যুত হইতেছিল, আবার অন্ধকারে—গাঢ়তর অন্ধকারে আবৃত হইবার ভয়ে রতন দ্রুতপদে সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন।

এখানে তিনি মণিবেদিকার উপরে, রত্নমণ্ডিত আসনে রত্নকমলে অষ্টভূজা নিরীক্ষণ করিলেন। মহাকালের হৃদয়-আসন পরিত্যাগ করিয়া, তৎপার্শ্বে অর্দ্ধশায়িতা, অষ্টভূজে স্বহৃদয় আবদ্ধ করিয়া, দেবী যেন ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা ছিলেন।

পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণ, নির্নিমেষলোচনে, বহুক্ষণ ধরিয়া দেবীকে দেখিলেন। শক্তিময়ীর শ্যামলবরণদেহে রাশি রাশি ধূলি সঞ্চিত হইয়াছে! পার্শ্বে ধূলিধূসরিত কলেবরে মহাকাল নিদ্রালসচক্ষে শক্তিহীনা শক্তির মুখপানে চাহিয়া, তার পাদস্পর্শ সুখাভিলাষের ইঙ্গিত করিতেছেন।

দেখিয়া ব্রাহ্মণ স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব বেদনার আবির্ভাব হইল। চক্ষে জল আসিল। কম্পিত, অশ্রুগদগদকণ্ঠে ব্রাহ্মণ একবার বলিয়া উঠিলেন"—আনন্দময়ী! তোমার এ অবস্থা আজ কে করিল মা! জাগো মা! একবার জাগো! জাগিয়া আর একবার তোমার ভক্তের পূজা গ্রহণ কর। নহিলে এ বিশ্বনাশিনী নিদ্রা সংক্রামকত্বে ভুবন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। কোন্ মন্ত্রে জগৎ প্রবুদ্ধ হয়, কৃপাময়ী, একটীবার জাগিয়া সেই মূলমন্ত্রের আভাস দাও। তোমার ভক্ত তাহা হইলে তোমার পূজা করিবার অবকাশ পায়।

কৃপাময়ী জাগিলেন না, ব্রাহ্মণের অলক্ষ্যে আঁধার-অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণও অন্ধকারে পথ হারাইবার ভয়ে, প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইতে চলিলেন।

বাহিরে আসিতে দেখিলেন, প্রকোষ্ঠের আর একটী দ্বার রহিয়াছে। কোন আলোকময় স্থানে উপস্থিত হইবার আশায়, তিনি সেই দ্বার খুলিলেন। দেখিলেন দ্বারদেশে মুন্না দাঁড়াইয়া।

"এ আমায় কি দেখাইলে মুন্না!"

"কি দেখিলে দেবতা!"

"কেন তুমি কি দেখ নাই?"

"কেমন করিয়া দে[illegible]মন্দিরে প্রবেশ করিবার আমার অধিকার কই!"

"কি আছে, মনিবের কা[illegible] কথন শুন নাই!"

"কথন জিজ্ঞাসাও করি নাই। মনিবও উপযাচক হইয়া আমাকে কিছু বলেন নাই।"

"তোমরা কি কি অস্ত্র লইয়া ডাকাতি করিতে?"

"কেবল লাঠী।—তবে বাঙ্গালায় ডাকাতি করিতে যাইলে, কখন কখন বন্দুক ব্যবহারের অনুমতি পাইতাম।—আমিও আমার দশ জন শিষ্য বন্দুক ব্যবহার করিতাম।"

"সেই সুদূর বাঙ্গালায়ও ডাকাতি করিতে যাইতে?"

"অনেকবার গিয়াছি—ঢাকা, ময়মনসিং, রাজসাহী—আমরা কোথায় না গিয়াছি দেবতা! আমার প্রভু বলিতেন, বাঙ্গলার জমীদারের মত অপদার্থ জীব জগতে আর নাই। কোন সৎকার্য্যে স্বেচ্ছায় তাহারা অর্থব্যয় করিতে জানে না। তাহাদের কাছে চোখ রাঙাইয়া অর্থ লইতে হয়, তাহাতেও না পাইলে প্রহার।"

"দেখ আমার দেশের নিন্দা করিও না।—শুনিলে আমার কষ্ট হয়।"

"মাপ্ করুন দেবতা! আর বলিব না।"

"তোমরা বন্দুক ছুঁড়িতে জান?"

"বন্দুক কি? আমার অধীনে হাজার লোক কামান ছুঁড়িতে শিখিয়াছে।"

"কামান আছে?"

"আমি পঞ্চাশটী কামানের ব্যবহার করিয়াছি!"

"সে কামান কোথায়?"

"তা জানি না।"

"এখনও কি তোমরা কামান ছোঁড়?"

"কামান ছোঁড়া, বন্দুক ছোঁড়া, ডাকাতী—সব এক সঙ্গে পরিত্যাগ করিয়াছি।"

"কেন পরিত্যাগ করিয়াছ, বলিতে পার না?"

"কেমন করিয়া বলিব প্রভু;—তবে একবার প্রভুকে কামান বন্দুকের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, আমার জীবনে আর তার প্রয়োজন হইবে না। এখন ইংরাজ আমাদের রাজা। রাজ্যে আইন আসিয়াছে।"

রতন আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। মন্দির-দ্বার হইতে কতকগুলি অপ্রশস্ত সোপান, একটী অনতিবৃহৎ পুষ্পোদ্যানে নামিয়া গিয়াছে। রতন সেই সোপানাবলীর সাহায্যে উদ্যানে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, উদ্যান এখন যত্নের অভাবে একটী ক্ষুদ্র অরণ্যে পরিণত।

যাহাকে বুঝিবার নয়, তাহাকে বুঝিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তোমার পার্শ্বে বসিয়া কেহ আজীবন হাসিয়া চলিয়া গেল; যাতনার তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত তুমি চিরদিন ঈর্ষার সহিত তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিলে—কিন্তু হায়! এক দিবসের জন্যও তুমি বুঝিতে পারিলে না যে, সে অভাগা তোমা অপেক্ষা কি গভীরতর যাতনায় জর্জ্জরিত! সাধুতার আদর্শ তোমাকে আত্মীয়তায় বরণ করিতে আসিয়া, কতদিন তোমার নিকট হইতে ঘৃণার সহিত দূরীভূত হইয়াছে; তুমি শতচেষ্টা করিয়াও তাহাতে সাধুতার চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাও নাই। যে ধর্ম্ম

দিবার নয়, সে তোমাকে কিছুতেই ধরা দিবে না। এইরূপ দর্শন-বিজ্ঞানের অভাবে, প্রেমিকে কঠোরতা, অসাধুতে ন্যায়-নিষ্ঠা, জ্ঞানীতে মূর্খতা, যে প্রকৃতি যাহার নয়, তাই দেখিয়া কতকাল হইতেই না আমরা প্রবঞ্চিত হইয়া আসিতেছি! রতন মনে মনে স্থির করিলেন, শৈলজানন্দ যা আছে তাই থাকুক, আমি আর তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিব না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দেবী দর্শন করিয়া রতন বরাবর শৈলজানন্দের কাছে উপস্থিত হইলেন, মুন্না তাঁহাকে একটি গোশালায় লইয়া গেল। সন্ধ্যার পর শৈলজানন্দ এই স্থানেই থাকিতেন। থাকিয়া গো সেবার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

এই স্থানেই তিনি ব্রাহ্মণেরও সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গোশালার মধ্যে একখানি আটচালার চারিদিক খোলা। মধ্যে বসিয়াই চতুর্দ্দিকে গোগৃহগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, এই আটচালাতেই শৈলজানন্দ দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। সর্ব্বদাই এখানে থাকিতেন বলিয়া, শৈলজানন্দ স্থানটীকে একটী আশ্রমের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছিলেন। আট-চালা বেড়িয়া সমশীর্ষ অসংখ্য বকুল বৃক্ষ বৃত্তাকারে অবস্থিত গ্রীষ্মকালে তাহার তলদেশে গোরুগুলা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রৌদ্রের তেজ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে, এইজন্য শৈলজানন্দ নিজেই বৃক্ষগুলি রোপন করিয়াছিলেন। এখনও

সে গুলি বেশী বড় হয় নাই। তাহারই একটীর তলদেশে দুইখানি চৌকী পাতিয়া শৈলজানন্দ রতনের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিলেন।

রতনকে একখানি চৌকিতে বসাইয়া শৈলজানন্দ নিজে অপর খানিতে উপবিষ্ট হইলেন।

শৈ। তামাকু সেবন করা হয় ?

রতন। বিশেষ রকমই করা হয়। বিশেষতঃ তোমার মন্দির দেখিয়া, তামাকুর পিপসাটা বড়ই বাড়িয়াছে।

শৈ। একটু ভয় বোধ হয় হইয়াছিল।

মুন্না কাছে দাড়াইয়াছিল,—শৈলজানন্দ তাহাকে স্থানত্যাগের ইঙ্গিত করিলেন, আর বলিলেন, শীঘ্র তামাকু লইয়া আসিতে বল। আদেশমাত্র মুন্না স্থানত্যাগ করিল।

ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন—"প্রথমে বিশেষ রকমেই ভয় হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, বুঝি সেখানে জন্মের মত থাকিতে হয়।"

শৈ। আপনার ছোটনাগপুরে আর কি ফিরিবার ইচ্ছা আছে ?

রতন। ইচ্ছা নাই। কিন্তু বোধ হয় ফিরিতে হইবে।

শৈ। ফিরিতেই হইবে--আমার বোধ হয় তীর্থ আপনার ভাল লাগিবে না।

রতন। তুমি কি কখন তীর্থে গিয়াছিলে ?

শৈ। কখন না। যাইবার একান্ত কামনা ছিল, কিন্তু ঠাকুর, এ জীবনে তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না।

রতন। কেন ? মিছামিছি এ আত্ম-নিপীড়নে ফল কি ?

শৈ। তীর্থের পথ ত প্রস্তুত করিতে পারিলাম না।

রতন। তুমি কি তার জন্য আক্ষেপ কর?

শৈ। এক এক সময় আক্ষেপ হয় বই কি। তবে অনেক সময় মনকে প্রবোধ দিই, তাহাকে বুঝাই, আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, তীর্থের পথ আমি প্রস্তুত করিতে পারি. আমার সেরূপ শক্তি কই?

রতন। আক্ষেপ করিওনা—তোমার অন্ধকারের আয়োজন যদি অন্ধকারেই মিলাইয়া যায়, তাহাতেও আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই। কার্য্য কর তুমি, কিন্তু ফলদাতা শ্রীকৃষ্ণ।

ভৃত্য একটী নূতন হুঁকায় জল করিয়া, নূতন কলিকায় তামাকু সাজিয়া রতনের হাতে দিল। রতন তামাকু টানিতে প্রবৃত্ত হইলে, সে তাঁহার পা ধুইয়া দিল। শৈলজানন্দ বলিলেন "তামাকু সেবন করিয়া আটচালায় বসিবেন, সেখানে সন্ধ্যা-বন্দনাদির আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি। আমি একবার বাটীর মধ্য হইতে ঘুরিয়া আসি"—এই বলিয়াই শৈলজানন্দ উঠিলেন। রতন বলিলেন—"আজ রাত্রির মধ্যে আর দেখা হইবে কি?"

রতন বুঝিয়াছিলেন, গভীর মর্ম্মবেদনায় শৈলজানন্দ স্থানত্যাগ করিতেছে। হয়ত বৃদ্ধ আর ফিরিবেনা।

শৈলজানন্দ হাসিয়া বলিলেন—"ফিরিব বই কি ঠাকুর। আজ জীবনে প্রথম অতিথিসংকার করিতেছি, ফিরিব না।"

রতন। তবে এস। কিছু মনে করিও না, তোমাকে ছাড়িতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। আমি তোমাকে যতক্ষণ না দেখিয়াছি, ততক্ষণ কেবল তোমার উপর রাগ করিয়াছি।

শৈলজানন্দ উত্তর করিলেন না—চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ তামাকু টানিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ছেলের হাত ধরিয়া তুলসী আসিল।

রতন। কি মা তুলসী, এখানে যে?

তুলসী। নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছি।

রতন। কতদিন পরে?

তুলসী। কতদিন, তা মনেই নাই। প্রায় বার বৎসর এখানে আসি নাই। এস্থান পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। কিন্তু কিরূপ ছিল, স্মরণে আসিতেছে না। এ সমস্ত বকুল গাছ তখন দেখি নাই।

রতন। এই এতকালের মধ্যে মা বাপের সঙ্গেও কি তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই?

তুলসী। মা লুকাইয়া লুকাইয়া আমাকে দেখিয়া আসিতেন। বাবাকে একদিনের জন্যও দেখি নাই। দেখিতে পাব এ আশাও ছিল না। শুধু আপনার কৃপায় তাঁহাকে আবার দেখিতে পাইলাম! কিন্তু প্রভু, আসিয়া কি দেখিলাম! কাঞ্চন-মন্দিরের চূড়া হেলিয়া পড়িয়াছে। দু'দিন পরে আসিলে বুঝি আর দেখিতে পাইতাম না!

বলিতে বলিতে তুলসী কাঁদিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণের আঁখি ভিজিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন শৈলজানন্দ সম্বন্ধে আর কোন কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবেন না। কিন্তু এই পিতৃ-বৎসলা রমণীর কথায় তিনি বড়ই মর্ম্মব্যথা পাইলেন। তাঁহার পিতার সম্বন্ধে দুই একটা কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

রতন। পিতার কাছে কি এমন অপরাধ করিয়াছিলে

তুলসী, যে বার বৎসর পিতার নিকট হইতে তাড়িতা রহিয়াছ?

তুলসী। অপরাধ ত কিছুই জানি না দেবতা।

রতন। অপরাধ জানিলে না, তথাপি তুমি তাড়িতা হইলে?

তুলসী। অজ্ঞানে কি অপরাধ করিয়াছিলাম, তাহা কেমন করিয়া বলিব। একদিন প্রভাতে শয্যা হইতে তুলিয়া, পিতা আমাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন, 'যদি আমার কন্যা হও, তাহা হইলে স্বামীর সঙ্গে এখনি আমার গৃহ ত্যাগ কর। যতদিন তোমাকে নিজে না আনিতে যাই, ততদিন এ গৃহে পদার্পণ করিও না। আমি মরিলেও আসিও না'।

রতন। পিতা কি তোমাকে ভাল বাসিতেন না?

তুলসী। আমাকে একদণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না।

রতন। তোমার স্বামীর প্রতি কি তাঁহার ক্রোধ হইয়াছিল?

তুলসী। ক্রোধের কারণ ত কখন দেখি নাই। স্বামীও আমাকে কখন কিছু বলেন নাই। আর কয়দিনই বা তাঁহার সহিত আমার কথা হইয়াছে। বিবাহের দশদিন পরেই তিনি আমাকে শ্বশুরের ঘর আগলাইতে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এ বার বৎসরের মধ্যে তাঁহার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

রতন। তোমার শ্বশুর কি তখন জীবিত ছিলেন?

তুলসী। শ্বশুরও ছিলেন, সৎশাশুড়ীও ছিলেন। কিন্তু স্বামীর গৃহত্যাগের এক বৎসরের মধ্যে দুইজনেই লোকান্তরিত

হইয়াছেন। মা আমাকে এই শিশুটি দিয়া গিয়াছেন। ভাগ্যে এটীকে পাইয়াছিলাম, তাই আজও জীবনধারণ করিয়া আছি।

বালক এতক্ষণ কি জানি কেন চুপ করিয়াছিল। আর স্থির থাকিতে পারিল না। মায়ের আচল ধরিয়া টানিল—বলিল 'বাড়ী চল্।'

রতন। আর তুমি বাড়ী যাইতে পারিবে না। এই এখন তোমাদেরই বাড়ী।

বালক রতনের উপর হাত উচাইল—বলিল "মারবো।" রতন বলিলেন—"মারই আর যাই কর, তোমাকে আর ছাড়িয়া দিতেছি না।" বালক তুলসীকে ছাড়িয়া, ছুটিয়া রতনের হাত ধরিল। তুলসী বলিল "ছি! উনি আমাদের গুরু। ওঁর গায়ে হাত তুলিতে নাই! উনি ঠিক বলিয়াছেন।"

রতন বালককে কোলে টানিয়া লইলেন। আর বলিলেন—"তোমার যেমন মা আছে, তোমার মায়েরও সেই রকম মা আছে। তুমি মাকে একদণ্ড ছাড়িতে পার না। তোমার মাই বা তার মাকে ছাড়িয়া থাকিবে কেন?"

বালক কথা বুঝিল না। ছল ছল নেত্রে তুলসীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। তুলসী বলিল "না তা কেন? তুমি এখানেও থাকিবে, সেখানেও থাকিবে।"

এই সময় মুন্না আসিয়া তুলসীকে বলিল "প্রভু তোমাকে ডাকিতেছেন। তুলসী বালককে ক্রোড়ে লইয়া বাড়ীর ভিতরে চলিল। রতনও সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিতে উঠিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

রাত্রে একবার মাত্র শৈলজ্ঞানন্দের সহিত রতনের সাক্ষাৎ হইল। শৈলজ্ঞানন্দ রতনের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলেন। দুইজনে আর কোনও কথা হইল না।

রতন স্থির করিয়াছিলেন, শৈলজানন্দের বিষয় বড় একটা চিন্তা করিবেন না। কিন্তু তাঁর সমস্ত রাত্রি শৈলজানন্দের ভাবনাতেই কাটিয়া গেল! সে বৃদ্ধ একটী পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত গৃহে কোমল শয্যায় তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ সারারাত্রি তাহার উপর এপাশ ওপাশ করিলেন,—নিদ্রা আসিল না। ভাবিলেন, রাজারাণীর চিন্তা ছাড়িলাম, নারায়ণীর চিন্তা ছাড়িলাম, অমন সুখের অনন্তপুরকেই ভুলিতে চলিয়াছি, তখন কোথাকার কে শৈলজানন্দের চিন্তা লইয়া মরি কেন? আমার কার্য্য ত শেষ হইয়াছে, সুতরাং আর এখানে থাকিয়া লাভ কি? ছোটনাগপুরের চিন্তা এই স্থানেই রাখিয়া তীর্থের দিকে চলিয়া যাই।

শৈলজানন্দের সঙ্গে দেখা হইলে, হয় ত দু' চারি দিনের মধ্যে এস্থান ত্যাগ করিতে পারিব না; বিলম্ব করিলে, আরও কত কি আপদ কত দিক হইতে ঘেরিয়া ধরিবে, অন্যমনস্কে হয়ত আবার কোন একটা কঠিন শৃঙ্খল পায়ে জড়াইব—নানা প্রকার চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ শৈলজানন্দের ঘর ছাড়িতে সংকল্প করিলেন। সেই দুষ্ট বালকটার মূর্ত্তি ধরিয়া, একটা কঠিন শৃঙ্খল যেন তাঁহার চোখের উপর দিয়া, ঝন ঝন শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই এস্থান ত্যাগ করা

কর্ত্তব্য। তামাকুটা সাজিয়া খাইবেন, তাঁহাতছিল। রতন কুলাইল না। তল্পীটা কাঁধে তুলিয়া মৃগচর্ম্মটা বগমে প্রাতঃ- একহাতে লাঠি অন্য হাতে হুঁকাটী লইয়া ব্রাহ্মণ ঘর ঃ বাহির হইয়া পড়িলেন। ভৃত্য ঝম্মন দ্বারদেশে মাথা রাগিয়া শুইয়া ছিল। চৌকাট পার হইতে চরণটা তার মাথায় ঠেকিয়া গেল।

তখন অনেক রাত্রি ছিল। চৌকাটে মাথা রাখিয়া ঝম্মন একটা বড় সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল। অনেক দিন পূর্ব্বে প্রতিবাসিনী ষোড়শী মুংরীর সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ হয়। গরীব ঝম্মন যা যেখান হইতে উপার্জ্জন করিয়া আনিত, সমস্তই মুংরীর মায়ের হাতে ধরিয়া দিত। তথাপি অকৃতজ্ঞা মুংরীর মা মুংরীকে অন্য ব্যক্তিকে সম্প্রদান করিল। ঝম্মনের মনো- কষ্টের সীমা রহিল না। কিন্তু মুংরীর মাকে বহুদিন ধরিয়া সে যে সমস্ত সামগ্রী দান করিয়াছিল, একদিনের জন্যও তার দাবী দাওয়া করে নাই। তাহার বিশ্বাস ছিল, মুংরী তাহাকে ভাল বাসিত। শুধু তার মায়ের জন্যই সে অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং মুংরীর উপর ক্রুদ্ধ না হইয়া সে তাহার একটা অসহনীয় দুঃখ কল্পনা করিত। মনে মনে ভাবিত, অনিচ্ছায় পরহস্তে পড়িয়া বালিকাটা তাহার জন্য কত কষ্ট না পাইতেছে! কিন্তু দিন কয়েক পূর্ব্বে মুংরীর সহিত দুই চারিবার সাক্ষাতে ঝম্মন তাহার ভিতর ভালবাসার বড় একটা চিহ্ন দেখিতে পায় নাই। ঝম্মনের এইবার যথার্থই ক্রোধ হইয়াছে।

ক্রোধে ঝম্মন স্বপ্ন দেখিতেছিল। সে একটি গাছ তলায় বসিয়া আছে, আর মুংরী তাহারই প্রদত্ত সাড়ীখানি পরিয়া

দ্বারেই সম্মুখে পথ চলিতেছে। রাগে ঝম্মন রা...লায় বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে, এমন সময় হঠা...র বোধ হইল, পশ্চাৎ হইতে মুংরী তাহার মাথায় ঠোকর মারিল। আহ্লাদে কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া, ঝম্মন তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। দুর্ভাগ্যবশে মুংরীর হাত খানা রতনের পা হইয়া গেল! রতন দেখিলেন, সতর্ক প্রহরী ঝম্মন, চোর মনে করিয়া তাঁর পা ধরিয়াছে।

রতন। ঝম্মন ছাড়িয়া দে, আমি চোর নই।

ঝম্মন। তুমি চোর নওত, চোর কে? তুমি আমার যথা-সর্ব্বস্ব চুরি করিয়াছ।

রতন। আমি তোর কি চুরি করিলাম?

ঝম্মন। তুই আমার মন চুরি করিয়াছিস্, প্রাণ চুরি করিয়াছিস্।

রতন অবাক হইয়া দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন, বেটা বলে কি?

মুংরীকে নিরুত্তর দেখিয়া ঝম্মনের সাহস হইল। তখন সে আরও জোর করিয়া যেন তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, এবং সবিনয়ে বলিল—"ব'ল্ মুংরী আমাকে ছাড়িবি না?"

ব্রাহ্মণ বুঝিলেন ভৃত্যটা স্বপ্ন দেখিতেছে। তখন কি করেন, ধীরে ধীরে তার হস্ত হইতে চরণ মুক্ত করিলেন। সে বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে বলিতে চুপ করিল। বহির্গমনমুখেই বাধা পাইয়া, তাঁহার মনে একটু আশঙ্কা উপস্থিত হইল! ভাবিলেন, অদৃষ্টে আরও বিপদ আছে নাকি?

কিন্তু পদে পদেই বিপদ ভাবিতে হইলে, আর পথ চলা হয় না। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, অদৃষ্টে যাই থাকুক, আর ফিরিব না।

বহির্দ্বারের নিকটে বারাণ্ডায় মুন্না ঘুমাইতেছিল। রতন তাহাকে উঠাইয়া বলিলেন,—"আমি চলিলাম। তুমি প্রাতঃ-কাল পর্য্যন্ত প্রহরীর কার্য্য কর।"

মুন্না। মনিবের সঙ্গে দেখা করিবেন না?

রতন। দেখা করিলে, সহজে যাইতে পাইব না।

মুন্না। তুলসীর সহিত দেখা করিবেন না?

রতন। ফিরিয়া আসিলে দেখা করিব। মুন্না! এখন আর বাধা দিয়োনা।

মুন্না দ্বিরুক্তি না করিয়া সাষ্টাঙ্গে রতনকে প্রণাম করিল। ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিয়া বাটীর বাহির হইলেন।

অন্ধকারে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া রতন সেই পূর্ব্বোক্ত সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় একটা কাপড়ের পুঁটলী বগলে করিয়া তুলসী তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। রতন বুঝিলেন, মুন্নার কাছে সংবাদ পাইয়া, তুলসী তাঁহাকে দেখিতে ছুটিয়া আসিয়াছে। ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে, সেটা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু কক্ষে একটা বৃহৎ পুঁট-লীর অস্তিত্বের কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎ অপ্রতিভের মত তিনি বলিলেন –"তোমার সঙ্গে দেখা হইল, ভালই হইল। মা! তোমার পিতাকে বলিও, আমি চলিলাম। তীর্থে যাইবার জন্য আমার মন উদ্বিগ্ন হইয়াছে।"

তুলসী। তবে আমাকে লইয়া যাইবে কে?

রতন। তুমি কোথায় যাইবে?

তুলসী। আমিও তীর্থে যাইব।

রতন। তীর্থে যাইবে!

তুলসী। হাঁ প্রভু। তীর্থে যাইবার জন্য আমারও মন উদ্বিগ্ন হইয়াছে।

রতন। তা আমার সঙ্গে কিরূপে যাইবে?

তুলসী। আপনি আমার স্বামীর গুরু। তীর্থের পথ আপনি দেখাইবেন না ত দেখাইবে কে?

রতন। তুলসী, তোমার কথা আমি ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি একজন সম্ভ্রান্তের কন্যা। অভিভাবকহীনার ন্যায়, এক ভিখারী ব্রাহ্মণের সঙ্গে তীর্থে যাইবে কি! লোকে শুনিলেই বা কি মনে করিবে!

তুলসী। আপনি কি কিছু জানেন না?

রতন। কি জানিব?

তুলসী। আমার স্বামীর পত্রের কথা?

রতন। আমি কেমন করিয়া জানিব? সদাশিব ত পত্রের বিষয় আমাকে কিছু বলে নাই। আমার হাতে মোড়ক করিয়া আনিয়া দিয়াছে; আমিও সেই অবস্থায় পত্র তোমার পিতার হাতে আনিয়া দিয়াছি।

মাথা হেঁট করিয়া তুলসী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিল, তারপর বলিল—"যদি না জানেন, তথাপি আপনি আমাকে সাহায্য করিতে পারেন না?"

রতন। কি করিতে হইবে বল।

তুলসী। আমাকে অনন্তপুরে রাখিয়া আসিবেন।

রতন। তোমার স্বামী কি যাইতে লিখিয়াছেন?

তুলসী। পত্রখানা সঙ্গে আছে, পাঠ করিবেন কি?

রতন। এখনও অন্ধকার আছে।

তুলসী। অনুমতি করুন, আমি পড়ি।

রতন। পড়িতে হবে না, কি লেখা আছে বলিতে পার।

তুলসী। তিনি পত্রপাঠ আমাকে অনন্তপুরে পাঠাইতে পিতাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

রতন। কেন বুঝিতে পারিয়াছ কি?

তুলসী। রাজকুমারী নারায়ণীর সহচরী হইয়া আমাকে অনন্তপুরে থাকিতে হইবে।

রতন। এরূপ কার্য্যে তোমার পিতা সম্মতি দিলেন! ইহাতে যে তাঁর মানহানি হইবে।

তুলসী। রাজার পূর্ব্বাবস্থা থাকিলে হইত। তাঁর এখন বড় দুরবস্থা। এরূপ সময়ে তাঁর পরিবারভুক্ত হইলে, তাঁহারই উপকার করা হয়। আমি জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত নারায়ণীর ভার-গ্রহণ করিব।

তুলসী যদি অন্ধকারে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে দেখিত, ব্রাহ্মণ তাহার মুখ দেখিবার জন্য আকুলনেত্রে, আকাশব্যাপী গ্রহতারার কাছে আলোক ভিক্ষা করিতেছে।

"তুলসী! কিন্তু তুলসী"—রতনের স্বর কাঁপিয়া উঠিল। "কিন্তু মা! তোমারও যে দুর্দ্দশা হইবার সম্ভাবনা।"

তুলসী। বিবাহের পর হইতেই স্বামিদর্শনসুখে বঞ্চিত আছি। নারীর এহ'তেও দুর্দ্দশা আর কি হইতে পারে প্রভু!

তুলসী এবারে ব্রাহ্মণকে চলিতে অনুরোধ করিল। বলিল, "অপেক্ষা করিলে বাধাবিঘ্নের সম্ভাবনা। বুঝিয়াছেন ত আমি সন্তান ফেলিয়া চলিয়াছি।—সে যদি জাগিয়া পথরোধ করে, তাহা হইলে আজ হয়ত যাইতে পারিব না।—আজ কেন, হয়ত,

আর কখনও পারিব না। অনেক কষ্টে মন প্রস্তুত করিয়াছি। অন্ধকার থাকিতে থাকিতে, আসুন অগ্রসর হই।”

তুলসী অগ্রসর হইল। দেবাদিষ্টবং ব্রাহ্মণ তার অনুসরণ করিলেন। একবারমাত্র তীর্থের কথাটা মনে উঠিল। মনে মনে বলিলেন, “আমি কোথায় চলিয়াছি?” হৃদয়মধ্য হইতে উত্তর আসিল—“তীর্থে” –“পথ দেখাইতেছে কে?”—উত্তর—“দেবতা।”

তাহার আর একবার তুলসীকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল—“সেখানে নারায়ণীর রক্ষায় চলিয়াছ। কিন্তু সে অবস্থায় স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে যে তাহার অনিষ্ট হইবে। তোমার স্বামী রাজার শত্রুর গৃহে চাকরী করিতেছে।”

“স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিব না। তিনি দেখা করিতে আসিলে, দেখা করিব না। বহুদিনের পর দেখা, তিনি যদিও চিনিতে পারেন, আমি তাঁহাকে চিনিব না।” মাথা তুলিয়া, ব্রাহ্মণ এবারে প্রাণপণে তুলসীর মুখ দেখিতে চেষ্টা করিলেন। বৃদ্ধ দেখিলেন, সুন্দরীর মুখ মৃদু হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে। আর তারই কিয়দংশ চুরি করিয়া উষার আকাশ সোণার বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ড।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুইদিন পরে, সন্ধ্যায় দুইজন দরোয়ান বীরচন্দ্রের দেউড়ীর সম্মুখের বেদীর উপর বসিয়া কথা কহিতেছিল। তাহার মধ্যে বাঁকাদার পাঁড়ে, পলায়ন সিংহ তেওয়ারীকে কহিল, "পণ্ডিতজীকে পাকড়াওকরা কি পেট গজন্দার সিপাহএর কাজ? উহারা লাঠী খেলার কি জানে? লড়ায়ে লাঠী কেমন করিয়া ধরিতে হয়, তাই এখনও শিখে নাই। শুধু সুপারিষের জোরে দেওয়ানজীর কাছে চাকুরী পাইয়াছে।"

পলা। তা যা বলিয়াছ পাঁড়েজী! সুপারিষের কাল পড়িয়া সকলেরই পশার বাড়িয়া গেল। নহিলে তুমি আমি দশ টাকায় জন্ম কাটাইলাম, আর কোথাকার কে সদাশিব সরগুজার রাজার সুপারিষের জোরে, একেবারে সবাইকে ডিঙ্গাইয়া কুড়ি টাকার জমাদারী পাইল!

বাকা। সেই জন্যইত পণ্ডিতজীকে ধরিয়াও ধরিলাম না।

পলা। সেই জন্যইত আমি দূরে দূরে দাঁড়াইয়া শুধু লড়াই দেখিতে লাগিলাম। দশটা টাকার জন্য প্রাণ দিতে যাব কেন?

বাকা। লড়াই করিলে কি পণ্ডিতজী চোখের সামনে দিয়া পলাইতে পারে? তার কাণ পাকড়াইয়া একেবারে সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করিতাম।

পলা। কই সদাশিব ত আস্ফালন করিয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু বৃদ্ধকে ধরিতে পারিল কি? আমি হইলে না ধরিয়া কি ফিরিতাম? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যখন চোখের সামনে দিয়া পলাইয়া যায়, তখন একবার মনে করিলাম, লাঠী দিয়া বৃদ্ধের ঠ্যাং খোঁড়া করিয়া দিই। এই মনে করিয়া লাঠীটী উঠাইলাম, কিন্তু সদাশিবের কথা মনে পড়িতেই, রাগে শরীর কাঁপিয়া গেল। লাঠীটাও অমনি ঠক্ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। মনে করিলাম, কেন ধরিব, কার জন্য ধরিব, এ সংসারে মানীর মর্য্যাদা কই? সূক্ষ্ম বিচার কই? ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া আসিলাম। লাঠীটে যে মাটীতে ফেলিয়াছি, সেটা মনেই রহিল না।

বাক্য। পণ্ডিতজী—পণ্ডিতজী—নাম যা শুনিয়াছিলাম, তা কাজে দেখিলাম কই?

বাক্য। ওই কি লাঠী ঘোরান। একটু বাঁয়ের প্যাঁচ মেরে ডাইনে ঠোকর দিলে, টপ্ করিয়া বুড়ার হাত হইতে লাঠীটী খসিয়া পড়িত। লাঠী খেলাটা দেখাইতে পারিলাম না বলিয়া রাগে আমারও সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।

পলা। কিন্তু পণ্ডিতজীকে যে ধরিতে পারিবে, তাহাকে আর চাকুরী করিয়া খাইতে হইবে না।

বাক্য। এই জন্যই ত ক্রোধটা আমার কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। আজ কোন একটা অযোগ্য লোক বুড়াকে ধরাইয়া দিয়া, এক দমে হাজার টাকা পাইবে, ফাঁকতালে বড়লোক হইয়া যাইবে—এ দুঃখ আমাদের প্রাণে সহিতেছে না।

দুঃখের সমস্ত বোঝাটা যেন পলায়ন সিংএর ঘাড়ে পড়িয়া

গেল। তাহার বোধ হইল, যেন কোন অজ্ঞাতকুলশীল নরাধম তাহার সম্মুখ হইতে, টাকার তোড়াটা ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতেছে। মনের ভিতর হইতে রাণীমুখো টাকাগুলা, তার পানে চাহিয়া, যেন হাসিয়া হাসিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। কি মধুর প্রাণস্পর্শী ঠুনঠুন, টুনটুন শব্দ! তেওয়ারীজী আর সহিতে পারিল না। অতি মিষ্টরস প্রাণে পশিয়া তাহার সর্ব্বশরীরে এক অসহনীয় জ্বালা উৎপাদন করিল। তেওয়ারীজী সর্ব্বাঙ্গ নখদ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়া, পৃষ্ঠে গণ্ডে গোটাকতক চাপড় মারিয়া, বলিয়া উঠিল—"ইস্! এক হাজার টাকা! সুদের সুদ, তার সুদ—আরও কতকির সঙ্গে মিশিয়া, পাঁচ বছরে সে হাজার টাকা কি বাড়ই না বাড়িত! বাগান বাগিচায়, ঘরে দোরে, চাকরে বাকরে—জমা জমীতে কত প্রকারেরই মূর্ত্তি ধরিয়া, সে হাজার টাকা! ইস্!"—তেওয়ারীজী আর বলিতে পারিল না। কেবল বার কতক ইস্ ইস্ করিতে লাগিল। তেওয়ারীজীর বোধ হইল, টাকাগুলা যেন হাতের কাছ হইতে সরিয়া যাইতেছে। আহা! হতভাগ্য পণ্ডিতজী যদি নিজের পায়ে লাঠি মারিয়া খোঁড়া হইয়া পড়িত, কিম্বা তাহাকে দেখিয়া মুদ্রিত চক্ষে হাত দুখানি বাড়াইয়া দিত—এক গাছি কোমল রজ্জু দিয়া বাঁধিবার জন্য—তাহা হইলে আজ তেওয়ারীজীর অন্ন খাইত কে?

আসল কথা রতনের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। রতনের হাত হইতে নিস্তার পাইবার ভয়ে, আনন্দদেব কর্ত্তৃপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বুঝাইয়াছে দুর্দ্দান্ত দস্যু রতন রায়, তার প্রাণনাশে সর্ব্বদা সচেষ্ট। তাহার চারু

হইতে রক্ষা না করিলে, তিনি সর্ব্বর কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। আনন্দদেবের অপসারণে জমীদারী কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে, ভাবিয়া রাঁচির বড় সাহেব, দস্যুদমন সঙ্কল্পে, অনন্তপুরে নিজেই তদারকে আসিয়াছিলেন। তদারকের ফলে হার্‌লি তিরস্কৃত হইয়াছেন, এবং অবৈধজনতা, দস্যুতা, গুরু প্রহারাদি অভিযোগে রতনের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। পুলিশ চারিদিকে রতনের সন্ধান করিয়াছে। খানাতল্লাসী করিতে বীরচন্দ্রের প্রাসাদে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হয় নাই। রতনকে কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া রাজাকে কতকটা লাঞ্ছিতও হইতে হইয়াছে। অনুসন্ধানে যখন রতনকে পাওয়া গেল না, তখন তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা হইল।

পলায়ন সিং যখন সেই পুরস্কারটা স্মরণ করিয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছিল, তখন আর একজন দরোয়ান সেখানে ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, পণ্ডিতজী ধরা পড়িয়াছে। পুলীশ হাতকড়ি দিয়া তাঁহাকে অনন্তপুরে আনিতেছে।

শুনিবামাত্র তাহারা ব্রাহ্মণকে দেখিবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে, গভীর কোলাহল অনন্তপুর আবৃত করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রতনের অনন্তপুরে ফিরিতে ইচ্ছা ছিল না। করিয়াছিলেন, সুবর্ণরেখার তীর পর্য্যন্ত পৌছিয়া, তু রাজার বাড়ীর পথ বলিয়া, নদীর এপার হইতেই ফিরিবেন কিন্তু সেখানে পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। এরূপ সময়ে সুন্দরী যুবতীকে তিনি কেমন করিয়া একা ছাড়িয়া দেন!

বিশেষতঃ অনন্তপুরের এখন আর পূর্ব্বাবস্থা নাই। এক সময়ে তিনিই সে নগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার ভয়ে নগরের কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে সাহসী হইত না। রমণীর মর্য্যাদানাশ সেত দূরের কথা। তখন রমণী-কুল নির্ভয়ে নগরের নানা স্থানে যাতায়াত করিত।

সেই শান্তিপূর্ণ স্থান এখন একরূপ অরাজক হইয়াছে। দুই দিন পূর্ব্বে তিনি নিজেই পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াছেন। তুলসী বিপন্না হইলে কে তাহাকে রক্ষা করিবে!

নদীতীরে আসিয়া ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সেটা বিশ্রামযোগ্য স্থান নয়। পশ্চাতে ঘন বন, সম্মুখে সুবর্ণরেখাপারে অনন্তপুর দেখিয়াই ব্রাহ্মণের মনে সে দিনকার অপমানের কথাটা জাগিয়া উঠিল। পারে যাইলে আবার না জানি কি দুর্দ্দশা হইবে। ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

সুবর্ণরেখা পার্ব্বতীয়া নদী—অনেক সময়েই স্বল্পজলা, হাঁটি-য়াই পার হওয়া যায়। ব্রাহ্মণকে পারে যাইতে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া, বুদ্ধিমতী তুলসী বুঝিল ব্রাহ্মণের নদীপারে

যাইবার ইচ্ছা নাই। তীর্থের পথ হইতে সে জোর করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়াছে। মন বুঝিবার জন্য সে জিজ্ঞাসা করিল—

"নদীর পথ কি সুগম নয়?"

"এখনও সুগম আছে। এর পরে থাকিবে কি না বলিতে পারি না। এ সময় মাঝে মাঝে পাহাড়ে বৃষ্টি হয়। সুতরাং মাঝে মাঝে জল বাড়ে।"

"তবে আপনি দাঁড়াইয়া আছেন কেন?"

"তুমি এখন একা যাইতে পারিবে না?"

"অনন্তপুর কতদূর?

"পারে। সোজা হইবে বলিয়া আমি বন পথ দিয়া আসিয়াছি। এ পথ সাধারণজনগম্য নয়। পারে, সম্মুখে ওই বনাংশ। ওইটা পার হইলেই রাজার বাড়ী দেখা যায়।"

তুলসী অন্য রমণীদিগের মত একান্ত অবলা নয়। বীর পুরুষযোগ্য সাহসের তার অভাব ছিল না। দশ বৎসর একটী কুটীরে সে একা বাস করিয়াছে। একটী বালকের অভিভাবিকা —তার প্রয়োজনের জন্য সে কতবার কত স্থানে সময়ে অসময়ে একা যাতায়াত করিয়াছে। একা অনন্তপুরের পথ চলিতে তার কোনও আপত্তি ছিল না। তথাপি সে যাইতে ইচ্ছা করিল না। তীর্থে যাইলে ব্রাহ্মণ যে আর ফিরিবে, এটা তার বিশ্বাস হইল না। তুলসী স্থির করিল, দিন কয়েক গুরুজীর সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিব। মনের কথা গোপন করিয়া সে বলিল -"সাহস হয় না।"

রতন বলিলেন "তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি, সঙ্গে এস।"

পার হইবা মাত্র, কতকগুলা সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী বন হইতে বাহির হইয়া রতনকে ধরিল। রতন বলিলেন—"তুলসী! এই স্থান হইতেই আমার তীর্থ যাওয়া শেষ হইল। তুমি নিজে পথ চিনিয়া চলিয়া যাও।"

তুলসী বলিল—"কি করিলাম প্রভু! আপনার অনিচ্ছায় ফিরাইয়া আপনাকে পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিলাম?"

"দুঃখ করিবার সময় নয় তুলসী! আঁধার বাড়াইয়া, আমার এতটা পরিশ্রম নিস্ফল করিও না। বিলম্ব করিলে হয়ত তোমারও আমার মত দশা হইবে।"

পুলিশ প্রহরীগুলার সঙ্গে তাহাদের দারোগা ছিল। সে তুলসীর মূর্ত্তিখানা দেখিল। ভাবিল, এমন সহজপ্রাপ্য রত্ন হাতছাড়া করি কেন? বলিল—"ও কোথায় যাইবে? ও আসামীকে আশ্রয় দিয়াছে। উহাকেও আদালতে হাজির হইতে হইবে।"

একটা প্রহরী তুলসীকে ধরিতে চলিল। তুলসী নারায়ণ স্মরণ করিল, ব্রাহ্মণও ভাবিলেন,—"তাইত, আমার চোখের সামনে দুরাত্মারা মায়ের উপর অত্যাচার করিবে।"—কিন্তু প্রহরিগণ ক্ষিপ্রহস্তে তাহার হাতে হাত কড়ি লাগাইয়াছিল। রতন বুঝিলেন, তিনি অকর্ম্মণ্য! শঙ্কটে ব্রাহ্মণও মধুসূদন স্মরণ করিলেন।

প্রহরিবর সমীপস্থ হইলে তুলসী বলিল—

"গায়ে হাত দিয়োনা। কি করিতে হইবে বল।"

"তোমাকে হুজুরের সঙ্গে যাইতে হইবে।"

"যাইতে প্রস্তুত আছি। তবে অমা॥ অমনি তোমার

হুজুরের সঙ্গে যাইলে, লোকে কত কি কুভাবিবে। মনে করিবে ব্রাহ্মণকে ধরাইয়া দিতে আমি তোমার মণিবের সহায়তা করিয়াছি। হয়ত মনে করিবে, তোমার হুজুরের সঙ্গে আমার কোনও দুষনীয় সম্বন্ধ আছে। ব্রাহ্মণের মত, আমারও হাত বাঁধিয়া লইয়া যাও। আমিও আসামীর সামিল হইয়া তোমাদের সঙ্গে যাই।”

কথাগুলা তুলসী নিতান্ত অনুচ্চস্বরে কহিল না, হুজুর তার সকল গুলিই শুনিতে পাইলেন। শুনিয়া, তাঁহার কিঞ্চিৎ রসিকতা করিতে ইচ্ছা হইল। বাক্যগুলায় কিছু হাস্যরস মিশ্রিত করিয়া বলিলেন—

“সুন্দরী! অলঙ্কার পরিবার কি বড়ই সাধ হইয়াছে?”

“হুজুরওত সুন্দরী লইয়া ঘর করেন। তার কিসে সাধ আপনার ত অবিদিত নাই?”

“গোলামের কাছে অলঙ্কার আছে, দিতে পারি। কিন্তু সেত ও মৃণালবাহুর যোগ্য নয়। সেটা লৌহনির্ম্মিত।”

“তাই আমি বহুমানে গ্রহণ করিব।”

“তাহ'লে গোলামকে অনুমতি হ'ক। সে নিজ হাতে পরাইয়া দিক্।”

“সেটা আমি ভাগ্য বলিয়াই বোধ করিব।”

হুজুর তুলসীর কাছে চলিলেন। আর ভাবিলেন—আজ কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছি। হাজার টাকা পুরস্কার; তার উপর একি! কাছে উপস্থিত হইতে না হইতেই, তুলসী হাত বাড়াইয়া দিল। মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া দারোগা পকেট হইতে হাতকড়ি বাহির করিল। বন্দী, প্রহরী সকলে নিশ্চল

হইয়া, এই বন্ধন কার্য্যটা দেখিতে লাগিল। রতন ভাবিলেন, তুলসী করে কি! প্রহরীগুলা ভাবিল—স্ত্রীলোকটার কিঞ্চিৎ বাতিকের ছিট আছে।

দারগার তরবারি কোষমুক্ত ছিল। সে তুলসীর সমীপস্থ প্রহরীটাকে তরোয়ারটা ধরিতে বলিল। তুলসী ঈষৎ হাসিয়া বলিল—কেন হুজুর! এই অবলাটা কি আপনার অস্ত্রখানা কাড়িয়া লইবে ভয় করেন। দারগার আর প্রহরীর হাতে অস্ত্র দেওয়া হইল না। একটু মৃদু হাসিয়া সে সেটাকে ভূমিতে রাখিল।

তুলসী সেই ভাবে হাত দুটী জোড় করিয়াই দাঁড়াইয়া আছে, দারোগা হাতকড়ি তুলিয়া একবার সুন্দরীর অনুমতি প্রার্থনা করিল—"তবে অনুমতি কর সুন্দরী!"

মৃদু কঠোর কটাক্ষে ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গে সেই সুন্দরী অনুমতি প্রদান করিল, অমনি দারোগা প্রভুর হস্ত হইতে ঝনাৎ করিয়া আয়স শৃঙ্খলটা পড়িয়া গেল। অপ্রতিভ হইয়া প্রভু শৃঙ্খল কুড়াইয়া মাথা তুলিয়া দেখেন,—একি মূর্ত্তি! সেই কুন্দকুসুমসম অনিন্দ্য মুখ, কিন্তু তাহাতে আর সে মৃদুহাসি নাই। সেই ভ্রূলতা-শোভিত ডাগর চোখ, কিন্তু তাহাতে আর সেই গ্রীবাভঙ্গাভিরাম বিলোল কটাক্ষ নাই। চক্ষের নিমেষে ভূপতিত তরবারি হস্তে তুলিয়া কুপিতা ফনিণীর ন্যায় তুলসী যেন ফনা তুলিয়া দাঁড়াইল।

সকলেই স্তম্ভিত, রতন বিস্ময়বিমুগ্ধ, দারোগা প্রভু কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ়।

তুলসী বলিল—"শয়তান! এখনও কি আমার হাত বাঁধিতে ইচ্ছা আছে?"

দারোগা নীরব।

তুলসী বলিতে লাগিল—"কার হুকুমে তুই এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বাঁধিলি ?"

দারোগা তথাপি কথা কহিল না। তুলসী মৃত্যুভয় দেখাইয়া বলিল—"এখনি ব্রাহ্মণকে মুক্ত কর্, নহিলে তোদের একটাকেও আমি প্রাণ লইয়া এস্থান ত্যাগ করিতে দিব না।"

যে কয়জন প্রহরী দারোগার সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা নিতান্ত শক্তিহীন, অথবা ভীরু ছিল না—কেন না রতনকে বন্দী করিতে পুলিশ কর্ত্তা যাকে তাকে ধরিয়া পাঠায় নাই। বাছিয়া বাছিয়া যোগ্য লোকই পাঠাইয়াছিল। প্রাণ লইবার কথা উঠিতে তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। নিকটে যে প্রহরী দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, "হুজুর! বসিয়া কি করিতেছেন ? হুকুম দিন, স্ত্রীলোকটার হাত হইতে তরোয়ারটা কাড়িয়া লই।"

দারোগার সাহস ফিরিল, বলিল—

"অস্ত্র পরিত্যাগ কর।"

"আগে ব্রাহ্মণকে মুক্ত কর্।"

"মুক্ত করিতে আমার অধিকার নাই। আমি মনিবের হুকুমে বৃদ্ধকে গ্রেপতার করিতে আসিয়াছি।"

"মনিব কে ?"

"তোকে বলিবার আমার প্রয়োজন নাই।"

"মর্য্যাদা বুঝিয়া কথা ক'। তোর মত দুশো গোলাম আমার বাড়ীতে গড়াগড়ি খাইতেছে।"

মন্ত্রে সর্প বশীভূত হয়। হৃদয়বলের কাছে পশুপ্রকৃতি চিরদিনই মস্তক অবনত করে। তুলসীর শেষ কথায় সকলেই

চমকিত হইয়া গেল। নিকটস্থ প্রহরী তাহাকে ধরিবার অবকাশ খুঁজিতেছিল। তাহার একটী ভ্রূভঙ্গে সে দুই হাত পিছাইয়া গেল। দারোগা বলিল—"কে আপনি ?"

"পরে বলিব। এখন বল কার হুকুমে, এই ঋষির হস্তে শৃঙ্খল পরাইয়াছিস্। আমার ত বিশ্বাস, এরূপ মহাপুরুষ অপরাধ করিতে পারে না।"

"অপরাধ জানিবার আমার অধিকার নাই। পুলিশ সাহেবের হুকুম পাইয়াছি, ধরিতে আসিয়াছি।"

"গোলামীতে এরই মধ্যে এত অভ্যস্ত যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিবার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়াছ! "দেখিতেছি হিন্দু—জাতি কি ?"

"ছত্রি।"

"আর বাঁধিয়াছ যাহাকে সে ব্রাহ্মণ। গোলামী না শিখিলে আজ তাঁহাকে দেখিবা মাত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে।"

তুলসী একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিল, প্রস্তর মূর্ত্তির মত নিজ নিজ স্থাননিবদ্ধ হইয়া, নিশ্চল চক্ষুতে সকলে তাহার পানে চাহিয়া আছে। তুলসী বলিতে লাগিল, শুধু পাঁচ ছয় বৎসরের ভিতরেই যখন তোমাদের এমন অবস্থা, তখন আর পাঁচ বৎসরে মনিবের হুকুমে তোমরা বাপকে জেলে দিতে ও কুণ্ঠিত হইবে না।" তখন একজন প্রহরী বলিয়া উঠিল—"হুজুর! আমি পণ্ডিতজীর হাত খুলিয়া দিই।"

দারোগা বলিল—"দাও।"

তুলসী তরবারি ফিরাইয়া দিল।—বলিল—"দারোগা সাহেব আপনার অস্ত্র গ্রহণ করুন।"

দারোগা অবনত মস্তকে তরবারি গ্রহণ করিল। একজন প্রহরী বলিয়া উঠিল—"যখন, কর্ত্তব্যকার্য্যের অবহেলার জন্য, মনিবের পদাঘাতে আমাদের দাঁত কটা ভাঙ্গিয়া যাইবে, তখন দেশের কে মা, বাপ আমাদের রক্ষা করিতে ছুটিয়া আসিবে?"

রতন বলিলেন—"না দারোগা সাহেব, তুমি কর্ত্তব্যে অবহেলা করিও না। রাজার আদেশে তুমি আমাকে বাঁধিতে আসিয়াছ। রাজাজ্ঞা পালনই তোমার ধর্ম্ম। রাজা পাপ করেন, তিনি তার ফলভোগী। তুলসী! তুমি ইহাকে কর্ত্তব্য হইতে নিরস্ত করিও না। রাজার চক্ষে অপরাধী হইয়াছি। এ ব্যক্তি না ধরে, আর একজন ধরিবে। তুমি কয়দিন আমাকে রক্ষা করিবে? দারোগা সাহেব, তোমাকে মুক্তি দিয়াছেন, তুমি চলিয়া যাও। আমি অনন্তপুরে আসিবনাই স্থির করিয়াছিলাম। তাই পথের মধ্যে এক চটিতে চিঠিখানি লিখিয়া রাখিয়াছি—রাজাকে দেখাইও।"

তুলসী আর কোন কথা কহিল না। চোখে জল আসিতে লাগিল, সে তাই মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। রতন দারোগাকে বলিলেন—"ভাই, সঙ্গে এস।"

অপরাধীর ন্যায় সকলে বন্দী ব্রাহ্মণের সঙ্গে চলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কোলাহল রাজারও কাণে পৌছিল। রাণীও শুনিলেন। রাজা জপে নিযুক্ত ছিলেন, তবে হাতের মালা হাতে আপনা

আপনি ঘুরিতেছিল, কিন্তু মন পড়িয়াছিল নারায়ণীর উপর। ব্রাহ্মণের স্থান ত্যাগের পর হইতে নারায়ণী দিন দিন মলিন হইয়া যাইতেছে। বেশি কথা কহে না, একা থাকিতে ভালবাসে। যে ছাদে উঠিলে ব্রাহ্মণের কুটীর দেখিতে পাওয়া যায়, থাকে থাকে সেই স্থানে চলিয়া যায়।

সে সময়ও নারায়ণী সেই ছাদটীতে বসিয়াছিল।

রাজা ভাবিতে ছিলেন, আমি মরিলে এ বালিকার কি হইবে। বাঁচিয়া থাকিতেই যখন তাহার ভিখারী কন্যার মত অবস্থা, তখন আমার অবর্ত্তমানে, নারায়ণীর পথে দাঁড়ান ভিন্ন আর কোনও অবস্থা ত দেখিতে পাই না। কিন্তু আমার এ দেবতার সম্পত্তি রাক্ষসে অধিকার করিবে! ইহার কি প্রতীকার নাই! আমি বাঁচিয়া থাকিতেই যখন ম্লেচ্ছে আমার অন্তঃপুরের পবিত্রতা নষ্ট করিতে সাহসী হইয়াছে, তখন আমি মরিলে, আমার ঘর যে পিশাচের নৃত্যশালা হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

রাজা পূজা ভুলিয়া, জপ ভুলিয়া নারায়ণীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় তন্ময় ছিলেন। এমন সময় কোলাহল তাঁহার কর্ণে পশিল। রাণী ছুটিয়া আসিয়া রাজাকে কহিলেন—

"মহারাজ, গোলমাল শুনিতে পাইয়াছেন কি?"

"এরূপ গোলমাল নিত্যই শুনিতে হইবে। শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক।"

"পণ্ডিতজীর ত কোন অনিষ্ট হইল না?"

"আশ্চর্য্য কি! তাঁহার ত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাহির হইয়াছে।"

"দেবতা এ পাপ সহিবেন কি?"

"কেমন করিয়া বলিব? এতকাল ত সহিয়া আসিতেছেন। দেবতা কি সহিতে পারেন, না পারেন জানি না।

"দেবতা যদি এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুমোদন করেন, তাহা হইলে এ পাপ পৃথিবীতে থাকিয়া লাভ।"

"দেবতার পূজায় বসিয়াও তাই চিন্তা করিতেছিলাম। রাণী, লাভ অলাভ খতাইয়া ব্যবসা করিতে শিখি নাই বলিয়া বৃদ্ধ বয়সে মূল হারাইতে বসিয়াছি। আদরের নাতিনীকে পথের ভিখারিণী করিতে চলিয়াছি।"

"ইহার কি প্রতীকার নাই?"

"আমিও তাই আপনাকে এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। ইহার কি প্রতীকার নাই? আর কয়দিন বাঁচিব? নারায়ণীরও পথে বসিতে বড় বিলম্ব নাই। ঘরে ম্লেচ্ছ ঢুকিয়াছিল। কেন বুঝিতে পারিয়াছ কি?"

রাণী শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"বংশ মর্য্যাদার যোগ্য পাত্র না পান, কোনও দরিদ্র সুপাত্রে নারায়ণীকে দান করুন না কেন?"

রাজা শুধু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। উত্তর না পাইয়া রাণী বলিতে লাগিলেন—"আমার কাছে যাহা আছে, সে সমস্ত নারায়ণীর বিবাহে যৌতুক দিলে তার সুখে স্বচ্ছন্দে চলিবে।"

এ কথায়ও রাজা কোন উত্তর করিলেন না। রাণী বুঝিলেন রাজা অন্যমনস্ক। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রাণীর চক্ষে জল আসিল। তাঁহার বোধ হইল, তিনি যেন স্বামীর সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারেন নাই। বুঝি, নারায়ণীর বিবাহ দিলেও, তার

দুরবস্থার প্রতীকার হইবে না। নারায়ণীর ভবিষ্যৎ বুঝি বড় অন্ধকার!

কোলাহল ক্ষীণ হইয়া আসিল, রাণী বুঝিলেন লোকজন সব কাছারী বাড়ীর দিকে চলিয়াছে। তিনি ছাদে চলিলেন। দেখিলেন, নারায়ণী মাথা তুলিয়া এক দৃষ্টে কি দেখিতেছে।

"কি দেখিতেছ নারায়ণী?"

"দাদার হাত বাঁধিয়া উহারা লইয়া চলিয়াছে।"

রাণীও আলিসার উপর মাথা তুলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তখন অন্ধকার,—দেখিতে পাইলেন না জিজ্ঞাসা করিলেন—

"দাদা কেমন করিয়া জানিলি?"

"সেই দীর্ঘদেহ, মাথায় শুভ্র উষ্ণীষ, কাঁধে মৃগচর্ম্ম ও লোকের উল্লাস—ও আর জানিতে হইবে না।"

রাণী যেন পিতা মাতার শোক অনুভব করিলেন। বলিলেন —"নারায়ণী! এতদিনে পিতৃহীনা হইলাম।"

রাণীর মুখে আর কথা সরিল না, গল্ গল্ করিয়া চক্ষু হইতে কেবল জল বাহির হইতে লাগিল। নারায়ণীর চক্ষে কিন্তু এক ফোঁটাও জল ছিল না। পিতামহীকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিল —"কাঁদ কেন মা?"

এই সময়ে রাজাও ছাদে আসিতেছিলেন। আসিতে আসিতে নারায়ণীর কথা তাঁহার কর্ণে গেল। তিনিও সেই কথায় যোগ দিয়া রাণীকে বলিলেন—"তাইত কাঁদিয়া লাভ কি? সকলেই মরণের জন্য প্রস্তুত হও। সে দিন আসিতে আর বড় বিলম্ব নাই।"

রাজাকে দেখিয়া রাণী রতনের সম্বন্ধে কোন কথা কহিতে, নারায়ণীকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন।

রাজা বলিতে লাগিলেন—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

মনে মনে লঙ্কা ভাগ করিলে, কালনেমির মত অবস্থা সকলেরই হয়। প্রতীকারের জন্য অনেকবার ব্রাহ্মণের কাছে পরামর্শ করিতে গিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ ফুলের সাজ দেখাইত, পত্র, পুষ্প, ফল, জল দেখাইত; আর যুক্তকর উর্দ্ধ করিয়া আকাশ দেখাইত। তাহার ফলে আজ তাহার নিষ্পাপ দেহ নরকতুল্য কারাগারে নিষ্পেষিত হইতে চলিয়াছে।

বলিতে বলিতে রাজা বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন। রাজার রোদনে নারায়ণীও আর স্থির থাকিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল।

রাণী মনে করিলেন, রাজা বুঝি নারায়ণীর কথা অন্তরাল হইতে শুনিয়াছেন। তাই বলিলেন—"ক্ষুদ্র বালিকা কি দেখিতে কি দেখিয়াছে। তার কথা শুনিয়া আপনি কাতর হইতেছেন কেন?"

নারায়ণী বলিল—"আমি ঠিক দেখিয়াছি।"

রাজা বলিলেন—"বৃদ্ধ দ্বারবান আসিয়া আমাকে এই সংবাদ দিল।"

রাণী। কোন্ নিষ্ঠুর তাঁহাকে ধরাইয়া দিল?

রাজা। শুনিলাম, একটা স্ত্রীলোক।

রাণী। স্ত্রীলোক! স্ত্রীলোকের ভিতরেও এমন হৃদয়হীনা থাকিতে পারে!

রাজা। অর্থ লোভে মানুষ না করিতে পারে কি? ব্রাহ্মণকে ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। শুনিলাম, সে পাপিষ্ঠা তাঁহাকে ভুলাইয়া অনন্তপুরে আনিয়া ধরাইয়া দিয়াছে।

নারায়ণীর কি জানি কেন, সেই পাপিষ্ঠাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল। সে সাগ্রহে রাণীকে বলিল—"মা যদি আদেশ কর, তাহা হইলে আমি সে পাপিষ্ঠাকে একবার দেখিয়া আসি।"

"সে পাপিষ্ঠা কালামুখ দেখাইতে আপনিই আসিয়াছে।"

সবিস্ময়ে সকলেই চাহিয়া দেখিল, এক সুন্দরী যুবতী তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

সুন্দরী তুলসী। সে বরাবর রাজার কাছে আসিয়া, তাঁহাকে ও রাণীকে প্রণাম করিল। বিস্ময়বিমুগ্ধের ন্যায়, তাঁহারাও তুলসীর পানে চাহিয়া রহিলেন।

ভাববিহ্বলার ন্যায় নারায়ণী ছুটিয়া তাহার হাত ধরিল। বলিল—"না না—তুমি কেন? তুমি যে আমার দাদাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছ!" নারায়ণীর দু'গণ্ড বহিয়া জল ছুটিয়াছে।

তুলসী বুঝিল এই আমার নারায়ণী। স্বতশ্চলিত হস্তে সে নারায়ণীর হাত ধরিল। কিন্তু নারায়ণীর কথাটা সে ভাল বুঝিতে পারিল না। ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাহাদের কি সম্বন্ধ, সে কিছুই জানে না। ব্রাহ্মণ কাশীপুর হইতে অনন্তপুর সমস্ত পথটা তুলসীর সহিত গল্প করিতে করিতে আসিয়াছেন।

কিন্তু রাজার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ কি, ঘুণাক্ষরেও তাহা প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং নারায়ণীর 'দাদা' কথায় সে রাজাকেই বুঝিল। হাত ধরিয়া বলিল—ভগিনী! তোমার দাদা রাজ্যেশ্বর। আমি তাঁহাকে রক্ষা করিব কি? তবে আমি তোমাদের সংসারে দাসীত্ব গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। তোমরা আমাকে দাসী বলিয়া গৃহে স্থান দাও—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক।

রাজা। তাহ'লে তুমিই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ধরাইয়া দিয়াছ?

তুলসী। কেমন করিয়া না বলি মহারাজ!

রাণী। এই রাণীর মূর্ত্তি লইয়া, এমন কার্য্য কেন করিলে মা!

তুলসী। আকাঙ্ক্ষা মা! অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা।

রাণী। এতই যদি অর্থাভাব হইয়াছিল, তখন একবার আমাদের কাছে আসিলেনা কেন? তুচ্ছ অর্থের জন্য ব্রহ্মহত্যা করিলে!

রাজা। এত আকাঙ্ক্ষা লইয়া, আমার ঘরে দাসীত্ব চলিবে না, তুমি অন্যত্র যাও।

নারায়ণী তুলসীর হাত ছাড়িয়া দিল। কিন্তু বুঝিতে পারিল না, এমন সুন্দর, যার অঙ্গ স্পর্শে এত সুখ, তাহাকে কেমন করিয়া ঘৃণা করিব। তুলসী বুঝিল, তাহার কথা কেবল সেই বুঝিয়াছে, কিন্তু ইহারা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। তখন সে বস্ত্রাঞ্চল হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া রাজার হস্তে দিল। পত্রখানি শৈলজানন্দ স্বহস্তে লিখিয়া রাজাকে দিতে দিয়াছিলেন।

রাজা পত্রপাঠ করিয়াই তুলসীর হাত ধরিলেন। বলিলেন—"মা! না বুঝিয়া রূঢ়বাক্যে তোমার মনে কষ্ট দিলাম। কন্যারূপে যখন আমার গৃহে আসিয়াছ, তখন এ বৃদ্ধ পিতার কথায় রাগ করিও না।

তুলসী রাজার পদধূলি গ্রহণ করিল। সবিস্ময়ে রাণী বলিলেন—"মেয়েটি কে মহারাজ?"

রাজা। পরিচয় দিবার আমার সময় নাই। মা আমার তিন দিন ক্রমাগত পথ চলিতেছেন। শুশ্রূষায় আগে মাকে রক্ষা কর। তবে এইমাত্র বলি, ব্রাহ্মণ আমার পূর্ব্বজন্মদত্ত ঋণ পরিশোধের উপায়ান্তর না দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল শূন্য করিয়া আমাকে এই বৈদূর্য্যমণিটী পাঠাইয়া দিয়াছেন।—এই নাও ভাগ্যবতী, তুমি এই মণিটী গ্রহণ কর।—রাজকন্যা স্বেচ্ছায় আজ তোমার দাসীত্ব করিতে আসিয়াছে।

রাজা রাণীর হাতে তুলসীকে অর্পণ করিলেন। এক হাত রাণী, অন্য হাত নারায়ণী ধরিয়া তুলসীকে ঘরে লইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনন্তপুর হইতে রতন রাঁচিতে নীত হইলেন। সেখানে আদালতে তাঁহার অপরাধের বিচার হইল। হাকিম গ্রীড্ সাহেব সকল কটা অপরাধেই তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। তিন বৎসরের জন্য তাঁহার কারাবাসের ব্যবস্থা হইল।

রাজা গোপনে তাঁহার উদ্ধারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাণী নিজের সঞ্চিত অর্থ হইতে উকীল নিয়োগের

ব্যবস্থা করেন ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কোম্পানীর উকীল বাঙ্গালী বীরেন্দ্রচন্দ্র বাঙ্গালী রতনের জাতিগত এত দোষ বাহির করিয়া ফেলিলেন, যে হাকিম গ্রীড্ অবাক হইয়া অন্যমনস্কে সত্তর পাতা রায় লিখিয়া তবে কলম রক্ষা করেন ; এবং সেই সঙ্গে দস্যু-সহায় বীরচন্দ্র সাহীকেও তিনি আসামী শ্রেণীভুক্ত হইবার ভয় দেখান।

হারলি ক্ষমা প্রার্থনার জন্য গোপনে কারাগারে যাইয়া রতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এবং ব্রাহ্মণকে উপরিতন রাজপুরুষের কাছে দরখাস্ত করিতে অনুরোধ করেন। রতন শুনিয়া, হাসিতে হাসিতে সাহেবকে বলেন—"নীরবে প্রহার খাইবার ফলে এই তিন বৎসর। দরখাস্তের ফলে আবার কি দশ বৎসর বাড়িয়া যাইবে। এখনও তীর্থে মরিবার আশা আছে। দরখাস্ত করিলে সে আশাও নির্ম্মূল হইবে। সাহেব, তোমার দয়া হইতে আমাকে অব্যাহতি দাও।"

হারলি বুঝিলেন, তাঁহার দোষে তাঁহার জাতির উপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। কারাগৃহ হইতে ফিরিবার সময়, তিনি মনের আবেগে উচ্চৈঃস্বরে ভগবানকে ডাকিয়া কহিলেন—"হে ঈশ্বর! এই যন্ত্রণাময় কারাগৃহে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষা কর।"

আনন্দ ও মুকুন্দ উভয়েই কোম্পানীর সাক্ষী ছিলেন। রতন হইতে উভয়েই অল্পাধিক দৈহিক অনিষ্ট ঘটিয়াছিল। আনন্দদেবের পৃষ্ঠের বেদনা আরোগ্য করিতে রাঁচির সিবিল সারজন তিন হাজার টাকার বিল করিয়াছিলেন। আর মুকুন্দের কব্জির ব্যথা, ডাক্তার সাহেবের মতে দুরারোগ্য

হইলেও, মোকর্দ্দমার পরে, সকলেই তাহাকে হাতের খাড়ু খুলিতে দেখিয়াছিল।

যে দিন রতনের উপর কারাবাসের আদেশ হইল, সেই দিনেই গভীর রাত্রে মুকুন্দপত্নী জানকী বাড়ীর ছাদের উপর একাকিনী বিচরণ করিতেছিল। সে দিন তার স্বামী ও শ্বশুর কেহই বাড়ীতে ছিল না। উভয়েই মোকদ্দমা উপলক্ষে রাঁচি গিয়াছিলেন। রাঁচিতে উৎসব করিবার জন্য বন্ধুবান্ধবেরা আনন্দদেবকে অনুরোধ করে। অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে সপুত্র সে দিন রাঁচিতেই থাকিতে হয়। সদাশিবের উপর সে রাত্রির জন্য গৃহরক্ষার ভার প্রদত্ত হয়।

সে দিন শুক্লাদশমী। ঘরের জানালা খুলিয়া জানকী দেখিল, জ্যোছনা বাতাসের সঙ্গে ঢেউ খেলিয়া তাহার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে! সে তরঙ্গের প্রভাব জানকীর প্রাণটুকুকে ঈষৎ ঈষৎ কাঁপাইয়া তুলিল। তাহার মনে হইল, যেন আকাশব্যাপিনী কৌমুদী মনের মতন সঙ্গিনী না পাইয়া, তরাগাঙ্গের উচ্ছ্বাস লভিয়াও মনের মত খেলিবার অবসর পাইতেছে না। দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়াই রূপ। দেখিবার লোক না থাকিলে রূপ থাকিয়া লাভ কি! জানকী ভাবিল, ছাদে উঠিয়া চাঁদকে একবার রূপটা দেখাইয়া আসি। একটু জ্যোছনা মাখিয়া চিন্তা-দগ্ধ হৃদয়টাকে শীতল করিয়া লই।

জানকী ছাদে উঠিল। তাহাকে দেখিয়া চাঁদ হাসিল, কিন্তু যুবতী সে হাসিতে সুখ পাইল না। জ্যোছনা তাহার গায়ে পূর্ণ আবেগে ঢলিয়া পড়িল, তাহার বস্ত্রে অঙ্গে মুখে চোখে মাখামাখি হইল। কিন্তু জ্যোছনায় জানকী শীতলতা অনুভব

করিল না। একটা কি যেন অভাবক্লিষ্ট হইয়া সে চারিদিক নিরীক্ষণ করিল।

জানকী যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারই নিম্নে উদ্যান। চারিদিকে চাহিতে চাহিতে সুন্দরী মাথা নামাইয়া বাগানের দিকে চাহিয়া দেখে যে, সেখানে মর্ম্মর বেদীর উপরে চাঁদের সমস্ত জ্যোছনাটা যেন জমাট বাঁধিয়া পড়িয়া আছে। দেখিয়া যুবতী শিহরিয়া উঠিল। তখন চারিদিক একবার চাহিয়া দেখিল, বোধ হইল যেন সব অন্ধকার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মর্ম্মর বেদীর উপর সদাশিব ঘুমাইতেছিল। অন্য দিবসে সে সতর্ক প্রহরী। প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে, বিনিদ্র হইয়া প্রভুর গৃহরক্ষা করিত। এই গুণের জন্য সদাশিব আনন্দদেবের প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। তাহার সচ্চরিত্রতার উপর কাহারও সন্দেহ ছিল না। এই জন্য প্রহরীর কার্য্যে সদাশিবই যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া, আনন্দদেব আজিকার রাত্রিতে গৃহরক্ষার ভার তাহারই উপর দিয়া গিয়াছে।

কিন্তু সদাশিবের মনের অবস্থা আজ ভাল নয়। তাহার গুরুদেব আজ কারাগারে—আজ হইতে তিন বৎসর তাঁহাকে কারাযন্ত্রনা ভোগ করিতে হইবে। অপরাধ? সদাশিব আকাশপানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, আর বলিল—"হে দেবতা এ তোমার

কিরূপ লোকশিক্ষা! ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরা, এরূপ কার্য্যফলের দৃষ্টান্ত দেখিয়া, এসংসারে কোন পথ অবলম্বন করি? ক্ষুদ্রবুদ্ধি, অনধীতশাস্ত্র, দোহাই দেবতা, আমরা কি করিব বলিয়া দাও।”

দেবতা অবশ্য এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না, সদাশিবেরও চিন্তার বিরাম রহিল না। বেদীর উপর বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে সদাশিবের তন্দ্রা আসিল। যুবক ঔদাস্যে আলস্যে সেই বেদীর উপর শুইয়া ঘুমাইল।

সৌন্দর্য্য পূর্ণতা লাভ করিতে বুঝি স্থান ও সময়ের অপেক্ষা করে! কত সুন্দর কতবার তোমার চোখের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিয়াছে, তুমি দেখিয়াও তাহাদের দেখিতে পাও নাই। সহজ প্রাপ্য, সহজ দৃষ্ট বস্তুর আদর কই? যাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইলেও সহজে দেখা যায় না; পাইবার প্রত্যাশা করিলেই পাওয়া যায় না, লোক-অগোচরে রূপ বুঝি তাহারই অঙ্গে জড়াইয়া রয়! অন্যের দুর্ব্বোধ্য হইলেও, সে বুঝি তোমার চক্ষে সবার চেয়ে সুন্দর!

জানকী সদাশিবকে বড়ই সুন্দর দেখিল। চাঁদ তার চোখের উপর পড়িয়া, হাসিয়া হাসিয়া বলিল—তুমি ঠিক দেখিয়াছ। কৌমুদীস্নাত উদ্যানের ছোট ছোট গাছগুলি, যেন হাসিয়া হাসিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া তাহাকে বুঝাইল—এতকাল জানকী রূপ চিনিতে পারে নাই। জানকী তখন বুঝিল, ঐশ্বর্য্যেই মানুষের সুখ হয় না। মুকুন্দও ত সুন্দর! কিন্তু তার সুন্দর মুখখানা সদাশিবের মুখের অন্তরালে পড়িয়া আজি জ্যোতিহীন। তারপর ছাদের উপরে অবস্থিত হইয়াও, সে যখন আপনাকে বুঝিল বন্দিনী, যখন বুঝিল ইচ্ছা করিলেই ও রূপ-নদীর ধারে বসিয়া

শীতল হইবার উপায় নাই, তখন তাহার বোধ হইল, যেন সে রূপ-নদীতে বান ডাকিয়াছে।

আরও একটু কাছ হইতে দেখিবার জন্য জানকী নীচে নামিল। সে জানিত অন্তঃপুরের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ—অর্গলবদ্ধ। তথাপি সে কেন নামিল সেই বলিতে পারে। বাড়ীর মধ্যে সকলেই নিদ্রিত, একা জানকী জাগিয়া! নীচে আসিতে তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। যদি কেহ জাগিয়া দেখে, তাহা হইলে কি মনে করিবে? কিন্তু ইচ্ছা করিয়াও সে গতির নিবৃত্তি করিতে পারিল না। অন্তঃপুরদ্বার সমীপে আসিয়া দেখিল, কে যেন আজ তার জন্য দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছে।

এমন সময়ে দ্বার কে খুলিয়াছে, কেন খুলিয়াছে, জানিবার তাহার অবসর হইল না। জানকী তড়িচ্চালিতা পুত্তলিকার ন্যায়, নিজের অবস্থা ভুলিয়া, মর্য্যাদা ভুলিয়া, কর্ত্তব্য পাশরিয়া, সেই গভীর রজনীতে অভিসারিকার বেশে গৃহত্যাগ করিল।

যখন বোধ ফিরিল, তখন সে ঘর ছাড়িয়া অনেক দূরে। তখনও সদাশিব নিদ্রিত! জানকী দেখিল দীর্ঘ যষ্টিধারী খর্ব্বাকৃতি এক কৃষ্ণকায় পুরুষ কোথা হইতে আসিয়া নিদ্রিত যুবকের পার্শ্বে বসিল।

তখন আর পলাইবার উপায় নাই। পলাইতে গেলেই সে তাহার চক্ষে পড়িবে। তাড়াতাড়ি জানকী পার্শ্বস্থ লতা-কুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন লজ্জাভয় চারিদিক হইতে বালিকাকে ঘেরিয়া ধরিয়াছে; জানকী আপনাকে শতধিক্কার দিয়া বলিল—"কি করিলাম!"

কৃষ্ণকায় পুরুষ মুন্না, সদাশিবের পায়ে হাত দিয়া ঘুম ভাঙ্গাইল। চকিতের ন্যায় সদাশিব উঠিয়া বসিল। দেখিল পার্শ্বে কে বসিয়া আছে। ঘুমের ঘোরটা তখনও ছাড়ে নাই বলিয়া, প্রথমটা সদাশিব মুন্নাকে চিনিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুমি?"

"যেই হই, কিন্তু আপনার প্রহরিকার্য্যের প্রশংসা করিতে পারিলাম না।" সদাশিব এইবারে মুন্নাকে চিনিল। বলিল—"ওঃ! কতকাল পরে!"

মুন্না। তবু গোলামের সৌভাগ্য। এতকাল পরেও চিনিতে পারিয়াছেন।

সদা। মৃতের নিরর্থক চক্ষু লইয়াও বোধ হয় তোমাকে চিনিতে পারিতাম। তারপর?

মুন্না। তারপর, আপনারই কাছে। শুনিয়াছিলাম আপনি চাকর হইবারও যোগ্য নয়, এমন একটা লোকের ঘরে প্রহরীর কার্য্য করিতেছেন। তাই আপনাকে একবার দেখিতে আসিলাম। আসিয়া, আপনার প্রহরীর কার্য্য দেখিয়া, হাসি রাখিতে পারিলাম না। আপনারই সম্মুখ দিয়া বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলাম, খিড়কীর দোর খুলিয়া রাখিলাম, উপরে উঠিলাম, কিন্তু বাপ বেটার কাহাকেও দেখিলাম না। তাদের বড় পুণ্যের জোর তারা আজ বাড়ীতে নাই। নহিলে, আপনার প্রভুভক্তির পুরস্কার স্বরূপ, কোন কালে সেই দুটী মুণ্ড আপনার পদপ্রান্তে রক্ষিত হইত।

সদা। মুন্না! ঈশ্বর তাহাদের রক্ষা করিয়াছেন।

মুন্না। তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি এই অল্প সময়ের

মধ্যে, বাড়ীর এমন স্থান নাই যে, সে দুটার সন্ধান করি নাই। সর্ব্বত্রই কেবল স্ত্রীলোক দেখিলাম। ছাদে উঠিয়া দেখি, সেথানেও একটা স্ত্রীলোক। দেখিলাম, সে নীচে আপনার পানে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, বুঝিলাম আপনার রূপ দেখিতেছে। মনে করিলাম, তাহাকে সেইস্থান হইতেই আপনার কাছে পাঠাইয়া দিই ; কিন্তু এ বয়সে স্ত্রীহত্যা করিতে আর মন সরিল না।

লতান্তরালে জানকী শিহরিয়া উঠিল। দারুণ ভয়ে অপগত-শক্তি অবলা ভূমিতে বসিয়া পড়িল।

সদা। আমি জাগিয়া থাকিলে তোমাকে বাধা দিতাম। এ দস্যুর কার্য্য তোমাকে করিতে দিতাম না।

মুন্না। আপনাদিগের যা কার্য্য তাতো দেখিলাম। তার চেয়ে, আমাদের কার্য্যে অনেকটা মনুষ্যত্ব আছে। ছাগ আহারে রুচি হইলে, আমরাও লোক দেখান. দেবতাকে নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করি। বলি কি অপরাধে আজ আপনার গুরুর জেল হইয়াছে ?

সদাশিব দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। মুন্নাও অবকাশ পাইয়া আবার বলিল—"কি বলিব, বিধাতা সদয়, নহিলে আজই আমি ব্রাহ্মণের শাস্তির প্রতিফল দিয়া যাইতাম।

সদা। মুন্না ভাই! ইহাদের কথা ছাড়িয়া দাও। আমি ইহাদের নিমক খাইয়াছি।

মুন্না। আজ যখন অকৃতকার্য্য, তখনই ইহাদের কথা ছাড়িয়াছি। যাহাদের ইচ্ছা করিলে, নখে টিপিয়া মারিতে পারি, তাহাদের চিন্তা লইয়া আমি এতদূর আসি নাই। ওটা

শুধু মাঝখানে বুদ্‌বুদ্‌ স্বরূপ জাগিয়াছিল মাত্র। আসিয়াছি আপনাকে লইয়া যাইতে।

সদা। কোথায়?

মুন্না। সে কথা এখানে বলিতে পারিব না। আপনি রাজা, সেপাই হইয়া রাত্রিতে পাহারা দেওয়া কি আপনার কাজ? আজিকার ঘটনাতেই তা বুঝিলেন ত!

সদাশিব ক্ষণেক নীরব রহিল। তারপর বলিল—"সময় কি আসিয়াছে?"

"নহিলে এই বার বৎসর পরে আপনার কাছে আসিলাম কেন?"

কানে কানে মুন্না সদাশিবকে কি বলিল। যেন গাছপালা গুলাকেও সে কথা শুনাইতে সে সাহসী হইল না।

সদাশিব বলিল—"শীঘ্র খিড়কীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া আইস।"

এইবারেই জানকী ফাঁফরে পড়িল। মুন্না সদাশিবের আদেশমত প্রস্থান করিলে, বুঝিল, দ্বার বন্ধ করিয়া মুন্না ফিরিলেই, রাত্রির মত সে আর গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রভাতে এ কথা লোকের কর্ণগোচর হইলে, তাহার আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। বিপদে পড়িয়া জানকীর সাহস আসিল। উভয়ের মধ্যে যে যে কথা হইয়াছিল, সে বসিয়া বসিয়া সমস্তই শুনিয়াছিল। বুঝিয়াছিল, এই প্রহরী-বেশী সুন্দর যুবক কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়। কি প্রয়োজন সাধনের জন্য সে তাহার শ্বশুরের গৃহে সামান্য ভৃত্যের কার্য্য করিতেছে। তাহার কথা শুনিয়া জানকীর বিশ্বাস হইয়াছিল, এ যুবা হইতে তাহার কোনও অনিষ্ট হইবে না।—যে মনের ভাব লইয়া

জানকী সে বাগানে আসিয়াছিল, এখন আর সে ভাব নাই। ঘটনাবৈচিত্র্যে তাহার মনের অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে। সৌন্দর্য্য দেখিবার অদম্য লালসা, এখন মানরক্ষা ভয়ে পরিণত। অবগুণ্ঠনবতী হইয়া জানকী কম্পিত হৃদয়ে, কম্পিত পদে, ধীরে ধীরে সদাশিবের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সদাশিব তাহাকে দেখিয়াই সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কে আপনি?"

অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতেই জানকী বলিল—"অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমাকে বাড়ীর ভিতরে রাখিয়া আসুন।"

কে আপনি, কেন আসিয়াছেন, এ সকল প্রশ্নের একটীও সদাশিব জিজ্ঞাসা করিল না। রমণীর উত্তরেই বুঝিল, মুন্না দ্বাররুদ্ধ করিয়া ইহাকে বিপন্ন করিয়াছে। কেবল বলিল—"ক্ষণেক অপেক্ষা করুন, ভৃত্যটা ফিরিয়া আসুক।"

সময় বুঝিয়া মুন্নাটা আসিতে বড়ই বিলম্ব করিতে লাগিল।

উপরে সঞ্চরমাণ খণ্ডমেঘগুলির মধ্যে, ধীরগতিশীল চন্দ্রমা, নিম্নে মৃদু বায়ুতে আন্দোলিত ফুলভারাবনত পুষ্পলতা, তরু অন্তরালে শ্রোতার হৃদয়ের সঙ্গে সুর মিলাইয়া প্রচ্ছন্নাবস্থিতা ঝিল্লী, চারিদিক বেড়িয়া কৌমুদীবসনা উল্লাসময়ী প্রকৃতি—মধ্যে চন্দ্র কিরণে প্রতিফলিত মর্ম্মর বেদীর একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটী সুন্দর যুবক, আর একটী যুবতী। বসনাবরণে তার কত রূপই না লুকান আছে! উভয়েই নীরব, উভয়েই বিপদগ্রস্ত।

জানকী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মর্ম্মরবেদীর উপর বসিল, সদাশিব কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া পাদচারণ আরম্ভ করিল।

তবুও মুন্না ফিরিল না।—সদাশিব আর থাকিতে পারিল না, বলিল—"হতভাগাটা করে কি!"

জানকীও কথা কহিবার অবকাশ পাইল, বলিল—"লোকে দেখিলে কি মনে করিবে?"

সদা। আমিও তাই ভাবিতেছি। তবে আমি ভৃত্য।

জানকী। কিন্তু আপনি ত ভৃত্য ন'ন, আপনি কোন রাজপুত্র। কি জানি কেন, ভৃত্যের বেশ ধরিয়া আছেন।

সদাশিব বুঝিল রমণী তাহাদের কথা শুনিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কোথায় ছিলেন?"

জানকী। ওই কুঞ্জমধ্যে।

কথাগুলিতে যেন বীণায় ঝঙ্কার উঠিতেছিল। কুঞ্জমধ্যে! —সদাশিব ত তাহারই অতি নিকটে বেদীর উপর নিদ্রিত ছিল! এই পঞ্চম সংবাদিনী বাণীর ঈশ্বরী, সুষুপ্ত সদাশিবের পার্শ্বে বুঝি একবার দাঁড়াইয়াছিল! একবার বুঝি তার নিশ্বাস অতি কোমল স্পর্শে সদাশিবের হৃদয়ে অতিধীর কম্পন তুলিয়া, বড় সুখের ঘুমে তাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল!

পরিক্রমণ করিতে করিতে সদাশিব একবার দাঁড়াইল; এতক্ষণ মাথা হেঁট করিয়াছিল, এখন একবার মাথাটা তুলিল।

সসম্ভ্রমে জানকী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল "আপনি ক্লান্ত, ক্ষণেক বেদীতে উপবেশন করুন।" অবগুণ্ঠনটা একটু সরিয়া গেল। মুগ্ধ যুবক শিহরিয়া উঠিল। সুন্দর ছোট মুখখানিতে দুইটী উজ্জ্বল ডাগর চক্ষু! এত সুন্দর যেন কনককমল মাঝে কাল ভুজঙ্গিনী শ্রীযুত খঞ্জনের সঙ্গে খেলা করিতেছে!

সদাশিব আবার মাথা হেঁট করিল, বলিল—"আপনি

বসিয়া থাকুন, আমি বেশ আছি।” যুবক কিন্তু বেশ ছিল না, তাহার বুক কাঁপিতে ছিল, তাহার বসিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

জানকী দাড়াইয়া রহিল। অগত্যা সদাশিব বেদীর এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া, জানকীকে অন্য প্রান্তে বসিতে অনুরোধ করিল।

সুন্দরী বসিয়া, একটু মৃদু হাসিয়া বলিতে লাগিল—“আপনাদের সমস্ত কথা আমি অনিচ্ছায় শুনিয়াছি। তবে ভৃত্যটা কাণে কাণে যা বলিল. সেইটাই কেবল শুনিতে পাই নাই।”

সদাশিব ওকথা তুলিতে নিষেধ করিল। বলিল, “সে বুঝি ফিরিতেছে। আপনি শুনিয়াছেন শুনিলে, বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। ও কঠোর মূর্খের কাছে সৌন্দর্য্যের আদর নাই।”

জানকী বলিল - “মৃত্যুকেও আর ভয় করি না।”

মুন্না ফিরিল, দেখিল প্রভুর পার্শ্বে সুন্দরী।

“তুমিই না ছাদের উপর দাঁড়াইয়াছিলে?”

“ছিলাম।”

“কেন, প্রভুকে দেখিতে?”

সদাশিব বলিল -“যদি দুয়ার বন্ধ করিয়া থাক, তাহা হইলে আবার খুলিয়া, ইহাকে বাটীর ভিতরে রাখিয়া আইস।”

মুন্না। মিছামিছি আমি বারবার প্রাচীর ডিঙ্গাইতে পারি না।

জানকী। ছাদের উপর হইতে ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, সে ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থাকে কেন? এইখানেই আমাকে মারিয়া রাখিয়া যাও।

মুন্না। কতবার মরিবে?

সদা। একি মুন্না! মর্য্যাদা রাখিয়া কথা কও। উনি আমার প্রভুপুত্রের সহধর্ম্মিনী।

জানকী চমকিয়া উঠিল—"আমি কি তবে পূর্ব্বেই ইহার চোখে পড়িয়াছি!" সুন্দরী লজ্জায় আবার অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিল। মুন্না বিরক্তির সহিত বলিল—"তবে এস আমার সঙ্গে।"

একটা ঘনবিকম্পিত দীর্ঘশ্বাস সদাশিবের কাণের কাছে আসিয়া মিলাইয়া গেল। মোহজাল টুটিল, কুলকামিনী আবার আপনাকে দেখিতে পাইল। মানসিক যন্ত্রণায় তাহার মর্ম্ম কাঁদিয়া উঠিল।

উভয়ে অদৃশ্য হইলে সদাশিব, কাঁপিতে কাঁপিতে একবার ভগবানকে ডাকিল—"নারায়ণ! আমাকে রক্ষা কর।" মনটাকে সবলে নিষ্কর্ষণ করিয়া সেই বার বৎসর পূর্ব্বের তুলসীর দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিল। দেখিল, ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কুমারীর ব্রীড়াভয়-নিমীলিত-চক্ষু—অর্থহীন, প্রেমহীন, দৃষ্টিহীন। প্রাণের যাতনায় সদাশিব আর একবার ভগবানকে ডাকিল।

"ভয় কি!"—পশ্চাৎ হইতে কে যেন তাহাকে সান্ত্বনা দিল।

সদাশিব চকিতের ন্যায় পশ্চাতে ফিরিয়া, চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া সংজ্ঞা হারাইল।

মুন্না ফিরিয়া, তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিল,—"আজ প্রভুর এত ঘুম কোথা হইতে আসিল?"

সদাশিবের সংজ্ঞা ফিরিয়াছে। যুবক উঠিয়া, চোখ মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল—"মুন্না! তুলসীর খবর কি?"

মুন্না। দিদির সংবাদ আপনি বলিতে পারেন। সে ত এতক্ষণ আপনার নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল।

"সেকি!"—বলিয়াই সদাশিব আশ্বাসবাণী-মূর্ত্তির অন্বেষণে জ্ঞানশূন্যের ন্যায় ছুটিল।

মুন্নাও ছুটিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে কোমল করস্পর্শে সে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল তুলসী।—"এটা কি রকম হইল দিদি!"

"মুন্না! আমাকে বাড়ী রাখিয়া আয়।"

"হুজুর যে তোমাকে খুঁজিতে চলিয়া গেল!"

"তা হোক তুই আমাকে বাড়ী রাখিয়া আয়। শুধু রাণীকে বলিয়া আসিয়াছি। রাজা জানিলে লজ্জায় পড়িব।"

"দেরী হইলে যে আমার কার্য্যের ক্ষতি হইবে।"

"তা হোক—দোর খোলা। আমাকে এখনি বাড়ী রাখিয়া আয়।"

তুলসী আর কোন কথা না বলিয়া, মুন্নার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিল। প্রতিবাদ করা নিষ্ফল বুঝিয়া, মুন্না প্রভুকন্যার সঙ্গে চলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দিবস অপরাহ্নে মুন্না আসিয়া রাজাকে ব্রাহ্মণের অবস্থার কথা জানাইয়াছিল। রাণী নারায়ণী ও তুলসী একে একে সকলেই সে কথা শুনিল। রাণী অর্দ্ধমৃতের ন্যায়

আপনার ঘরে পড়িয়া রহিলেন। নারায়ণী পিতামহীর কাছে বসিয়া রহিল।

তুলসী ভাবিল, আমি কেন তবে জীবনের শ্রেষ্ঠসাধ স্বামী সুখ হইতে বঞ্চিত হই। যে জন্য স্বামীর সহিত দেখা করিবে না বলিয়া সে গুরুর কাছে প্রতিশ্রুত ছিল, তাহা ত নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে! রাজার অবস্থার আর রহিল কি!

তুলসী সেইদিনেই সদাশিবকে দেখিবার সঙ্কল্প করিল! ভাবিল, মুন্না যখন আসিয়াছে, তখন এ শুভ অবকাশ পরিত্যাগ করিব না।

কিন্তু মুন্না রাজার কাছে বসিয়া চুপিচুপি কি কথা কহিতেছিল। সেরূপ অবস্থায় নিকটে যাওয়া উচিত হয় না, তুলসী অপেক্ষায় দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু কথা আর ফুরায় না। উভয়েই যেন বাহ্যজ্ঞান শূন্য। তুলসী সম্মুখ দিয়া কতবার যাতায়াত করিল, উভয়ে দেখিয়াও দেখিল না। যখন তাহাদের কথা শেষ হইল, তখন রাত্রি হইয়াছে।

মুন্না সেখানে সর্ব্বপ্রথম আসিয়াছে। তুলসী ভাবিল, ব্রাহ্মণের অবস্থার সঙ্গে রাজা তাহার পিতার সংবাদ গ্রহণ করিতেছেন। তাই শেষ করিতে মুন্নার এত বিলম্ব। কথা শেষে মুন্না প্রভুকন্যার নিকটে আসিল। রাজা তুলসীকে তাহার পরিচর্য্যার ভারগ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন! বলিলেন, "লোকটা সারাদিন উপবাসী, তাহার আহারের একটা ব্যবস্থা কর।" আহারের ব্যবস্থা করিতে তুলসী মুন্নাকে মনের কথা খুলিয়া বলিল। মুন্না তাহাকে সদাশিবের কাছে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল।

দেবতাদর্শনের ছল করিয়া তুলসী রাণীর নিকট অনুমতি

গ্রহণ করিল ; এবং সেইরাত্রে স্বামীকে দেখিতে মুন্নার সঙ্গে গৃহত্যাগ করিল।

বার বৎসরের পর স্বামীদর্শন ! সেই পূর্ব্বযুগের স্বামীরমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারিণী তুলসী বার বৎসর তার পূজা করিয়াছে। সিদ্ধিলাভ ঘটিবে কি ? গৃহের বাহিরে পা দিতেই তুলসীর মাথার কাছে টিকটিকি পড়িল। তুলসীর হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল। হৃদয়মধ্যস্থ মূর্ত্তিটা যেন ভাঙ্গিয়া গেল। অন্তশ্চক্ষু দিয়া তুলসী আর একবার মূর্ত্তির পানে চাহিল ; দেখিল মূর্ত্তি ম্লান।

তথাপি তুলসী ফিরিতে পারিল না। মনে মনে ভাবিল— কি জানি কি দেখিব। আমার এখন যা অবস্থা রমণীর ইহা অপেক্ষা ছুরবস্থা আর কি আছে !

প্রথমে তুলসী মনে করিয়াছিল, স্বামীর সহিত দেখা হইলে, কত কথাই বলিবে। কিন্তু যতই সে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই দেখিল, যেন কথাগুলা মন হইতে একটী একটি করিয়া সরিয়া যাইতেছে।

মুন্না তাহাকে নানা স্থান ঘুরাইয়া, সেই বাগানে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেখানে একটা তরুকুঞ্জের আবরণের মধ্যে দাঁড় করাইয়া বলিল—"এইস্থানে অপেক্ষা কর, আমি সন্ধান করিয়া আসি।" মুন্না প্রস্থান করিলে, তুলসী অনেকক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে তাহার বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল ; মনে করিল, এমন সুন্দর বাগানটায় একটু বেড়াইতে ক্ষতি কি ? কিছুদূর যাইতেই তুলসী দেখিল, বেদীর উপর প্রহরিবেশী কে একজন ঘুমাইতেছে।

ক্ষিপ্রগতিতে তুলসী আবার কুঞ্জের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

মুন্না ফিরিয়া বলিল—"সন্ধান পাইলাম না।"

তুলসী বলিল—"দেখ দেখি বেদীতে কে ঘুমাইতেছে?"

মুন্না দেখিয়া ফিরিল—

"ঠিক দেখিয়াছ। তোমার স্বামীই ঘুমাইতেছে।"

"তুমি তামাসা করিতেছ।"

"এই কি তামাসা করিবার সময়!"

"এত পরিবর্ত্তন!"

"তার আর আশ্চর্য্য কি! সেই বার বৎসর আগের চেহারা এখন কোথা পাইবে!"

"হৃদয়ের মূর্ত্তি যে ভাঙ্গিয়া গেল।"

"তাহাকে আর আস্ত রাখিবার প্রয়োজন?"

"মুন্না বার বৎসর ধরিয়া, কল্পনার রাজ্য হইতে কত সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার আনিয়া আমার হৃদয়ের সেই কিশোর মূর্ত্তিটীকে সাজাইয়াছি। এখন দেখি ভস্মে ঘী ঢালিয়াছি। মনের মত সাজাইয়াও তাহাকে ত এত সুন্দর করিতে পারি নাই!"

মুন্না মনে করিয়াছিল, সদাশিবের বর্ত্তমান রূপ বুঝি তুলসীর ভাল লাগে নাই! সেইটীই তার প্রার্থনীয় ছিল। আর সে জানিত, তাহার পিতা শৈলজানন্দ, সেই উদ্দেশ্যেই একমাত্র নন্দিনীকে স্বামী-বিয়োগিনী রাখিয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ব্রহ্মচারিণীর চক্ষে আর রূপের আদর থাকিবে না। কিন্তু এখন দেখিল প্রভুও ভস্মে ঘী ঢালিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিতে চাও?"

"আমার স্বামীকে আমি পাইতে চাই। পাইলে সঙ্গে

রাখিব, তোদের দেশে আর পাঠাইব না। আমার সে বালক-টাকে তোরা এখানে পাঠাইয়া দিস্।”

তুলসী নিদ্রিত স্বামীকে দূর হইতে দেখিতে দেখিতে, সুখের সংসারের একটা মনোরম চিত্র অাঁকিতে বসিল।

মুন্না মনে করিল, ইহাদের মিলন তাহার পক্ষে বড় সুবিধা-জনক নয়। যেমন করিয়া হউক, ইহার হাত হইতে সদাশিবকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। মিলনের আগে সদা-শিবকে প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে সে তুলসীকে ক্ষণেক অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিল। বলিল—“আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত স্বামীর সহিত দেখা করিও না।”

মুন্না সদাশিবের নিদ্রার অবকাশে, আনন্দদেবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তারপর যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে।

দরিদ্রার মনোরথ হৃদয়ে একবার মাত্র উত্থিত হইয়াই মিলাইয়া গেল তুলসী জানকীকে দেখিল, স্বামীকে দেখিল। দুইজনে বেদীর উপরে বসিয়া যখন কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল, তখন কান পাতিয়া তাহাদের কথাগুলা শুনিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু হৃদয়ের অবিরাম উত্থান পতনে, তাহার প্রাণের ভিতর একটা বিষম কোলাহল উত্থিত হইল, তুলসী শুনিতে পাইল না।

তুলসী তখন মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিল। এতকাল পরে কেন মরিতে আমার স্বামী দেখিতে সাধ হইল। অদৃষ্টে যদি স্বামী সৌভাগ্যই থাকিবে, তবে এতকাল কি অপরাধে বিধবার দশা ভোগ করিতেছি!” রমণীকে তাহার স্বামী পার্শ্ব-গতা দেখিয়াও তুলসীর মনে ঈর্ষা আসিল না! কেন আসিল

না, যে পুরুষ কিম্বা যে রমণী দ্বাদশ বৎসরের ব্রহ্মচর্য্যে অভ্যস্ত, তিনি ভিন্ন আর কে এ প্রশ্নের উত্তর দানে সমর্থ? সে কেবল বুঝিল, আমি উপেক্ষিতা।

তুলসী গৃহে ফিরিবার অবসর খুঁজিতেছিল; এমন সময়ে দেখিল, মুন্না আসিয়া রমণীকে সঙ্গে লইয়া চলিল। সুন্দরী মনে করিল, মুন্না বুঝি তাহার সেখানে অবস্থিতির কথা সদাশিবকে বলিয়াছে! কিন্তু সদাশিব ত লজ্জার কোনও নিদর্শন দেখাইল না!

"এ তবে কি দেখিলাম!" ক্রমে যেন সমস্ত ঘটনাটা তুলসীর স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। আবার নির্জ্জনতা! সদাশিব এবার বিনিদ্র। চন্দ্রালোকিত বেদীর উপরে, হাতের উপর ঈষৎ ভর দিয়া, সুন্দর দেহ একটু হেলাইয়া, চাঁদের উপর নিবিষ্টচক্ষু সদাশিব নিজের রূপেই যেন সমস্ত বাগানটা আলো করিয়া বসিয়া আছে!

তুলসী ভাবিল, "এমন রত্ন—আমার বিধিদত্ত ধন, হাতে পাইয়া ছাড়িতে যাইব কেন?"

সুন্দরী কুঞ্জান্তরাল পরিত্যাগ করিল, দারোগার সম্মুখে অস্ত্রধারিণী রক্তবিস্ফূরিতেক্ষণা ভবানী, নবোঢ়ার কম্পিত হৃদয় লইয়া, কম্পিত পদে ধীরে ধীরে স্বামীর দিকে অগ্রসর হইল। নিকটে উপস্থিত হইতেই স্বামীর দীর্ঘশ্বাস, আর সেই সঙ্গে আক্ষেপ কথাটাও তাহার কাণে পৌঁছিল।

তুলসীর এবারে ক্রোধ হইল। তাহার নিকট হইতে বার বৎসর বিচ্ছিন্ন—মুহূর্ত্তের জন্য স্বামীর মনে তাহার চিন্তাটা স্থান পাইল না, আর এই অজ্ঞাতকুলশীলা রমণী ক্ষণেকের

অনুপস্থিতিতে অকৃতজ্ঞ স্বামীর হৃদয়ের সমস্ত আবেগটা আকৃষ্ট করিয়া লইয়া গেল!

উপহাসের ছলে তুলসী স্বামীকে শুনাইবার জন্য মনে এক-রাশ কথার সঞ্চার করিল; কিন্তু অভয় বাণীটা ছাড়া সমস্ত কথাই তার কণ্ঠদেশে সংলগ্ন হইয়া রহিল—বাহির হইল না।

সদাশিব কথা শুনিয়া যখন ফিরিয়া দেখিল, তখন তুলসী ক্ষোদিত মর্ম্মর মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল। সদাশিব যখন মূর্চ্ছিত হইল, তখন তুলসী বুঝিল স্বামী বহু দোষের আকর হইয়াছে। স্বামী সম্ভাষণের যৎসামান্য আশাও যা সে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল, তাহাকে জলাঞ্জলি দিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল!

কার্য্যের সঙ্গে কারণের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক পুরুষানুক্রমে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে; কিন্তু প্রকৃতি তাহার চক্ষে ধূলি দিয়া, কখন, কোন স্থানে, কি ভাবে এক একটা কার্য্য করে, যে শতচেষ্টায়ও মানুষ তাহার সূত্রানুসন্ধানে সমর্থ হয় না।

এই একটি সামান্য আকস্মিক ঘটনায় এক অশীতিপর বৃদ্ধের আজন্ম চেষ্টিত কার্য্য একদণ্ডে নিষ্ফল হইয়া গেল। কেমন করিয়া, পরে বলিতেছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তুলসী প্রতি প্রভাতে খিড়কীর সেই উদ্যানটীতে পুষ্পচয়ন করিত। সে দিন সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বেই সে বাগানে উপ-

স্থিত হইল। উপস্থিত হইয়াই দেখিল, রাজা সেখানে একটী অর্দ্ধভগ্ন পুষ্পবাটিকাকে বেষ্টন করিয়া পাদচারণ করিতেছেন।

দেখিয়া, সুন্দরী হাতের সাজী ও আকর্ষী ভূমিতে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রাজা আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি তুলসী! দেব দর্শন হইল?"

তুলসী বুঝিল, রাজা সমস্তই জানিয়াছেন। তখন আর লজ্জার প্রয়োজন কি! সস্মিত মুখে যুবতী উত্তর করিল—

"হইয়াও হইল না।"

"কেন?

"দেবতার মাথা কালাপাহাড়ে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।"

"আমার এ অনন্তপুরে এমন কালাপাহাড় কোথা হইতে আসিল?"

"সেটা মহারাজ যেরূপ জানিবেন, আমার সেরূপ জানিবার সম্ভাবনা কই!"

এই বলিয়া তুলসী ঘটনাটা যথাসম্ভব বিবৃত করিল।

"তাই যদি হয়, তাহাতে তোমার আক্ষেপ করিবার কি আছে! তুমি যে মা এক দীর্ঘযুগ ত্যাগ শিক্ষা করিয়া, সকল অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছ।"

তুলসী এবারে আর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিল না। বিশাল চক্ষু দু'টী অঞ্চলাচ্ছাদিত করিয়া বলিতে লাগিল—"মহারাজ! কৃপণের ধন,—আছে এই আশ্বাসে জীবিত ছিলাম। অপহৃত জানিলে কতক্ষণ বাঁচিব!"

রাজা আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"ভয় নাই; তোমার কঠোর তপস্যা যাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, সে সামগ্রী সহজে

ডাকিনীর গ্রাসে যাইবার নয়। তুমি নিশ্চিন্ত থাক; সে সামগ্রী এখনও তোমারই আছে!”

বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে তুলসী রাজার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। রাজা বলিতে লাগিলেন; “কিন্তু মা! ক্ষত্রিয়নন্দিনী তুমি, ক্ষত্রিয়-সহধর্ম্মিণী—পাটরাণী। অন্য কোন ভাগ্যবতীকে তোমার স্বামী-সৌভাগ্যের যৎকিঞ্চিৎ অংশ দিতে কৃপণতা করা তোমার ত উচিত নয়। স্বামীর উপর এ অযথা অভিমান তোমার শোভা পায় না।”

তুলসী রাজার পদপ্রান্তে লুটাইল; এবং বলিল—“মহারাজ! বড়ই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, কি করিব আদেশ করুন।”

রাজা। স্বামীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য।

তুলসী। কেমন করিয়া আবার তাহাকে দেখিতে পাইব?

রাজা। আমি তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছি। কিন্তু মা—

রাজার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল। তুলসী বুঝিল, অনন্তপুরপতি একটা তুচ্ছ রমণীর সম্মুখে মর্ম্মদ্বার উদ্ঘাটন করিতে চলিয়াছেন। সে মর্ম্মে বুঝি রাশি রাশি বেদনা সঞ্চিত আছে। না দেখাইলে উপশম নাই। অথচ তুলসী ভিন্ন দেখাইবার লোক নাই! কোমল সান্ত্বনামাখা দৃষ্টিতে রাজার মুখ পানে চাহিয়া তুলসী বলিল—

“মহারাজ! নারায়ণীতে আর আমাতে ভেদ জ্ঞান করিতে-ছেন কেন?”

রাজা। আমার অবস্থা ত সমস্তই শুনিয়াছ! আমার রাজ্য পর-হস্তগত; আমার সহচর, সহায়—গুরু কারাগারে। আমি জীবন্মৃত হইয়াও তবু গৃহবাসের সুখভোগ করিতেছিলাম

—নারায়ণীকে লইয়া তোমাকে পাইয়া, দুঃখে সুখে মিশাইয়া কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম ; কিন্তু তাও বুঝি আর থাকে না !

তুলসী। কেন মহারাজ ?

রাজা। আমাকে বন্দী রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে, আর যে আমি অধিক দিন তোমাদের কাছে থাকিতে পারিব, এমন ত বিশ্বাস করি না। তাই বলিতেছিলাম—

রাজা আবার নীরব। মুখ হইতে মনের কথা ফুটিয়াও ফুটিল না। ইহাতেই তুলসী বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া লইল।

তুলসী। কন্যাকে বলিতে এত কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন ? মহারাজ, আমরা রমণী, স্বভাবতঃই অভিমানিনী, ওরূপ সঙ্কোচ দেখিলে মনে হয়, এ অভাগিনী আপনার সন্তানবাৎসল্যের বহু অংশ হইতে বঞ্চিত আছে।

রাজা আর থাকিতে পারিলেন না। তুলসীর মস্তকে উচ্ছ্বাস-কম্পিত কর অর্পিত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিলেন ;—

"মা ! তোমাকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব জানি না। তুমি মহান্ পিতার কন্যা। একটী দরিদ্র পরিবারকে রক্ষা করিতে আসিয়া, পিতার মহত্ত্বের অনুযায়ী কার্য্য করিয়াছ। এত তোমারই যোগ্য কথা। কিন্তু তুলসী ! এ অভাগ্য পরিবারের উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহার উপকার করা মনুষ্যের অসাধ্য। তাই মা তোমাকে বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছিলাম। আমি তোমার কাছে, তোমার স্বামিটী ভিক্ষা করি।

তুলসী জিজ্ঞাসা করিল—"নারায়ণীর জন্য ?"

নারায়ণী জন্য রাজা চমকিয়া উঠিলেন। বাস্তবিক

তখন নারায়ণীর কথা তাঁহার মনেই ছিল না। নারায়ণীর নামে রাজার চক্ষে যেন বিষাদের একটা বিরাট ছবি জাগিয়া উঠিল। রাজা চমকিয়া একবার চারিদিক চাহিলেন; দেখি- লেন, নারায়ণী আসিতেছে। নারায়ণী পাছে শুনিতে পায়, এইজন্য অনুচ্চস্বরে তুলসীকে বলিলেন—

"নারায়ণীর চিন্তা করিবার আমার অবসর নাই; আমি নিজের জন্য চাহিতেছি।"

"তাহা হইলেও ত একবার অভাগিনীর জন্য চিন্তা করা কর্ত্তব্য। অনূঢ়া সুন্দরী লইয়া কাঁহাতক পথে পথে ঘুরিব?

রাজা মনে মনে তুলসীর বুদ্ধির বহু প্রশংসা করিলেন। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"এমন বুদ্ধি তোমার, তবে তুমি কেন মা একটা অপরিচিতা রমণীর কাছে পরাস্ত হইয়া চলিয়া আসিলে।"

তুলসী মাথা হেঁট করিল। নারায়ণীর নিকটে আসিতে বিলম্ব নাই দেখিয়া, রাজা বলিলেন—"সে তুমি যা ভাল বুঝ কর। কিন্তু কতক্ষণের জন্য! আমি বাসর জাগিবারও অবকাশ দিতে পারিব না।"

তুলসী। প্রয়োজন কি?

এদিক হইতে নারায়ণী আসিল; ওদিক হইতে মুন্না সদা- শিবকে কোথা হইতে ধরিয়া আনিল। রাজা সদাশিবের হাত ধরিয়া তুলসীর কাছে আনিলেন,—

"এই লও মা তোমার সামগ্রী। উদ্যানে উন্মাদের মত বিচরণ করিতে দেখিয়া আমি ইহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। ইহার মুখে সমস্তই শুনিয়াছি। তুমি ইহাকে নিঃসঙ্কোচে পুনর্গ্রহণ কর।"

তুলসী স্বামীর পদপ্রান্তে প্রণতা হইল।

সদা। মনেও যদি তোমার বিরুদ্ধে এতটুকু অপরাধ করিয়া থাকি, তুলসী তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর।

তুলসী। আর্য্যসন্তান মনের অপরাধকেও অপরাধ জ্ঞান করিয়া থাকে! মনের অপরাধেও আর্য্যরমণীর সতীত্ব আহত হয়। যে টুকু অপরাধ করিয়াছ, তারই যোগ্য শাস্তি গ্রহণ কর।" এই বলিয়া সুন্দরী এক হস্তে নারায়ণীকে ও অপর হস্তে স্বামীকে ধরিল। নারায়ণী অবাক হইয়া ব্যাপারটা দেখিতেছিল; কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। তুলসী হাত ধরিতে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হাত ধরিতেছ কেন?"

তুলসী। তোমায় বিবাহ করিতে হইবে।

নারায়ণী। কাকে?

তুলসী। আমার স্বামীকে।

নারায়ণী। কেন?

সদাশিবও অবাক! তুলসী এ কি করিতেছ! সে বিস্ময়ে আবার রাজার মুখ চাহিল; "একি মহারাজ!"

রাজা কোনও উত্তর করিলেন না! গভীর চিন্তামগ্নের ন্যায়, বাহু যুগলে বক্ষ আবদ্ধ করিয়া হেঁট মুণ্ডে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তুলসী কিছু অপ্রতিভ হইল। "তাহ'লে কি করিব মহারাজ?"

রাজা। কি করিবে? আমি উত্তর দিতে অশক্ত।

তুলসী। তবে আর হয় না। অবস্থা ত বুঝিতে পারিতেছেন।

মুন্না বলিল "সেই ভাল, হাত ছাড়িয়া দাও। আমার সময় নষ্ট হইতেছে।"

তুলসী উভয়েরই হাত ছাড়িয়া দিল। এমন সময় কাছারী বাড়ীতে কামানের গভীর শব্দ উত্থিত হইল। সদাশিব বলিল—"বুঝি পিতা পুত্রে রাঁচি হইতে ফিরিয়া আসিল। গুরু-জীর কারাবাস হইয়াছে; এ উল্লাস তারই জন্য।"

এক, দুই, তিন, কামানের উপর কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। মুন্না উত্তেজিত হইয়া বলিল—"অন্যায় করিয়া এ সময় নষ্ট কেন মহারাজ! আর একটু বিলম্ব করিলে আজিকার মত কার্য্য নষ্ট। হয়ত চিরদিনের জন্যই নষ্ট হইতে পারে।"

কামানের শব্দ শুনিয়া রাজাও ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন; তাঁহার ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল। নারায়ণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"নারায়ণী! আমার কুল রক্ষার জন্য, তুমি এই যুবাপুরুষকে পতিত্বে বরণ কর। এ অনূঢ়ার নাম খণ্ডন। স্বামীসঙ্গ সুখ, ভোগলালসা, মুহূর্ত্তের জন্যও মনের ভিতর স্থান দিও না!"

নারায়ণী সদাশিবের মুখের পানে চাহিল; সদাশিবও নারায়ণীর মুখ পানে চাহিল। তুলসী আবার দুই হাতে দুজনের হাত ধরিল।

রাজা আবার বলিলেন—"আমি তোমার পিতামহ সাক্ষী, এই প্রভুভক্ত ভৃত্য সাক্ষী, আর স্বার্থত্যাগিনী এই সতীরমণী সাক্ষী—এই ত্রিসাক্ষী সম্মুখে আমি আজ তোমাকে এই যুব-কের হস্তে সমর্পণ করিলাম। ভগবান যদি কখন দিন দেন, তবেই এ বিবাহ-সংস্কার সম্পন্ন করিব, নহিলে এইখানেই বিবাহ-সংস্কারের শেষ।

তুলসী হাতে হাতে মিলাইল! "নারায়ণী! আমার আম-

রণ সহচরী! এই আমাদের বাসর-রজনী। তোমার দারুণ আমিও আজ প্রথম স্বামী পাইলাম। এই তিন সাক্ষী, আরও উপরে অস্তগমনোন্মুখ দেবতা চন্দ্রমা। আর সাক্ষী তোমার প্রাণ। যদিই আমাদের পথে পথে ঘুরিতে হয়, তাহা হইলে আমরা হৃদগত দেবতাকে স্মরণ করিয়া সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিব। শত্রু আজ অজ্ঞাতসারে আমাদের এ শুভ বিবাহের উৎসব করিতেছে।”

আবার মুহুর্মুহু কামান গর্জ্জিল, দশমীর চন্দ্র অস্তাচলে গেল; সকলে অন্ধকারে যে যার নির্দ্দিষ্ট দেশে প্রস্থান করিল।

ইহারই অল্পক্ষণ পরে বীরচন্দ্রের প্রাসাদ হইতে একটী মৃদু-শঙ্খধ্বনি কামান গর্জ্জনের সঙ্গে ত্রস্তভাবে মিশিয়া অনন্তপুর গগণে বিলীন হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরদিন শুক্লা একাদশী রাত্রি-হরিবাসর। কাশীপুরের নরনারী শ্রীরাধাবল্লভজীউর মন্দিরে, ও সম্মুখস্থ জ্যোৎস্নাপুল-কিত প্রান্তরে অষ্টপ্রহরীয় হরিনামে উন্মত্ত। কাশীপুর গ্রাম এক নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত। রমণীগণ সুন্দর সুন্দর নববস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, দেবতার নৈবেদ্য লইয়া, গ্রামের নানা স্থান হইতে মন্দিরে সমবেত হইতেছিল। বালক সকল হরিধ্বনিতে সুর মিলাইয়া কোলাহল করিতে করিতে প্রান্তরে ছুটাছুটি করিতেছিল। চারিদিকে আনন্দের এক অবিচ্ছিন্ন ধারা অবি-রাম গতিতে গ্রাম হইতে বিষাদবিন্দুটী পর্য্যন্ত মুছিয়া লইতেছিল।

তৎসময়ে, যুগপৎ সহস্র সহস্র কামানের ভীষণ প্রলয়-গর্জ্জন সমস্ত দেশটাকে মুহূর্ত্তের জন্য যেন আঁধার বন্যায় ডুবাইয়া দিল। সমস্ত মন্দিরটার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। শ্রীরাধা লুপ্ত সংজ্ঞায় যেন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণের হাতের মুরলী খসিয়া পড়িল। নৈবেদ্যের থালা ঝনঝন শব্দে রমণীদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইল। এক অনুপলে উৎসব কোলাহল নিস্তব্ধ। কেহ মূর্চ্ছিত, কেহ স্তম্ভিত। দেখিতে দেখিতে এক বিশাল শ্বাসরোধী ধূমে সমস্ত প্রান্তরটী আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। লোকসকল একটা অনৈসর্গিক ভীষণ মৃত্যু ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া, নিজ নিজ গৃহাভিমুখে পলায়নপর হইল। কীর্ত্তনিয়া খোল করতাল ফেলিয়া ছুটিল, শ্রোতৃবর্গ যে যার প্রাণরক্ষার জন্য বহির্গমনে ব্যগ্র হইল। তখন কাহারও হাত ভাঙ্গিল, কাহারও পা ভাঙ্গিল, কেহ ভূমিতে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইল। কেহ মুমূর্ষু, কেহ গতপ্রাণ। চীৎকারে আর্ত্তনাদে, মুহূর্ত্তমধ্যে দেবমন্দির ও তৎসম্মুখস্থ স্থান বিভীষিকাময় শ্মশানের বিকট খলখল হাসি হাসিয়া নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

ঠিক সেই সময়ে তিনজন অশ্বারোহী বিদ্যুৎবেগে সেই প্রান্তর পার হইতেছিল। পার্শ্বস্থ ভীত বিপন্ন, ভূমিতলস্থ মূর্চ্ছিত, মৃতপ্রায়, গতাসু - কাহারও প্রতি তাহাদের লক্ষ্য ছিল না। উন্মাদের ন্যায় অশ্বে কষাঘাত করিতে করিতে, তাহারা সেই শব্দ লক্ষ্যে ছুটিতেছিল।

সে তিনজন আর কেহ নহে। রাজা, মুন্না ও সদাশিব। মুন্না উভয়কে প্রভু শৈলজানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য লইয়া যাইতেছিল। পথে আসিতে আসিতে সেই ভীষণ শব্দ তাহা-

দের কাণে গেল। কারণ নির্দ্ধারণে অসমর্থ, অথচ দারুণ অশুভের আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা শৈলজানন্দের গৃহাভিমুখে ছুটিয়াছেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই মুন্না অশ্বের বেগ হ্রাস করিল। বায়ু-তাড়নে ধূম্ররাশি অনেকটা অপসারিত হইয়াছে।

সদা। একি মুন্না!

মুন্না। আর মুন্না। যা ভয় করিয়াছি তাই। এই স্থান হইতে ফিরিয়া চলুন।

সদা। এত হতাশ হইতেছ কেন?

মুন্না। মায়ের মন্দির কই?

সদাশিবও অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া মুন্নার কাছে ফিরিয়া আসিল। রাজাও মুন্নার সমীপস্থ হইলেন। সদাশিব বলিল—"এখান হইতে দেখিতে পাইতেছ না বলিয়া, মন্দিরের অস্তিত্বে সন্দেহ করিতেছ কেন?"

মুন্না একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিল -"আপনি বারবৎসর দেখেন নাই; আমি এইস্থান হইতে তিনদিন পূর্ব্বে দেখিয়া গিয়াছি।"

রাজা বলিলেন—"তথাপি সন্দেহ ভঞ্জন করিতে ক্ষতি কি।"

তিনজনে আবার অগ্রসর হইলেন; কিন্তু অশ্বের আর পূর্ব্ববৎ গতি নাই।

আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা যাহা দেখিলেন, তাহাতে কিয়ৎক্ষণের জন্য কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাঁহারা দেখিলেন, শৈলজানন্দের অট্টালিকার চিহ্ন মাত্র নাই! প্রাচীর শত স্থানে ভগ্ন; মায়ের মন্দির, শৈলজানন্দের গৃহ—

সমস্তই স্তূপরাশিতে পরিণত! ইষ্টকাদিতে পূর্ণ হইয়া পরিখার বহুস্থান জলশূন্য। সকলে অশ্বপৃষ্ঠেই পরিখা পার হইলেন; সেখানে জনপ্রাণীর চিহ্ন পর্য্যন্ত লক্ষিত হইল না। এক অদম্য নিয়তির শাসনে সমস্ত স্থানটা গতজীবিত, স্পন্দনলেশশূন্য, নীরব। মলিন জ্যোৎস্না, মমতাময়ী জননীর ন্যায় কেবলমাত্র মৃত সন্তানের চক্ষে নীরবে শোকের উচ্ছ্বাস ঢালিয়া দিতেছিলেন। কোথায় শৈলজানন্দ? কোথায় তাঁর মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী অষ্টভুজা! তাহারা একবার মাত্র সেই ভগ্নস্তূপমধ্যে শৈলজানন্দ, তাঁহার স্ত্রী, আর তুলসীর "পুত্র" বিশ্বেশ্বরের সন্ধান করিল; কিন্তু কতকগুলা কামান ও বন্দুকের ভগ্নাংশ ভিন্ন, আর কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। ক্রমে সেখানে লোকসমাগম অনুমিত হইল। গ্রামবাসী এখন প্রকৃতিস্থ হইয়া, সেই ভীষণ শব্দের কারণ নির্ণয় করিতে সেইদিকে দলে দলে ছুটিয়া আসিতেছে।

অধিকক্ষণ অবস্থান যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া, তাহারা ভগ্নমনে সে স্থান ত্যাগ করিল। যাইবার সময় মুন্না কাঁদিয়া ফেলিল; আর সদাশিবকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"আজীবন প্রাণপণ সাধনায় প্রভুতে ও আমাতে যে শক্তি সঞ্চিত করিয়াছিলাম— সেই পঞ্চাশটী উৎকৃষ্ট কামান, বিশহাজার বন্দুক, পর্ব্বত প্রমাণ বারুদ, রাশি রাশি অর্থ—সমস্তই আজ এক মুহূর্ত্তে আপনার বালকত্বে নষ্ট হইল। কাল অনন্তপুর হইতে যাত্রা করিলে আর এ সর্ব্বনাশ ঘটিত না।"

সদাশিব কোন উত্তর করিল না। কেবল চলিতে চলিতে ভগ্নস্তূপের দিকে মুখ ফিরাইয়া, একবার মাত্র চীৎকার করিল— "বিশ্বেশ্বর!" সদাশিব দেখিল যেন একটী ননীর পুতুল বালক,

মুহূর্ত্তের জন্য স্তূপরাশির উপরে দাঁড়াইয়া, অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কি যেন দেখাইয়া মিলিয়া গেল। সদাশিব ভাইটীকে কখন দেখে নাই। মুন্নার মুখেই ভাইয়ের অস্তিত্ব শুনিয়াছে। তথাপি আর একবার ডাকিল—"বিশ্বেশ্বর!" নির্ম্মম স্তূপরাশি একটী প্রতিধ্বনিও ফিরাইয়া দিল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

কামান বন্দুক প্রভৃতি কোথায় কি আছে, শৈলজানন্দ কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই। মুন্না সেগুলা আছে জানিত, কিন্তু কোথায় আছে জানিত না। সে জানিবার জন্য প্রভুর কাছে কখনও আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। তাহার বিশ্বাস ছিল, এক দিন না এক দিন সে সকল সামগ্রী ব্যবহারে আসিবে। ব্যবহার লইয়াই তাহার কথা; কোথায় আছে জানিবার জন্য তাহার ব্যগ্রতা ছিল না। প্রভু শৈলজানন্দ এক-দিন তাহাকে বলিয়াছিলেন, জামাতা সদাশিব যোগ্য হইলে একদিন তাহাকে সমস্ত সম্পত্তি বুঝাইয়া দিব। রতন রায় একদিন মাত্র সে সম্পত্তির কিয়দংশ দেখিবার অবকাশ পাইয়া-ছিলেন।

সদাশিব যখন বালক, তখন, কখন নিজে, কখন বা মুন্নার সাহায্যে তাহাকে সমরবিদ্যায় রীতিমত শিক্ষিত করিয়াছিলেন। তার পর কন্যার সহিত বিবাহ দিয়াই, তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য, স্বোপার্জ্জিত অর্থে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে আদেশ দিয়া, বিদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "যতদিন

ফিরিতে না বলিব, তংদিন কাশীপুরে পদার্পণ করিও না।" কন্যাকেও, জামাতার যোগ্যা সঙ্গিনী করিবার জন্য, ব্রহ্মচারিণী-বেশে শ্বশুরগৃহ রক্ষায় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন।

এক যুগ অতীত হইল। জামাতার শক্তিমত্তায় তাঁহার আর অবিশ্বাস রহিল না। কন্যাকেও শক্তিমতী বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। সহসা একদিনের অসুস্থতায় তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়িল। তিনি মুন্নাকে ডাকিয়া বলিলেন, "যত শীঘ্র পারিস, সদাশিবকে লইয়া আয়। আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাকে আমার সমস্ত সম্পত্তি বুঝাইয়া দিব।"

শুভ অবকাশ বুঝিয়া মুন্না অনন্তপুরে ছুটিল। কিন্তু মুন্নাকে পাঠাইবার পর হইতেই শৈলজানন্দের অসুস্থতা বড়ই বাড়িয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, সদাশিবের প্রত্যাবর্ত্তনের বিলম্ব সয় না; বুঝি তাহার আসিবার পূর্ব্বেই মরিতে হয়। বৃদ্ধ দিনটা কোনও রকমে সদাশিবের প্রতীক্ষায় যাপন করিলেন। রাত্রির প্রথম প্রহরও অতিবাহিত করিলেন; আর পারিলেন না। তখন বালক বিশ্বেশ্বরকে ঘুম হইতে তুলিলেন। তুলসীর প্রস্থানের পর হইতে বালক শৈলজানন্দের কাছেই থাকিত। সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিয়া, বৃদ্ধ এই মাতৃবিয়োগবিধুর বালককে সান্ত্বনা দিতেন। শৈলজানন্দের গৃহিণীরও বালকের প্রতি যত্নের অভাব ছিল না; কিন্তু বালক বৃদ্ধের কাছে থাকিতেই ভাল বাসিত। শৈলজানন্দ পত্নী, পূর্ব্বযুগের গৃহিণী, স্বামীর কার্য্য কলাপ বিশেষরূপে বুঝিতে না পারিলেও, কখন কোনও প্রতি-বাদ করিত না। তাই সে জামাতা ও কন্যাকে বিদায় দিয়াও

স্বামীর কোন মহদুদ্দেশ্য কল্পনায় আনিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। শৈলজানন্দ বাহ্যিক কঠোর হইলেও সাংসারিক জীবনে কোমলতাময় ছিলেন। স্ত্রীর তাঁহার উপর রাগ করিবার উপায় ছিল না। স্বামীর এ কয়দিনের শারীরিক অবস্থা দেখিয়া, তিনি বিশেষ চিন্তিত ছিলেন ; এবং গৃহকর্ম্মের অবকাশে এক একবার আসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। একবার আসিয়া তিনি দেখিলেন, গৃহশূন্য। উৎকণ্ঠায় ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, দুর্ব্বল স্বামী এক হস্তে প্রজ্জলিত বর্ত্তিকা, অপর হস্তে বালকের হাত ধরিয়া অতিকষ্টে প্রাঙ্গণ পার হইতেছেন। সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা যাও ?"

কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া শৈলজানন্দ বলিলেন—"আ! পিছু ডাকিলে!" স্ত্রী কিন্তু এবারে স্বামীর বিরক্তি গ্রাহ্য করিল না। তাহার কার্য্যে প্রতিবাদ করিল। শৈলজানন্দ বলিলেন, "বালককে দেবতা দেখাইতে লইয়া চলিয়াছি।" গৃহিণী বলিলেন, "তবে আমিও সঙ্গে যাইব।" বাধ্য হইয়া বৃদ্ধ পত্নীকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কিছুদূর যাইতে না যাইতেই, সে ক্ষুদ্র দীপালোকে সমস্ত মন্দিরটা যেন সহসা জ্বলিয়া উঠিল। অগণ্য অস্ত্র প্রতিফলিত রশ্মিজালে, স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী ভবানী যেন কঠোর কটাক্ষে জাগিয়া উঠিলেন। সবিস্ময়ে শৈলজানন্দ গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন—"এ কি!"

শৈলজানন্দ বালককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বিশ্বেশ্বর! দেখিতেছিস্ ?"

বালক বিস্ময়ের বিন্দুমাত্রও চিহ্ন দেখাইল না, কেবল বলিল "দেখিতেছি।"

"কি দেখিতেছিস্ ?"

"মা।"

"মা!" শৈলজানন্দ একবার চারিদিক চাহিল।

শৈলজানন্দ-পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন—মা কে? তুলসী?

বালক উত্তর করিল,—"না—আমার মা।"

শৈলজানন্দ মন্দির গোলক সংলগ্ন অস্ত্রগুলা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর এ গুলা?"

"হাজার হাত আমাকে কোলে লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে।

"এই সমস্ত তোমার দাদা আসিলে দেখাইও।"

"দেখাইব।"

বর্ত্তিকাহস্তে শৈলজানন্দ অগ্রসর হইলেন। উভয়ে সঙ্গে চলিল। চলিতে চলিতে মন্দিরের ভিতর একটা স্থানে ভূমি সংলগ্ন একখণ্ড প্রস্তর ক্ষুদ্র বিশ্বেশ্বরকে দেখাইয়া বলিলেন,—"বালক পাথরটা উঠাইতে পারিস্?"

অবলীলাক্রমে বিশ্বেশ্বর পাথরটাকে উঠাইল। বিস্মিত শৈলজানন্দ বালকের মুখের পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"বেশ!—ভাই আসিলে দেখাইবি।"

বালক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "দেখাইব।"

একটা সুড়ঙ্গ বাহির হইল। সকলে সুড়ঙ্গপথে প্রবিষ্ট হইলেন। মাটীর নীচে একটী বিশাল গৃহ। সেই গৃহের এক পার্শ্বে স্তূপাকারে রক্ষিত টাকা ও মোহর। শৈলজানন্দ বালককে বলিলেন,—"এই সমস্ত দেখিয়া রাখ্. ভাই আসিলে দেখাইবি।"

বালক মাথা নাড়িয়া বলিল, "দেখাইব।" তখন এক এক করিয়া ভূগর্ভস্থ সমস্ত সম্পত্তি বৃদ্ধ বিশ্বেশ্বরকে দেখাইতে লাগিলেন। একটী একটী করিয়া পঞ্চাশটী কামান, হাজার হাজার গোলা—যুদ্ধের যতপ্রকার উপকরণ সমস্ত দেখাইয়া, তিনি বালককে বারুদের গুদামে লইয়া চলিলেন। অবাক হইয়া, স্বামীর এই অদ্ভুত কার্য্য দেখিতে দেখিতে শৈলজানন্দ-পত্নী স্বামীর অনুগমন করিতেছিলেন। বারুদের ঘরে পৌঁছিয়াই দেখিলেন, স্বামীর শরীর কাঁপিতেছে। অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া তাঁহারও মাথা ঘুরিতেছিল। তথাপি তিনি দুর্ব্বল পতনোন্মুখ স্বামীকে ধরিয়া ফেলিলেন; এবং প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। শৈলজানন্দ বালককে আবার বলিলেন,—"দেখিতেছিস্?"

বালক "মা! মা!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সূতিকা ঘরের শিশুটী রাখিয়া, বিশ্বেশ্বরের মা পরলোকগতা হইয়াছে। তথাপি তাহার মুখে বারম্বার 'মা' কথা শুনিয়া শৈলজানন্দ-পত্নী বলিয়া উঠিলেন—"কোথায় তোর মা?"

বালক অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইল। শৈলজানন্দ-পত্নী মূর্চ্ছিতা হইলেন। বৃদ্ধের কম্পিত হস্ত হইতে জ্বলন্তবর্ত্তিকা মেঝের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বারুদ কণার উপর পতিত হইল। এক আকাশভেদী শব্দে সমস্ত দেশটাকে কাঁপাইয়া এক প্রলয়-নিশ্বাস তিনটী দীপ নিবাইয়া দিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

ইহার অল্পদিন পরেই, ইংরাজী দশই মে তারিখে,—একদিনে—সমস্ত হিন্দুস্থান ব্যাপিয়া সিপাহী-বিদ্রোহের আগুন

জ্বলিয়া উঠিল। সে লোমহর্ষণকর ব্যাপার ইতিহাসাভিজ্ঞের অবিদিত নাই। তাহারই একটা স্ফুলিঙ্গ ছোট নাগপুরে উড়িয়া পড়ে। রাজা বীরচন্দ্র এই বিদ্রোহে যোগদান করেন। বিদ্রোহীরা রাঁচির ধনাগার লুণ্ঠন করে, জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদীদিগকে মুক্তি দেয়। ছোট নাগপুরের অধিবাসী সাহেবগণ কিছুদিনের জন্য প্রাণ লইয়া বিব্রত হন। কিন্তু সাহেবদিগের মধ্যে কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কতক গুলি দেশীয় স্ব স্ব গৃহে লুকাইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করে।

জেল ভাঙ্গিয়া, রাজা বীরচন্দ্র প্রথমেই রতনের অনুসন্ধান করেন; কিন্তু কোথাও তাঁহাকে না পাইয়া বিফল মনোরথে ফিরিয়া যান। কর্ত্তৃপক্ষ তৎপূর্ব্বে তাহাকে আলিপুরের জেলে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সদাশিব বুঝিয়াছিল, আনন্দ দেবের গৃহও আক্রান্ত হইবে। সেই পাপিষ্ঠই যত অনিষ্টের মূল। রাজার হস্তে পতিত হইলে পিতা ও পুত্র, কেহই বাঁচিবে না বুঝিয়া, আক্রমণের পূর্ব্বক্ষণেই তাহাদিগকে তুলসীর সাহায্যে সাবধান করিয়া দিয়াছিল। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র পিতা পুত্রে পলাইয়া যায়; পলাইবার সময় নরাধমদিগের, স্ত্রী সম্বন্ধে চিন্তা করিবারও অবকাশ ছিল না। কেবল সদাশিবের জন্য কেহই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পায় নাই। তুলসী আনন্দদেবের স্ত্রী ও জানকীকে আপনার আশ্রয়ে আনিয়া রক্ষা করে।

বিপন্ন সাহেবদিগের উদ্ধারার্থ সপ্তাহ মধ্যেই কলিকাতা হইতে ফৌজ আসিল। তাহাদিগের সহিত বিদ্রোহী সিপাহীদের যুদ্ধ হইল। বিদ্রোহীরা প্রাণপণে যুঝিয়াছিল;

কিন্তু তাহাদের কামান ছিল না। শুধু বন্দুক লইয়া কামানের মুখে কতক্ষণ যুঝিবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিদ্রোহীরা পরাস্ত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। রাজা আহত হইলেন; মুন্না ও সদাশিব তাঁহাকে লইয়া অরণ্যে পলাইল।

বিদ্রোহ প্রশমনের পর বহু বিদ্রোহীর শাস্তি হইল; কাহারও ফাঁসি হইল; কেহ কেহ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত, অবশিষ্ট বিবিধ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

কর্তৃপক্ষ বহুদিন ধরিয়া বীরচন্দ্রের সন্ধান করেন। আনন্দদেবও রাজাকে ধরাইবার অনেক চেষ্টা করেন; কিছুতেই কিছু হয় নাই। চারিদিকে ডিটেক্‌টিভ ছুটিয়াছিল, চারিদিকে ঘোষণাপত্র প্রেরিত হইয়াছিল, লোকদিগকে অনেক পুরস্কারের প্রলোভন দেখান হইয়াছিল,—কিছুতেই কিছু হয় নাই। নাগপুরের কত বন আলোড়িত হইয়াছিল, পুলীশ ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, তবু বীরচন্দ্রের সন্ধান হয় নাই। অনেক দাড়ী পুড়িয়াছিল, অনেক জটা মুড়িয়াছিল; অনেক সন্ন্যাসী গৃহস্থ হইয়াছিল। অনেক গৃহস্থ সংসার অনিত্য ভাবিয়া গৃহ-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পথে বসিয়াছিল, তবু বীরচন্দ্রের সংবাদ মিলিল না।

প্রতিদিন রাঁচি সহরে দলে দলে কত বীরচন্দ্র আসিতে লাগিল, কিন্তু নগরে আসিয়াই কেহ বালমুকুন্দ হইল, কেহ শনিচরোয়া হইল, কেহ বা দুর্ব্বলসিং পাঁড়ে,—কেহই বীরচন্দ্র হইল না। ভয় পাইয়া কত বৃদ্ধ শ্মশ্রুমুণ্ডন করিল, কেহবা চুলে কলপ লাগাইল।

অনেক করিয়াও যখন দেখিল, কিছু হইল না, তখন পুলীশ

গুলি বাঘের পেট চিরিয়া, অস্থি, অন্ত্র তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া অনুসন্ধানে ক্ষান্ত দিল।

ক্রমে নানা লোকে নানা কথা কহিতে লাগিল। কেহ বলিল, রাজা পলাইয়া আসিয়া নিজের প্রকাণ্ড বাড়ীর ভিতরের একটা চোর কুটুরীতে লুকাইয়াছিলেন। সেই গৃহমধ্যে বহুকাল হইতে একটা প্রকাণ্ড সর্প বাস করিত। সেটা আশ্রয়দাতাকে বিপন্ন বুঝিয়া তাঁহার আপাদমস্তক উদরস্থ করিয়া, পুলীশের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। কেহ বলিল, রাজা সুবর্ণরেখা পার হইতে জলস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিবেশী গণ্ডমূর্খ দুঃখী সিং সুবর্ণরেখার জলে রাজার হাতের আংটি পাইয়া একদিনে ধনী হইয়াছে। কেহ কেহ বা রাজা ব্যাঘ্র মুখে প্রাণ দিয়াছেন, এই কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত করিল। যে বাঘটা রাজার ঘৃতপুষ্ট দেহ ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহার গায়ে একগাছিও রোম ছিল না। গাত্রদাহে অস্থির হইয়া শার্দ্দূলপ্রবর যন্ত্রণা প্রতীকার প্রত্যাশায় আনন্দদেবের অন্নভোক্তা পৈত্রিক হিতকামী হনুমান সিংএর ঘরের চারিধারে প্রতি রাত্রিতে ঘুরিয়া বেড়াইত।

এইরূপে কথায় কথায় রাজার মৃত্যু সাব্যস্ত হইল। তখন কাহারও গৃহে লোষ্ট্র প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; কাহারও গৃহের সযত্ন রক্ষিত বরফী কে খাইয়া যাইতে লাগিল। নিশাগমে রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ পথ দিয়া যাইতে যাইতে বুধীর মার কাণে একটা অনুনাসিক স্বর প্রবেশ করিয়াছিল; পার্ব্বতীর বুকে একটি অস্বাভাবিক বায়ুবেগ অনুভূত হইয়াছিল। তাহাদের বড় সাহস তাই তাহারা জীবন লইয়া বাটীতে ফিরি-

য়াছে! কেহ কেহ রাজার প্রেতাত্মা স্বচক্ষে না দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইল না। যখন বহুমূল্য বসন পরিহিত, ধাতুময় উষ্ণীষশোভিত রাজার মূর্ত্তি প্রান্তরস্থ বটবৃক্ষের উপর দেখিতে পাইল, তখন সকলে রাজার মৃত্যু স্থির করিল।

এ সংবাদে কিন্তু আনন্দ দেবের মনস্তুষ্টি হইল না। সে মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে বীরচন্দ্রের জীবিত মূর্ত্তির বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। একদিন দেখিল, রাজা নিদারুণ পিপাসার্ত্তের ন্যায়, জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া, তাহার বক্ষরক্ত পানের প্রতীক্ষা করিতেছেন। আর একদিন প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিল, শাণিত ছুরিকা ঘরের মেজেতে পড়িয়া আছে। প্রথমে সে ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া দিল, তারপর বাটীর বাহিরে আসা ছাড়িল।

অল্প দিনের মধ্যেই কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে একটী মূল্যবান জায়-গীর ও রাজা খেতাব প্রদান করিলেন। আনন্দদেব জায়গীরের উপস্বত্ব পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার জন্য অনন্ত-পুরকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া, জন্মভূমি প্রসাদপুরে চলিয়া আসিলেন।

চতুর্থ খণ্ড।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বীরচন্দ্রের লক্ষ্মী অনন্তপুর ত্যাগ করিয়াছেন। স্বভাব চাঞ্চল্যে এখন তিনি আনন্দদেবের অনুসৃতা। অনন্তপুরে, যেখানে যা দেখিতে ভাল ছিল, উঠিয়া গিয়া, প্রসাদপুরের যেখানে না দেখিতে ভাল হয়, সেইখানে বসিয়াছে।

বীরচন্দ্রের সমুদায় সম্পত্তি ইংরাজ বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছেন; এবং তাহার কিয়দংশ আনন্দদেবকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। অনন্তপুরের কাছারী বাড়ীটী ভূমিসাৎ হইয়াছে, এবং তাহারই অধিকাংশ মালমশলা লইয়া প্রসাদপুরে একটী রম্য প্রমোদভবন রচিত হইয়াছে। অনন্ত-পুরের সবই গিয়াছে, শুধু রাজার প্রকাণ্ড প্রাসাদের একটু সামান্য অংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে। রাণী বাস করেন বলিয়া আনন্দদেব সেই অংশ ভাঙ্গিয়া লইতে সাহস করেন নাই; রতনের কুটীরটীও ভাঙ্গা হয় নাই। আনন্দদেবের একান্ত ইচ্ছা ছিল, যেন তাহার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট না থাকে। কারা-মুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ অনন্তপুরে ঠাঁই না পায়।

কিন্তু তাহার ইচ্ছামত কার্য্য হয় নাই। যাহারা যাহারা সেই ঘর খানি ভাঙ্গিতে গিয়াছে, তাহারাই একটা না একটা

বাধা পাইয়া সে স্থান হইতে পলাইয়াছে। কেহ ঘরের দেয়ালে প্রথম ঘা দিতেই একটী অজগর সর্প দেখিয়াছে, কেহ হস্তে আঘাত পাইয়াছে, কাহারও বা শিরঃপীড়া হইয়াছে। এইরূপ দৈবী বাধায় বিপন্ন হইয়া কুলীরা কেহই আর ব্রাহ্মণের ঘর ভাঙ্গিতে সাহস করে নাই। কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা বুঝিয়াছিল, ব্রাহ্মণের অনুপস্থিতিতে কোন উপদেবতা তাহার গৃহরক্ষা করিতেছে।

তবে মানুষে যে কার্য্য করিতে পারিল না, কাল অল্পদিনের মধ্যেই তাহা নিষ্পন্ন করিল। রতনের ঘর খানি আপনা-আপনিই ভাঙ্গিয়া পড়িল; এবং চারিদিকে গাছ পালা জন্মিয়া, অল্পদিনের মধ্যেই রতনের ভদ্রাসন জঙ্গলে পরিণত হইল।

পাঠক জানেন, জুনিয়ার মা তাহার ভিতরে ছিল। কিন্তু দরিদ্রা বৃদ্ধার সংবাদ লইবার কাহারও একটা বড় প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং সে যে কোথায় গেল, কি হইল, কেহ জানিত না।

রাণী সেই ভগ্ন অট্টালিকার এক অংশে, নারায়ণীও তুলসীকে লইয়া অবস্থান করেন। তাঁহার নিজের যাহা কিছু স্ত্রীধন আছে, তাহাতেই তিনজনের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। যাহা আছে তাহা অতি সামান্য। কেননা বিদ্রোহ দমনের অব্যবহিত পরে, যখন কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে, তাঁহার গৃহে বীরচন্দ্রের সন্ধানে পুলীশ প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তাহারা ঘরের কোন স্থান, কোন দ্রব্য সন্ধান করিতে বাকী রাখে নাই। ঘর খুঁড়িয়াছিল, বাক্স সিন্দুক পেটিকার ডালা খুলিয়াছিল; এমন কি ঘটী বাটীর ভিতরেও অঙ্গুলি প্রবৃষ্ট

করিয়া দেখিয়াছিল, যদি বীরচন্দ্র তাহার ভিতরে লুকাইয়া থাকে। সুতরাং রাণীর অবস্থা বুঝিতে বুদ্ধিমানের বড় বিলম্ব হইবে না। অবস্থার এতই হীনতা হইয়াছিল যে, রাণী পরিচর্য্যার জন্য একটী দাসী নিযুক্ত করিতেও ভরসা করেন নাই। তুলসী ও নারায়ণীই এখন গৃহের সকল কর্ম্ম করে।

কর্ত্তৃপক্ষ বীরচন্দ্রের সমস্তই লইয়াছিলেন। কেবল একটী মহামূল্য রত্নহারের সন্ধান পান নাই। সেই হারে সংলগ্ন 'চিন্তামণি' বলিয়া একটী অমূল্য হীরক ছিল। লোকে জানিত সেটী নাগপুরের "কোহিনুর।"

আনন্দদেব সে হারের কথা জানিত। সে হারের উপর তাহার বিলক্ষণ লোভও ছিল। সে জানিত, সে হার গলায় না পরিতে পারিলে তাহার ভোগ সুখ সম্পূর্ণ হইল না। এক কথায় রাজা হওয়াই হইল না।

কিন্তু আপাততঃ সে সামগ্রীটী পাইতে সাহস করিল না। পাছে গোলমাল হইয়া পড়ে, পাছে কর্ত্তৃপক্ষের গোচর হইলে, তাহার কার্য্য পণ্ড হয়, এই জন্য সে সময়ের প্রতীক্ষায় রহিল। তাহার বিশ্বাস ছিল, হার রাণী কিম্বা নারায়ণীর নিকট লুকান আছে।

দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল। এই তিন বৎসরের মধ্যে অনন্তপুর একরূপ জনশূন্য। যাঁহাকে লইয়া লোকের বাস, সেই লক্ষ্মীই যখন অনন্তপুর ত্যাগ করিয়াছেন, তখন লোকজন সেখানে বাস করিয়া কি করিবে! বিশেষতঃ হাট বাজার দোকান পশার, ক্রমে ক্রমে সমস্তই, কতক প্রসাদপুরে, কতক বাঁচিতে উঠিয়া গেল।

যাহারা অনন্তপুরের মায়া সহজে ত্যাগ করিতে পারিতে-ছিল না, পুলীশ তাহাদিগকে তাড়াইল। মাঝে মাঝে তাহারা বীরচন্দ্রের সন্ধানে অনন্তপুরে আসিত। আসিলে, এক আধবার এর শুধু তার ঘরটা খানাতল্লাসী না করিয়া যাইত না। চিলটা পড়িলে, কুটাটী অন্ততঃ না লইয়া ওড়ে না। পাঁচবারের কুটা একবারের বোঝা। নিঃসম্বল হইবার ভয়ে, এক দুই তিন করিয়া, তাহারা ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া দেশান্তরে চলিয়া গেল। থাকিবার মধ্যে, গ্রাম প্রান্তে দুই চারি ঘর কোল রহিল।

অল্পে অল্পে গ্রামখানি বনে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। এই নির্জ্জন দেশে, রহিল শুধু তিনটীমাত্র স্ত্রীলোক। রাজা কিম্বা সদাশিবের, এই তিন বৎসরের মধ্যে, কোনও সংবাদ মিলে নাই। তাহাদের উদ্দেশে মাঝে মাঝে কাঁদিয়াই রাণী নিশ্চিন্ত। তাহাদের দেখিবার আশাও নাই, দেখিতে সাহসও নাই।

আনন্দময়ী তুলসী এখন মাঝে মাঝে ম্রিয়মাণা। থাকে থাকে চক্ষে জল আসে। মাঝে মাঝে ভাবে—"বাপের বাড়ী ছিলাম, ছেলেকে পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম। কিন্তু আসিয়া করিলাম কি? ইহাদের কি উপকারে আসিলাম! শুধু গলগ্রহ হইয়া, আজীবন কি কাঁদিয়াই ইহাদের উপকার করিব!"

থাকে থাকে বিশ্বেশ্বরের জন্য প্রাণটা আকুল হইয়া উঠে। জন্মাবধি বার বৎসর পর্য্যন্ত সে বালক তুলসী ভিন্ন কাহাকেও চিনিত না। তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া, সে অপরিচিতের হাতে সমর্পণ করিয়া আসিয়াছে। এ তিন বৎসরের মধ্যে তুলসী তাহার কোনও সংবাদ পায় নাই। সে নিদারুণ সংবাদ, মুন্না

কিম্বা সদাশিব, তাহাকে শুনাইতে সাহস করে নাই। শুনাই-বার সময়ই বা কোথায় ছিল!

বিশ্বেশ্বরের সংবাদ পাইবার জন্য, তুলসীর প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া লালায়িত হইয়া উঠিত।

তারপর, যথার্থ বলিতে গেলে, তুলসী জীবনে কেবল একটী মুহূর্ত্তের জন্য স্বামী সুখ সম্ভোগ করিয়াছে। স্বামীকে, অভিসারিকা হইয়া ধরিতে হইয়াছে। প্রথম মিলনাশায় কম্পিত হৃদয়ে সুন্দরী যে রাত্রে অভিসারিকা, সেই রাত্রেই মানিনী, কলহান্তরিতা, ভাব সম্মিলিতা। তারপর রাত্রি শেষে দান। শত চন্দ্রালোকে উজলিতা সে রজনী তুলসীর চক্ষে এখনও সমভাবে ভাসিয়া আছে। তুলসী তিন বৎসর স্বামীর প্রতীক্ষায় রহিল, স্বামী বুঝি আর আসিল না।

সর্ব্বশেষে অনুতাপ। তুলসী এখন প্রতিদিন প্রতিক্ষণ ভাবিত—"ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া, রাজার অনিচ্ছায়, স্বামীর অনিচ্ছায়, নারায়ণীর অনিচ্ছায়, নিজের জেদ যেন বজায় রাখিতে সরলা বালিকার আমি কি সর্ব্বনাশ করিলাম! জোর করিয়া, একটী কুমারীকে বৈধব্য কিনিয়া দিলাম!" অথচ বিবাহ শাস্ত্র-মতে সম্পন্ন হইল না! নারায়ণীর কাছে স্বামীর কথা তুলিতেও সে সাহস করিত না। নারায়ণীও কোন দিন সদাশিব সম্বন্ধে মনোভাব তাহার কাছে প্রকাশ করে নাই। বুঝি নারায়ণী কতই অসন্তুষ্ট।

তার মনোভাব বুঝিতে তুলসীর একান্ত ইচ্ছা। নারা-য়ণীকে অসন্তুষ্ট বুঝিতে পারিলে, সে নিজে ঘটকালী করিয়া, তাহাকে অন্য কোন সুযোগ্য পাত্রে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়।

তুলসী কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যে একদিনও কথা পাড়িবার সুযোগ পাইল না।

এ যাবৎ কোল কোলিনদের সাহায্যে রাণী হাট বাজার করাইয়া আনিতেছিলেন। একবার তিন দিন ব্যাপী দুর্য্যোগ হইল। সে সময় কোলেরাও রাণীর কাছে আসিতে পারিল না; রাণীও তাহাদের কাছে যাইতে পারিলেন না। তখন তিন জনের একজন আহার্য্যের চেষ্টায় না বাহির হইলে, সকলকেই অনশনে থাকিতে হইবে।

তুলসী এইবারে রাণীকে বুঝাইবার সুযোগ পাইল। রাণীকে এক সময় একাকিনী দেখিয়া, তাঁহার কাছে হাটে যাইবার অনুমতি চাহিল। রাণী প্রথমে কথাটা কানেই তুলিলেন না।

তুলসী বলিল—মা এখন আমরা ভিখারিণী। অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়া থাকিলে ত, আর আমাদের চলিবে না।

রাণী। তুমি রাজার নন্দিনী। পরের জন্য ভিখারিণী সাজিয়াছ।

তুলসী। যার জন্যই সাজি, এরূপ অবস্থায় আর ত আমাদের দিন চলিবে না। এখানে থাকিতে হইলে, হাট বাজারে যাইতেই হইবে।

রাণী। এখানে না থাকিলে, কোথায় যাইব! তিনকুলে আমার কেহই নাই। আর যদিই বা কেহ থাকে, ত তার গলগ্রহ হইতে আমার ইচ্ছা নাই।

তুলসী। মেয়েকে পর ভাব কেন মা! আমার পিতার

যথেষ্ট সম্পত্তি, আমিই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। মেয়ের ঘরে চল না কেন?

রাণী। তোমার ঘরে যাইতে আমার কোনও আপত্তি নাই। তবে যে ক'টী দিন আমি আছি, বা এই ঘর কয় খানা না ভূমিসাৎ হইতেছে, সেই কয়টা দিন শ্বশুরের গৃহে সন্ধ্যা দিতে, আমি এইখানেই বাস করি। তোমার ইচ্ছা হয়, নারায়ণীকে লইয়া তোমার বাপের বাড়ী চলিয়া যাও। তোমরা আর এখানে থাক, আমারও ইচ্ছা নয়। এ নির্জ্জন দেশে বিপদে পড়িলে, তোমাদের কে রক্ষা করিবে?

তুলসী। তবেই আমাদের যাওয়া হইল। আমি এখন ঘাটে চলিলাম। এই বলিয়া রাণীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তুলসী বাহিরে চলিল। বাটীর বাহির হইবে, এমন সময়ে নারায়ণী আসিয়া তাহাকে বলিল,—"দিদি! তোমার বাপের বাড়ী হইতে কে লোক আসিয়া, তোমার সন্ধান করিতেছে।"

সংবাদে তুলসীর বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল। অতি ঔৎসুক্যে অধীর হইয়া তুলসী জিজ্ঞাসিল—"কোথায় ভগিনী?"

নারায়ণী রতন রায়ের ভগ্ন কুটীর নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তুলসী কুটীরের কাছে গিয়া দেখিল সদাশিব। প্রথমে সে মনে করিল স্বপ্ন । কিন্তু সদাশিব যখন জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ?" অমনি তুলসী ছুটিয়া স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিল।

মন তার লজ্জার বাঁধন মানিল না। গলা ধরিয়া, সদাশিবের বুকে মুখ লুকাইয়া, সে আকুল হইয়া কাঁদিল। কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না।

সদাশিব পত্নীকে প্রকৃতিস্থ হইতে অনুরোধ করিল। তুলসী অনুরোধ মানিল না। বলিল "বার বৎসরের পর একদিন দেখিয়াছি! কিন্তু নিজের দোষে সুখ উপভোগ করিতে পারি নাই। তার পর আবার তিন বৎসর। এদিন কি আর আসিবে! সুতরাং এই পোনেরো বৎসরের সঞ্চিত প্রাণের জ্বালা, জুড়াইয়া লই।

সদাশিব প্রথমে প্রকৃতিস্থ ছিল। কিন্তু আর থাকিতে পারিল না। তাহার হৃদয় উথলিয়া বন্যা আসিল, তুলসীর গণ্ড ভাসাইয়া দিল।

তুলসী এইবার মাথা তুলিল, স্বামীর মুখ দেখিল, বলিল, "আর কাঁদিব না।"

সদা। পোনেরো বৎসর চলিয়া গিয়াছে। যে গিয়াছে, তার আর মূল্য কি! কিন্তু তুলসী, এমন সুখের দিন কয়জনের আসে! সুতরাং রোদন রাখ। এইরূপ একটী অমূল্য দিন দান করিবার জন্যই বুঝি বিধাতা আমাদের পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন।

তুলসী। আমার আর দুঃখ নাই।

সদা। আমারও নাই। এমন দিনটী না পাইলে, বুঝি চিরদিন দুঃখ থাকিয়া যাইত।

তুলসী। কিন্তু এই তিন বৎসরের ভিতরে কি একদিনও আসিবার সুযোগ পাও নাই।

সদা। যখন আসিতে পারি নাই, তখনই বুঝিতে পারিতেছ। এই তিন বৎসর আমাদের সন্ধানে পুলীশ বন আলোড়ন করিয়াছে। যে রাজাকে ধরাইয়া দিতে পারিবে, সে বহুমূল্য পুরস্কার পাইবে। ইহার উপর আবার আনন্দদেবের দান। কয় জন সে প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে! শত্রু মিত্র সকলেই এখন রাজাকে ধরাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র।

তুলসী। তাহ'লে তোমার আর থাকিবার প্রয়োজন নাই। আমি তোমায় দেখিয়াছি। ইহার অধিক সুখ আমি আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি না। তুমি ফিরিয়া যাও।

সদা। আজ এ দুর্য্যোগে কেহ আসিবে না, ভয় নাই।

তুলসী। কোথায় আছ?

সদা। কেন, সেখানে যাইতে কি সাধ হয়!

তুলসী লজ্জিত হইল। স্বামী তাহার কথা বুঝিতে পারিয়াছে। বলিল—আমার না হয় সে তীর্থে যাইবার অধিকার নাই। কিন্তু আমার যে একটী সতীন আছে! সেটী যে অনাঘ্রাত নন্দন কুসুম! দেবতার আশ্রয় ব্যতীত তার থাকিবার যোগ্য স্থান কোথায়!

সদা। তুলসী কাজ বড়ই গর্হিত হইয়াছে।

তুলসী। তাতো বুঝিতেছি, কিন্তু উপায়?

সদা। উপায়—নারায়ণীকে বুঝাইয়া বিবাহে প্রবৃত্ত করা।

তুলসী। তাকি হয়!

সদা। বুঝিয়া দেখ। কেন তাহাকে চির জীবন দুঃখিনী করিয়া রাখিবে! আমি জানি, আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হয় নাই। তুমিও জান, হয় নাই।

তুলসী। কিন্তু নারায়ণী কি এ কথা স্বীকার করিবে? ক্ষত্রিয়-নন্দিনীর গান্ধর্ব্ব বিবাহ ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়।

সদা। সেখানে যুবক যুবতীর প্রেমের আদান প্রদান: পরস্পরের হৃদয় লইয়া খেলা। এখানে তার কি হইয়াছে তুলসী! জ্ঞানহীনা, দৃষ্টিহীনা বালিকা পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া, এক দৃষ্টিহীন অপরিচিতের হাতে হাত দিয়াছে। কোন শাস্ত্রে ইহাকে বিবাহ বলে না। নারায়ণী আমাকে একটু পূর্ব্বে দেখিয়াছে; কিন্তু চিনিতে পারে নাই। ইহাতেই বুঝ, আমি তার হৃদয়ে স্থান পাই নাই।

তুলসী। ভাল বুঝাইব। রাজার খবর কি?

সদা। বাঁচিয়া আছেন। শুধু তাঁহার জন্যই আসিতে পারি না। নহিলে, বন্দী হইবার ভয়, আমাকে তোমার নিকটে আসিতে নিবৃত্ত করিতে পারিত না। তুলসী তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়া, আমি তোমার দেবতা পিতার আদেশ পালন করিতেছি।

তুলসী। আমার পিতার সংবাদ কিছু জান?

সদা। সে কথা জিজ্ঞাসা করিও না। তবে এই কথা বলিতে পারি, তোমার পিতা অমর। তাঁর নশ্বর দেহ যদিই বা মাটীতে মিশায়, তাহাতে তাঁর জীবনের প্রভাব কখন ক্ষুণ্ণ হইবে না।

অদূরে একটী শব্দ হইল। সদাশিব চমকিয়া বলিল—"আর নয়, চলিলাম। তবে এই সামগ্রীটী নারায়ণীকে দিও। আর বলিও, যখন সে ইহাকে রাখিতে অশক্ত বোধ করিবে, তখন যেন সুবর্ণরেখায় নিক্ষেপ করে। যেন কিছুতেই আনন্দদেব কিম্বা সাহেবের হাতে না যায়।"

এই বলিয়া সদাশিব বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সেই মহামূল্য রত্নহার বাহির করিয়া দিল।

মুগ্ধনেত্রে তুলসী সেই জ্যোতির্ম্ময় কণ্ঠহারের প্রতি কিয়ৎ-ক্ষণ চাহিয়া রহিল।

সদাশিব বলিল—"দেখিতে হয়, নির্জ্জনে দেখিয়ো। যতক্ষণ না ইহাকে কোনও মনোমত স্থানে লুকাইতে পার, ততক্ষণ আপনাকে নিরাপদ মনে করিও না।"

তুলসী অতি যত্নে হার গাছটা অঞ্চলে বাঁধিতে লাগিল। বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—"শুভক্ষণে হাটে যাইবার জন্য বাটীর বাহির হইয়াছিলাম। বেসাতি হইল ভাল।"

সদা। তোমাকে কি হাটে যাইতে হয়?

তুলসী। এতদিন হয় নাই, বুঝি আজ হইল। নহিলে, এতকাল পরে, দ্বারে তুমি অতিথি—পরিচর্য্যা করিতে পারিলাম না বলিয়া, জীবনের একটা খেদ রহিয়া গেল—সেই তোমাকে অমনি অমনি ছাড়িয়া দিতেছি। আজ হাটে না যাইলে, কাল সকলকে অনাহারে থাকিতে হইবে।

সদা। রাণীর এমন অবস্থা হইয়াছে!

তুলসী। বোধ হয় কিছুকাল পরে, আমাদের ভিক্ষায় বাহির হইতে হইবে।

সদা। রাজা জানিতেন, রাণীর যথেষ্ট অর্থ আছে। তাই জানিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত আছি।

তুলসী। কিছু নাই। অর্থই শান্তি সুখের অন্তরায় বলিয়া, শান্তিরক্ষকেরা বৃদ্ধা শোকার্ত্তা রমণীর কাছে, সে অশান্তির জলন্ত স্ফুলিঙ্গগুলা রাখিতে সাহস করে নাই। নিজেরা লইয়া গিয়াছে।

শুনিয়া সদাশিবের চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল। ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"মানুষ যে এত নীচ হইতে পারে, তাতো জানিতাম না তুলসী! অবস্থা ভেদে দস্যুরও দয়া হয়।"

সদাশিব ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইল। ক্ষণেক কি যেন চিন্তা করিল। তুলসীও নীরবে স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া! এরূপ পবিত্র ক্রোধে সুন্দর মুখে কি সুন্দর বর্ণ বৈচিত্র্য হয়, তাই সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল।

ভাবিয়া বুঝি সদাশিব কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তাই সদুত্তর পাইবার প্রত্যাশায়, তুলসীকে জিজ্ঞাসিল—"কি করি তুলসী?"

তুলসী। ত্যাগী সন্ন্যাসীর এত ক্রোধ ভাল দেখায় না।

সদা। আমি দস্যুতায় প্রবৃত্ত হইব ইচ্ছা করিতেছিলাম।

তুলসী। ওকথা কি তোমার মুখে আনিতে আছে।

সদা। যার কাছে নীতিশিক্ষা করিয়াছি, আমার সে গুরুদেবেরও বুঝি এরূপ অবস্থায় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত। যাক্ সে কথা। অবস্থা যদি এরূপই হয়, তখন এ মহামূল্য সামগ্রী রক্ষা করিবে কি রূপে?

তুলসী। আমরাই অস্ত্র ধরিব। যদি মরিতে হয়, ত ধীরে ধীরে শুকাইয়া মরিব কেন।

রতনের কুটীর প্রাচীরের কতকগুলা ইষ্টক যেন অপসারিত হইয়া গেল। তুলসী সেইদিকে সভয়ে নিরীক্ষণ করিল। কিছু বুঝিতে পারিল না। তথাপি স্বামীকে সাবধান করিল। বলিল—"আর নয়।"

সদা। মুন্নাকে পাঠাইয়া দিই। সেই তোমার হইয়া হাটে যাইবে।

তুলসী। তাহাকে আবার বিপদে ফেলিবে কেন।

সদাশিব একটু হাসিয়া বলিল—"তুলসী! আমরা কোথায় আছি তা জান?"

তুলসী। তা জানি। যে ঘরে তোমরা বাস কর, তার উপরে বজ্রের আচ্ছাদন।

সদা। তবে আর বিপদের কথা তুলিতেছ কেন!

তুলসী। কোনও রকমে পিতাকে আমার সংবাদ দিবার চেষ্টা কর না কেন!

সদাশিবের মুখ গম্ভীর হইল। বলিল—"বারম্বার তাঁর কথা তুলিতেছ কেন?"

তুলসী। একটী বার বিশ্বেশ্বরের কথা তুলিব?

সদা। বিশ্বেশ্বর?—তুলসী! বড় আগ্রহে তাহাকে ডাকিয়াছিলাম। তাই একটী বার মাত্র সে আমায় দেখা দিয়াছিল।

সদাশিবের দুর্ব্বোধ্য উত্তরে ভীত হইয়া তুলসী অতি আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—"তারপর?"

সদাশিব বলিল—"বুঝি আমায় চিনিল না—আমায় ভাল লাগিল না—তাই বিশ্বেশ্বর চলিয়া গেল।"

সদাশিব মুখ ফিরাইল। তুলসীর বক্ষ কাঁপিল, বহুকষ্টে সে হৃদয় আবেগ দমিত করিয়া, বলিল—"নারায়ণীকে কি বলিব?"

সদা। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি। এই মহামূল্য মণিহার নারায়ণীর বিবাহে যৌতুক দিয়ো। এ রত্ন রাজার গৃহেও দুষ্প্রাপ্য।

তুলসী। রাজার কি মত আছে ?

সদা। তাঁহার অনুমতি লইয়াছি। তাঁহার আদেশেই আসিতেছি।

তুলসী। রাজার অবস্থা জানিবার ইচ্ছা ছিল। ইচ্ছা ছিল, এক আধ দিন তাঁহাকে দেখিয়া আসি। কিন্তু জানিতেও সাহস হয় না। আমরা রমণী। কি জানি কোন দিন অসাবধানে রহস্য প্রকাশ করিয়া সর্ব্বনাশ করিয়া বসিব!

সদা। পারি যদি একদিন লইয়া যাইব। যেখানে আছি, তাহার পাশ দিয়া সশস্ত্র সিপাহী কতবার যাতায়াত করিয়াছে। তথাপি সে স্থানের সন্ধান পায় নাই। দস্যু বৃত্তি করিবার সময় মুন্না সেইস্থানে বাস করিত। সে স্থান সন্ধানে বাহির করিতে পারে, এমন লোক এদেশে নাই। আমি আর মুন্না রাজাকে যথাসম্ভব সুখে রাখিয়াছি। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।

তুলসী। বলিতে পারি না, পার ত এক একবার দেখা দিয়ো।

যেন অশ্ব পদ শব্দ উভয়ের কানে গেল। ইঙ্গিতে সদাশিব তুলসীর কাছে বিদায় লইল; এবং চক্ষের নিমিষে স্থান ত্যাগ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তুলসী একবার চারিদিক দেখিয়া আসিল; কিন্তু কাহাকেও কোথাও দেখিল না। তখন ভ্রান্তিভ্রম স্থির করিয়া অনুসন্ধানে ক্ষান্ত দিল।

ঘরে ফিরিলে, নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল—"দেখা হইল?"

তুলসী। হইয়াছে।

নারায়ণী। আমি প্রথমটা দেখিয়া চিনিতে পারি নাই; মনে হইল, যেন কোথায় দেখিয়াছি। চলিয়া আসিলে মনে পড়িল।

তুলসী। তবে কি তাহাকে দেখিয়াছ?

নারায়ণী। দেখিয়াছি। দেখিয়াছি দুই দিন। একদিন দাদাকে বিপন্ন দেখিয়া তাহার কাছে গিয়াছিলাম। সেই দিন উনি আমাকে বাড়ীতে রাখিবার জন্য সঙ্গে আসেন?

তুলসী। আর একদিন?

নারায়ণী মৃদু হাসিয়া বলিল—"তুমি ত জান? সে দিন তুমিই দেখা করাইয়া দিয়াছিলে।"

তুলসী ভগবানের কাছে নারায়ণীর বিস্মৃতি কামনা করিতেছিল। এখন বুঝিল, ভগবান তাহার কামনা পূর্ণ করিলেন না। সুতরাং নারায়ণীর মন বুঝিবার তার বিশেষ প্রয়োজন হইল; কিঞ্চিৎ কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিল—

"মনে করিয়াছিলাম যা', তা'ত আর ঘটিল না।

নারায়ণী। কি মনে করিয়াছিলে?

তুলসী। সতীন করিয়া নিত্য তোমার সঙ্গে কলহ করিব।

নারায়ণী। এখন আমি তবে তোমার কি?

তুলসী। এখন তুমি আমার সহোদরা।

নারায়ণী। তাহাতে সতিনীর কলহে বাধা কি?

তুলসী। তুমি ত আর হইতে পাইলে না। ভগবান তা আর হইতে দিল কই!

নারায়ণী। তবে তুমি হাতে হাত দেওয়াইলে কেন?

তুলসী। কেন, এইত একটু আগে বলিলাম। সতিনী করিব স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার ত আর বিবাহ দিতে পারিলাম না।

নারায়ণী। তাহ'লে আমার বিবাহ হয় নাই?

তুলসী। কই আর হইল!

নারায়ণী। তবে তোমরা তিন জন কিসের সাক্ষী হইয়াছিলে?

নারায়ণীর উত্তরে তুলসী প্রথমে একটু অপ্রতিভ হইল। তথাপি বলিল—"ভগিনী সে দিনের কথা ভুলিয়া যাও।"

নারায়ণী। তোমরা না হয় ভুলিতে পার, মহারাজ ভুলিবেন কেন?

তুলসী। মহারাজের অনুমতি লইয়াছি, স্বামী আমাকে বলিতে আসিয়াছিলেন। মহারাজ তোমার ভাবী বিবাহের যৌতুক স্বরূপ এই মণিময় কণ্ঠভূষণ আমার স্বামীর হাতে দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।

নারায়ণী। ভাল, এই তিন সাক্ষীর হাত হইতেই না হয় নিস্তার পাইলাম। কিন্তু উপরের যে চন্দ্র সাক্ষী—তাহাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? সে যখন প্রতি পূর্ণিমায় আমাকে দেখিয়া, অবজ্ঞার পূর্ণ হাসি হাসিবে?

তুলসী। কেন, অকারণ বৈধব্য ভোগ করিবি নারায়ণী!

নারায়ণী। তোমার সৌভাগ্যের অংশ যে রমণী একবার পাইয়াছে, সে কখন কি জীবনে তাহা ত্যাগ করিতে পারে। দিদি! ওপাপ কথা আর মুখে আনিও না। উহাতে তোমার

মহত্ত্বের হানি হইবে। ভিখারিনী হইয়াছি বলিয়া কি, বংশ মর্য্যাদাও হারাইয়াছি—এত নীচ হইয়াছি!

তুলসী। অভাগিনী! তবে দেখা করিলি না কেন? আর কি সে রত্নের দর্শন মিলিবে।

নারায়ণী। একবার দেখিয়াছি, তাই যথেষ্ট। ভগবান যদি নিজে ইচ্ছা পূর্ব্বক কখন দেখান, তখন দেখিব।

তুলসী বাহুবল্লীতে নারায়ণীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া অজস্র চুম্বন করিল—আর বলিল—“তুমি আমার গর্ব্ব একদিনে চূর্ণ করিয়াছ। আমি এতকাল দিবারাত্রি সঙ্গে রাখিয়াও তোমাকে চিনিতে পারি নাই”

এই বলিয়া সুন্দরী সেই রত্নহার নারায়ণীর গলদেশে পরাইয়া দিল, বলিল—“বিবাহ সংস্কারের যে টুকু বাকী ছিল, আজ তাহা পূর্ণ হইল। এই নাও স্বামীদত্ত উপহার। চিরায়ুষ্মতী হইয়া কণ্ঠে ধারণ কর।

তুলসী এইবারে নিশ্চিন্ত হইয়া হাটে চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হাট প্রসাদপুরে; অনন্তপুর হইতে পাঁচ ক্রোশ। তুলসী যখন বাহির হইল, তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সূর্য্য তিন দিন মেঘে আচ্ছন্ন। ঠিক বেলা বুঝিবার উপায় ছিল না। তথাপি তুলসী বুঝিল, প্রসাদপুর পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইবে। ফিরিতে রাত্রি। বুঝিল, এই দুর্য্যোগে ফিরিয়া আসা সহজ

কথা নয়। মনে করিল, একান্ত আসিতে না পারি, আনন্দ-দেবের ঘরে অতিথি হইব। কতদিনের কথা—কে আমাকে চিনিতে বসিয়াছে! ঐশ্বর্য্য লইয়া, আনন্দ, মুকুন্দ, জানকী—কে কেমন সুখে আছে, জানিতে ক্ষতি কি!

মনের কথা সে কাহাকেও প্রকাশ করিল না। জানিলে রাণী তাহাকে কখনই ছাড়িয়া দিতেন না।

অনন্তপুরের বাহিরে তুলসী পা দিতে না দিতেই, মুষলধারে জল আসিল। পথে জলের স্রোত ছুটিল। জল ধারায়, তাহার অঙ্গ যেন বিদ্ধ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বাতাস। তুলসী দেখিল, এক জায়গায় মাথা না গুঁজিলে আর চলে না।

কিন্তু অনন্তপুরের ভিতরে রাজার বাড়ী ছাড়া আর মাথা গুঁজিবার স্থান ছিল না। কর্ত্তৃপক্ষ সমস্ত ভাঙ্গিয়া নীলাম করিয়া দিয়াছে।

গ্রামের বাহিরে তুলসীর গন্তব্য পথের ধারে কেবল একটী মন্দির ছিল। তাহার আনুসঙ্গিক সমস্ত ইমারত ভূমিসাৎ হইয়া, কতকগুলা ক্ষুদ্র বৃক্ষের আবাস স্থান হইয়াছিল। তুলসী সেই ক্ষুদ্র জঙ্গল-বেষ্টিত মন্দিরটী দূর হইতে দেখিতে পাইল। একটু দ্রুত পাদ বিক্ষেপে সেইখানে আশ্রয় লইতে চলিল।

যাইয়া দেখে, মন্দিরে প্রবিষ্ট হইবার মুখে একটী আধ ভাঙ্গা ঘর। বোধ হয় সেটা পূর্ব্বে প্রহরীদের থাকিবার স্থান ছিল। যদিও দ্বারে কাষ্ঠের চিহ্ন নাই, কিন্তু দেখিলে বোধ হয়, যখন ছিল, তখন তাহা কোনও ধনাঢ্যের সিংহদ্বারের সঙ্গে সমমর্য্যাদায় গণ্য হইতে পারিত। তুলসী বুঝিল, এই পথ দিয়া লোকে দেব দর্শনে যাইত।

সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইতে, তুলসী প্রথমে ইতস্ততঃ করিল। মনে করিল, প্রবেশ করিয়া কি ঘর চাপা পড়িব? তারপর ভাবিল, যখন এতদূরে আসিয়াছি, তখন যদি মন্দিরে দেবতা থাকে ত দেখিয়া যাই।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই তুলসী বিস্মিত হইল,—দেখিল, ঘরের এক পার্শ্বে একটী অশ্ব বাঁধা।

তবে ত সন্দেহ মিথ্যা নয়! কোনও লোক ত গুপ্তভাবে তাহার স্বামীর গতি বিধি লক্ষ্য করিতেছিল! এখনও পর্য্যন্ত তাহার স্বামীকে, রাজাকে ধরিবার জন্য যে চর ঘুরিতেছে তাহাতে তুলসীর সন্দেহ রহিল না। তুলসী বুঝিল, গোয়েন্দা প্রভু, এই মন্দিরের ভিতরেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

তাহাকে দেখিতে তুলসীর বড়ই ইচ্ছা হইল। কিন্তু তুলসী এই জনহীন প্রদেশে একাকিনী। একবার ভাবিল, এই অন্যায় কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য কি বিপদে পড়িব! বিপদে পড়িলে, এখানে কে আছে যে রক্ষা করিবে। আর যে ঝড় বৃষ্টি, যদি কেহ থাকে, চীৎকার করিলেও সে শুনিতে পাইবে না। তথাপি তুলসী দেখিবার ইচ্ছা দমন করিতে পারিল না। তার অসম-সাহস, বীরোচিত শক্তি।

তুলসী সিক্ত অঞ্চল দৃঢ় করিয়া কোমরে বাঁধিল। বস্ত্রাভ্যন্তরে একখানি সুতীক্ষ্ণ ভোজালি ছিল, সেটী কটীতে রক্ষা করিল। এখন, আত্মরক্ষার জন্য, সর্ব্বদাই তুলসী কাছে একটা না একটা অস্ত্র রাখে।

প্রস্তুত হইয়া তুলসী মন্দিরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া দেখিল, মন্দিরে দেবতা নাই। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার

পাদপীঠে একজন সাহেব শুইয়া আছে। দেখিয়াই সে বাহিরে ফিরিবার উপক্রম করিল। কিন্তু ফিরিতে না ফিরিতে সাহেব জাগিয়া উঠিল, এবং বহির্গমনোন্মুখী তুলসীকে সুন্দর হিন্দীতে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আপনি কে মাজী?" সাহেব আর কেহ নহে—ব্রাউন। ব্রাউন হিন্দী শিখিয়া অনন্তপুরে আসিয়াছে।

তুলসী চমকিল—একি সাহেব!

ব্রাউন বলিতে লাগিলেন—"বুঝিয়াছি, আপনি আমারই মত বিপদে পড়িয়া এই মন্দিরে আশ্রয় লইতে আসিয়াছেন। আমি সন্তান। আপনি নির্ভয়ে এখানে আশ্রয় গ্রহণ করুন। আমি বাহিরে যাই।"

তুলসী বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল। একি সাহেব! না সাহেব মূর্ত্তি ধরিয়া মন্দিরবাসী দেবতা। ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কে?"

"আমি বিদেশী। কোন প্রয়োজনে অনন্তপুরে আসিয়াছিলাম।"

"কতক্ষণ আসিয়াছেন?"

"সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আসিয়াছি।"

"এতক্ষণ! তবে কি আপনিই ভগ্ন কুটীরের আশ্রয়ে ছিলেন?"

"আমি নদীতীরের একটী গাছের তলায় ছিলাম।"

"আপনি একা ছিলেন, না সঙ্গে কেহ ছিল?"

আমি সঙ্গে কাহাকেও আনি নাই।"

"কাহাকেও দেখিয়াছেন?"

"দেখিয়াছি। এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি, আপনাকেই

দেখিয়াছি। আপনি একটী যুবা পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন।"

"তিনি আমার স্বামী।"

"স্বামী! তবে তিনি অত সভয়ে নির্জ্জনে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন কেন?"

উত্তরের ভাবে তুলসী বুঝিল, সাহেব গোয়েন্দা হইয়া সেখানে আসে নাই। সুতরাং অনেকটা নির্ভয় হইল। সেই সঙ্গে লজ্জাও আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিল। এ লোকটা অন্তরালে থাকিয়া তবে ত সব দেখিয়াছে।

সাহেব বলিতে লাগিল—"আমি মনে করিয়াছিলাম, কোন ভাগ্যবান, লোক চক্ষের অন্তরালে একটী পূর্ণ বিকশিত স্বর্গীয় কুসুমের সৌরভ চুরি করিয়া হৃদয় পূর্ণ করিতেছিল।"

তুলসীর এবারে কিছু রাগ হইল। মনে করিল, লোকটা তাহার চরিত্র লইয়া রহস্য করিতেছে। তাই কিঞ্চিৎ রুষ্ট ভাবে বলিল—"তোমাদের দেশে চোরকে ভাগ্যবান বলিতে পার। আমাদের দেশে চুরি করিয়া, যে অপরের আঘ্রাত কুসুমের সৌরভ লয়, তাহাকে লোকে ঘৃণার চোখে দেখে। কেহ তাহার ভাগ্যের প্রশংসা করে না।"

তুলসী জানিত না, বিলাতে তাহার বয়সী কত অবিবাহিতা সুন্দরী—কত মুগ্ধ প্রেমিকা—প্রণয়ীর প্রতীক্ষায়, মুখ খানিকে সুধার ভাণ্ড করিয়া, নির্জ্জনে কম্পিত বক্ষে দাঁড়াইয়া থাকে। জানিলে রুষ্ট হইত না।

ব্রাউন বুঝিলেন, সুন্দরী অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি ক্ষমা চাহিলেন। বলিলেন—আমি পবিত্র প্রণয়ে দোষ দেখি নাই

বলিয়া বলিয়াছি। আপনার অসন্তোষ হইবে জানিলে বলিতাম না।

তুলসী। আমাদের দেশে স্বামী স্ত্রীর রহস্যালাপ দেবতায়ও শুনিতে পায় না। যে অন্তরাল হইতে দেখে শুনে সে পাপ করে।

ব্রাউন। স্বামী যদি, তবে তিনি চোরের মত ভয়ে ভয়ে আপনার সহিত দেখা করিলেন কেন?

তুলসী। তোমাদের অত্যাচারে!

ব্রাউন। তবে কি তিনি বিদ্রোহী?

তুলসী। নিজের স্বার্থ বজায় রাখিতে, মর্য্যাদা রাখিতে কার্য্য করিলে যদি বিদ্রোহ হয়, তবে তিনি তাই।

ব্রাউন। তিনি গেলেন কোথায়?

তুলসী। তোমরা দয়া করিয়া তাঁর যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছ, সেই খানে। তোমাকে বলিয়া কি এক আধ বার দেখার সৌভাগ্যেও বঞ্চিত হইব?

ব্রাউন। আমাকে এত নীচ মনে করিবেন না।

তুলসী। সকলেই ত তোমাদের দেবতার মত মূর্ত্তি। ভিতরে কার কি, কেমন করিয়া বুঝিব।

কথাটা শুনিয়া ব্রাউন অন্তরে আঘাত পাইলেন। ভাবিলেন, এই সরলা দেশীয় রমণীর চক্ষে আমরা কি এতই ঘৃণিত হইয়াছি! তথাপি রমণীর ঘৃণা অপনোদনের জন্য বলিলেন—"বলুন কি কার্য্য করিলে আপনার ঘৃণা দূর করিতে পারি।"

তুলসী। আমাদের ঘৃণায় আপনাদের ক্ষতি কি সাহেব! আপনারা যদি দয়া করিয়া এখানে আর না পদার্পণ করেন, তাহা হইলেই আমরা নিশ্চিন্ত। আর আমাদের এখানে কি

আছে, তা দেখিতে আসিবেন। এখন আমাদের খাটিয়া খাইতে হয়। আমরা তিনটী নিঃসহায় স্ত্রীলোক এখানে বাস করি। আপনাদের দেখিলে ভয় পাই।

ব্রাউনের মুখ ম্লান হইয়া আসিল। তুলসী দেখিল, দেখিয়া বলিতে লাগিল—"সাহেব! একবার বাহিরে আসিয়া, চারিদিক চাহিয়া দেখুন। এখানে এখন দিবসে বাঘ ঘুরিয়া বেড়ায়। এখানে কি মানুষ বাস করে? তথাপি আমরা আছি। কেন?

ব্রাউন। অন্য স্থানে গেলে পাছে আমাদের মুখ দেখিতে হয়।

তুলসী। আপনাকে দেখিয়া, আপনার সঙ্গে কথা কহিয়া বুঝিয়াছি, আপনি মহৎ। তথাপি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনি এখানে আর আসিবেন না।

ব্রাউন। ভাল, আসিব না। কিন্তু যে জন্য আসিয়াছিলাম, তাহা ত সিদ্ধ হইল না।

তুলসী। কিজন্য আসিয়াছিলেন বলুন।

ব্রাউন। একবার রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে।

তুলসী ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"সাহেব! ভিখারিনী সাজিয়া পথে বাহির হইয়াছি। বিপদে পড়িয়া, এই নির্জ্জন দেব মন্দিরে আশ্রয় লইতে আপনার চক্ষে পড়িয়াছি। কিন্তু এরূপ অবস্থায়, যদ্যপি আমার স্নেহময় পিতা এখানে বর্ত্তমান থাকিতেন, এবং আপনার সঙ্গে প্রগল্‌ভ হইয়া এইরূপ কথা কহিতে দেখিতেন, তাহা হইলে এই প্রিয় কন্যার বুকে তিনি ছুরিকা বিদ্ধ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। রাজকুমারীর দেখার প্রত্যাশা ছাড়িয়া দিন।

ব্রাউন শুনিয়া শিহরিলেন। বলিলেন—আমিই তবে রাজা

বীরচন্দ্রের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছি। কিন্তু হে ঈশ্বর! আমি নিরপরাধ। অথবা, সে কথা বলিতেই বা সাহস কই! অন্যায় কৌতুহল চরিতার্থ করিতে গিয়া আমি ঘোর অপরাধ করিয়াছি।

এই বলিয়া ব্রাউন উঠিলেন, তুলসীকে অভিবাদন করিয়া মন্দির হইতে নিস্ক্রান্ত হইলেন।

তুলসী তাঁহার আচরণ দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহার কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সাহেব নারায়ণীকে দেখিতে আসিয়াছিল! কেন? রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রয়াসী একজন ম্লেচ্ছ! সে আবার নিজকে অপরাধী জ্ঞানে অনুশোচনা করিতেছে। সাহেবের শান্ত সুন্দর মুখে ক্ষিপ্ততার চিহ্ন মাত্রও লক্ষিত হইল না। বিষয়টা বুঝিতে তুলসীর একান্ত ইচ্ছা হইল। কিন্তু মন্দির বাহিরে পা দিতে না দিতেই দেখিল, সাহেব অশ্ব পৃষ্ঠে।

তুলসী ডাকিল—"সাহেব!"

তখনও ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল। ঝড় বহুদূর হইতে শব্দ-সম্ভার বহিয়া মন্দির দ্বারে ঢালিতেছিল। কথা ব্রাউনের কানে পৌঁছিল না। তিনি ঘোড়া হাঁকাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

তুলসীর আর হাটে যাওয়া হইল না! এক রাশ চিন্তার হাট করিয়া, হৃদয়ে পূরিয়া সে দিনের মত ঘরে ফিরিল।

ঘরে নারায়ণীকে সমস্ত কথা বলিল। নারায়ণী সেই বহুদিন পূর্ব্বের ঘটনা তুলসীকে বিবৃত করিল। বলিল—"আর ত কখনও কোন সাহেব দেখি নাই! সেই এক জনকে একবার খিড়কীর ঘাটে দেখিয়াছি।"

তুলসী হাসিয়া বলিল—"লোকটাকে তা হইলে চিনিয়াছি; এ সেই হতভাগ্য।"

নারায়ণী। হতভাগ্য হইতে গেল কেন?

তুলসী। সাগর তীরস্থ বৃক্ষে নীড় বাঁধিয়াও চাতক ভাগ্য-হীন হয় কেন?

নারায়ণী কথাটা ভাল বুঝিল না, বুঝিবার চেষ্টাও করিল না। কেবল বলিল—তা যা হউক, তুমি আর বাড়ী হইতে বাহির হইও না।

তুলসী। তার পর? কাল আমাদের অন্ন জোগাইবে কে?

নারায়ণী। ঘরে অন্নের ভাণ্ডার ছিল, তাহা লুটিয়া লইল কে? আমরা যে অন্নের চিন্তায় মরিব, এ ত স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই। তা হইলে, যে আমাদের অন্ন চিন্তা দিয়াছে, সেই আমাদের চিন্তা দূর করিবে।

তুলসী। তা জীবনেই করুক, কি মরণেই করুক।

নারায়ণী। আমাদের জীবনে মৃত্যুতে প্রভেদ কি?

এই সময় রাণী আসিয়া সপ্তাহ যোগ্য খাদ্য প্রাপ্তির সংবাদ দিলেন। তুলসী ও নারায়ণী পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিল। পরস্পরে কোনও কথা কহিল না। রাণী তুলসীকে সামগ্রীগুলা গুছাইয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। তুলসী জিজ্ঞাসা করিল—

"কে দিল মা?"

রাণী। কে দিল চিনিতে পারিলাম না; কেন দিল বুঝিতে পারিলাম না! তুমি বাটীর বাহির হইবে—রাজকন্যা

হাটে যাইবে—ভাবিয়া মর্ম্ম-পীড়ায় আমি কাঁদিতে ছিলাম। দেবতা বুঝি একটা কথা শুনিলেন।

তুলসী বুঝিল, কে দিয়াছে। সে আর কোনও কথা না কহিয়া জিনিষ গুছাইতে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এইবারে ব্রাউন সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। রাজান্তঃপুর প্রবেশ রূপ অবৈধ কার্য্যের পর, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি হিন্দী শিখিতেছিলেন। ইচ্ছা ছিল, বীরচন্দ্রের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। তাঁহার হিন্দীভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই রাজা বিদ্রোহী হইলেন। রাজার সহিত তাঁহার আর সাক্ষাতের সম্ভাবনা রহিল না।

ইতিমধ্যে তাঁহার মাতুলের মৃত্যু হইল। সেই সংবাদ পাইয়া অগত্যা তাঁহাকে বিলাত যাইতে হইল। সেখানে তিনি অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন তাঁহার লর্ড উপাধি হইল।

বিদ্রোহ শান্তির পরে তাঁহার পিতৃব্য চিরাবকাশ লইয়া দেশে যান। হারলি নিম্নবঙ্গের কোন জেলায় বদলী হন।

পিতৃব্য দেশে যাইয়া, ব্রাউনকে হিন্দীভাষায় অভিজ্ঞ বুঝিয়া, তাহাকে সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস লিখিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন "ইণ্ডিয়ায় ফিরিয়া যাও। দিল্লী

লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়া, সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ কর।”

ব্রাউন বলিলেন—“ইতিহাস লিখিতে পারি, কিন্তু সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া যদি লিখিতে হয়, যদ্যপি সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিতে হয়, তাহা হইলে, সে ইতিহাস স্বদেশবাসীর প্রিয় হইবে না।”

পিতৃব্য। তবে কি তুমি এ বিদ্রোহে দেশীয় চরিত্রের সমর্থন করিতে চাও?

ব্রাউন কোনও উত্তর করিলেন না। বাক্স হইতে খান কয়েক পত্র বাহির করিয়া পিতৃব্যকে দেখাইলেন। পত্র গুলা হারলি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। দিয়া বলিয়াছিলেন—“আমা হইতে ত রাজার কিম্বা ব্রাহ্মণ রতন রায়ের কোনও উপকার হইল না। বরং উপকার করিতে গিয়া, তাহাদের বিশেষ অনিষ্টই করিয়াছি। তুমি যদি এই পত্র গুলার সাহায্যে তাহাদের কোনও উপকার করিতে পার, ত চেষ্টা করিও।”

রাজা ও রতন রায় সম্বন্ধে বিচারকর্ত্তাদিগের আপনা আপনির মধ্যে যে পত্র লেখা লিখি হইয়াছিল, হারলি তাহার কতকগুলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

পিতৃব্য কিয়ৎক্ষণ নীরবে একখানা পত্র পাঠ করিলেন। পড়িয়া, সবগুলাই ব্রাউনকে ফিরাইয়া দিলেন।

ব্রাউন বলিলেন “ইতিহাস লিখিতে হইলে, এই চিঠি-গুলাও ত তাহাতে তুলিতে হইবে!”

পিতৃব্য বলিলেন—“বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট ভাল যে, সে সময়

কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বাহিরে থাকিলে তাহাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিতে হইত।"

পিতৃব্যের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ব্রাউন অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে ভারতবর্ষে ফিরিতে হইল।

কলিকাতায় পৌছিয়া, ব্রাউন সর্ব্ব প্রথমে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে চলিয়া গেলেন। কলিকাতায় ফিরিতে তাঁহার দুই বৎসর গেল।

দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে ব্রাউন স্থির করিলেন, আর একবার অনন্তপুরটা দেখিয়া যাই। সেই বহুদিন পূর্ব্বের অকার্য্যের অনুতাপ এখনও তাঁহার হৃদয় জাগিতেছিল।

ছোটনাগপুরে আসিয়া তিনি একদিন রাঁচিতে রহিলেন। রহিলেন, কিন্তু অন্য কোনও সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন না। ডাকবাংলায় অবস্থান করিলেন।

ব্রাউন কাহারও সহিত দেখা না করুন, কিন্তু সকলেই তাঁহাকে দেখিল। একটী ক্ষুদ্র সহরে একজন নবাগত সাহেবের আগমন কতক্ষণ গোপন থাকে ?

পরদিন প্রত্যুষে তিনি রাঁচি হইতে অনন্তপুর যাত্রা করেন। কাহার উপর সাক্ষাৎ না করায় তাঁহার উপর গ্রীড্ সাহেবের সন্দেহ হয়। তাঁহার কার্য্যকলাপে দৃষ্টি রাখিবার জন্য, তিনি সঙ্গে সঙ্গে আনন্দদেবকে সংবাদ প্রদান করেন।

সুতরাং ব্রাউন যে সময় সুবর্ণরেখার তীরে দাঁড়াইয়া, অশ্রু-নিষিক্ত চক্ষে অনন্তপুরের দুর্দ্দশা দেখিতেছিলেন, সে সময় আনন্দদেব প্রেরিত চর, রতন রায়ের ভগ্ন কুটীরের অন্তরালে দাঁড়াইয়া দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতেছিল। সেখানে সে

একটা ইটের স্তূপের উপর অবস্থিত ছিল। বারবার ইটগুলা স্থানচ্যুত হইতে লাগিল দেখিয়া, ধরা পড়িবার ভয়ে, সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। কিন্তু যাইবার সময়, সে সদাশিব, তুলসী এবং হার ছড়াটা দেখিয়া গেল। প্রসাদপুরে গিয়া সে প্রভুকে সমস্ত সংবাদ দিল।

সংবাদ পাইয়াই আনন্দদেব বুঝিল, ব্রাউন সাহেবও হার ছড়াটীকে দেখিয়াছে। বহুমূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী বলিয়া, হয়ত ব্রাউন হার গাছটী নিজে লইবার জন্য সুদূর বিলাত হইতে এদেশে আসিয়াছে। ব্রাউনের অবস্থার কথা আনন্দদেবের অবিদিত ছিল না। এরূপ অবস্থায় সেই হার বুদ্ধ নিজে লই-বার চেষ্টা করিতে সাহস করিল না; গ্রীড্ সাহেবকে সংবাদ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বোধ করিল। পুত্রের সঙ্গে আনন্দদেবের বহুক্ষণ পরামর্শ চলিল।

মুকুন্দ। সংবাদ দিলে রাজকুমারীর উপর অত্যাচার হওয়াই সম্ভব। তাহাকে আমি উৎপীড়িত করা আমার অভিপ্রায় নয়।

আনন্দ। নিজের মান মর্য্যাদা বজায় রাখা, আর সেই সঙ্গে জীবনটা যে কোন প্রকারে বাঁচাইয়া রাখাই আমার অভিপ্রায়।

মুকুন্দ। আপনার মর্য্যাদা হানির কারণ আমি দেখিতে পাই না।

আনন্দ। তুমি মূর্খ অন্ধ, তাই দেখিতে পাও না। চক্ষু থাকিলে দেখিতে, আমার মর্য্যাদার মাথার উপর সর্ব্বদা ক্ষুর ধার অসি ঝুলিতেছে। আমার সামান্য ক্রটীতে সে মর্য্যাদা

দ্বিখণ্ডিত হইবে। সাহেবের অনুগ্রহেই আমার পদ-গৌরব, তোমার মত যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম বুদ্ধিতে নয়। সুতরাং তোমার রাজকুমারী যাক্ আর থাক্, হারের কথা আমাকে কর্ত্তাদের বলিতেই হইবে।

মুকুন্দ। না বলিলে কি চলিবে না?

আনন্দ। কেমন করিয়া চলিবে! আমরা সরকারের জায়গীরদার। এরূপ অবস্থায় সংবাদ দিতে আমরা বাধ্য। যদি না দিই, জায়গীর বাজেয়াপ্ত হইবে।

মুকুন্দ। হারের খবর আপনাকে কে দিল?

আনন্দ। আমার লোক গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে।

মুকুন্দ। মনে করুন না, দেখে নাই।

আনন্দ। আর একজন সাহেবও সেই সঙ্গে দেখিয়াছে। সে ব্যক্তি আমাদের উপর তুষ্ট নয়।

এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, একজন সাহেব প্রসাদপুরে আসিয়া অতিথি হইয়াছে। তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া গৃহে স্থান দিতে ও সম্যক্ পরিচর্য্যা করিতে আনন্দদেব ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেলে বলিলেন—"এই দেখ, হারের সংবাদ পাইয়া কি করি না করি দেখিবার জন্য সে এখানে আসিয়াছে।"

ভীরুতা পিতা ও পুত্র উভয়েরই একটা বিশেষ গুণ ছিল। সাহেবের আগমন বার্ত্তা শুনিয়াই মুকুন্দ আর পিতার কথায় প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না।

সাহেব আর কেহ নহে ব্রাউন। সে দিনের দুর্য্যোগে

রাত্রি যাপন করিতে প্রসাদপুরে আসিয়া তিনি আনন্দদেবের গৃহে অতিথি হইলেন।

ইচ্ছা রাজকুমারীর সম্বন্ধে আনন্দদেবের সঙ্গে দুই চারিটা কথা কহেন। প্রত্যক্ষে উপকার করিতে অসমর্থ হইয়াও তিনি পরোক্ষে এই হতভাগ্য পরিবারের উপকার চেষ্টায় বিরত হইলেন না।

পিতা পুত্র উভয়েই ব্রাউনের যথারীতি অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার পরিচর্য্যার যথারীতি ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কাছে হার সম্বন্ধে কোনও কথা প্রকাশ করিলেন না। সন্ধ্যায় আনন্দদেব গ্রীড্ সাহেবের কাছে সংবাদ পাঠাইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সাহেবের আগমন সংবাদ আনন্দ-পত্নীর কানে গেল। স্বামী ঘরে আসিলে. তাঁহাকে সাহেবের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কারণ বলিতে গিয়া আনন্দ স্ত্রীর কাছে সমস্ত ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। প্রকাশ করিলেন, প্রাণের যাতনা লাঘব করিবার জন্য। কেন না বৃদ্ধের একান্ত ইচ্ছা ছিল, হার গাছটা যে কোনও প্রকারে নিজস্ব করেন। মনে করিয়াছিলেন, সাহেবেরা যখন বীরচন্দ্রের অনুসন্ধানে ক্ষান্ত দিবে, সেই সময়ে, ভয় দেখাইয়া অথবা মূল্য স্বরূপ কিছু অর্থ দিয়া, নিঃসহায়, দরিদ্রা রাণী মধুমতীর নিকট হইতে হার ছড়াটা আদায় করিবেন। কিন্তু দৈব নিগ্রহে তাহা আর ঘটিয়া উঠিল

না। মনের আবেগে তাই তিনি স্ত্রীর কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইল। স্বামী স্ত্রীতে কলহ বাধিয়া গেল।

স্ত্রী বলিল—"যদি সেই হারই গলায় পরিতে না পাইলাম, তখন রাণী হইয়া আমার কি লাভ হইল।"

স্বামী বলিলেন "তোমার গলার অদৃষ্ট, আমি কি করিব। তোমার কণ্ঠে 'চিন্তামণ' ঝুলাইতে কি আমার অসাধ। আমি ত আনাইবার চেষ্টায় ছিলাম। কিন্তু উদ্যোগেই যে গোল বাধিয়া গেল। জিনিষটার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছি, মাঝখান থেকে কোথা হইতে সাহেব আসিয়া দেখিয়া ফেলিল।"

এ কৈফিয়তে নূতনরাণী তুষ্ট হইলেন না। উদ্যোগ আর কিছুদিন পূর্ব্বে করিলে, সে অমূল্য মণি পর-হস্তগত হইত না। সুতরাং আনন্দ-পত্নী স্বামীর উদ্যোগের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া, সেই সাহেবের বৃষোৎসর্গ, সপিণ্ডকরণ, সমস্ত প্রেতকার্য্য শেষ করিল। কেন সে নরাধম কোথা হইতে আসিয়া হার গাছটা দেখিল! রাণী মধুমতীর ভাগ্যেও অনেকটা তিরস্কার জুটিল। সে অভাগিনী যখন নিজে ভোগ করিতে পারিবে না জানে, তখন আগে হইতে তাহাকে পাঠাইয়া দিল না কেন? ম্লেচ্ছের ভোগে দিয়া কেন সে ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট করিল?

স্বার্থে আঘাত পড়িলে অন্ধ মানব দেবতাকে গালি দিয়া থাকে। নূতন রাণী সর্ব্বশেষে যেখানে যত দেবতা জানা ছিল, সকলকেই গালি দিল। আনন্দদেব সেই গালি প্রবাহে গা ঢালিয়া চক্ষু মুদিলেন।

জানকী শ্বশুরালয় হইতে শাশুড়ীর কর্কশ বাক্যগুলা শুনিবার

চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহার ক্রোধ বিজৃম্ভিত ভাষার জটিলতায় ও অস্পষ্টতায় সে কিছু বুঝিতে পারিতেছিল না।

এমন সময় মুকুন্দ গৃহে আসিল। জানকী দেখিল স্বামী অন্যমনস্ক। তাহাকে সে কতকগুলা প্রশ্ন করিল, সদুত্তর পাইল না। মুকুন্দ কেবল বলিল,—"আমাকে এই রাত্রে এক জায়গায় যাইতে হইবে।"

কিন্তু কোথায় যাইবে, জানকী জানিবার অধিকার পাইল না।

বাহির হইতে এক দাসী ছুটিয়া আসিয়া জানকীকে সংবাদ দিল যে, জেলার বড় সাহেব তাহার স্বামীকে ধরিবার জন্য অনেক অস্ত্রধারী পাহারাওয়ালা সঙ্গে করিয়া প্রসাদপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আসিয়াই তাহার স্বামীকে তলব করিয়াছে।

জানকী এ বিপদের কারণ কিছু বুঝিল না, তথাপি স্বামীকে দাসীর সমস্ত কথা বলিল, এবং তাহাকে বাটীর বাহির হইতে নিষেধ করিল।

মুকুন্দ স্ত্রীর কথায় হাসিয়া বলিল—"ভয় নাই, আমাকে ধরিতে আসে নাই। বিদ্রোহী ধরিবার জন্য আমার সহায়তা লইতে আসিয়াছে।"

জানকী। আবার বিদ্রোহী কে?

মুকুন্দ। তুমি ত জান দুইজন বিদ্রোহী ধরা পড়ে নাই।

জানকী। এক বিদ্রোহী ত রাজা, আবার কে?

মুকুন্দ। আর বিদ্রোহী সদাশিব।

জানকী। সদাশিব আজও বাঁচিয়া আছে?

মুকুন্দ। সেই সংবাদই পাওয়া গেছে। সে অনন্তপুরে যাতায়াত করিতেছে।

জানকী। যদি বাঁচিয়া থাকে ত বাঁচিতে দাও।

মুকুন্দ। মাঝখান হইতে সদাশিবের উপর এ স্নেহ জন্মিল কেন?

জানকী। একি স্নেহের কথা হইল!

মুকুন্দ। তা ভিন্ন আমি ত অন্য কিছু বুঝিতে পারিতেছি না

জানকী। তা বুঝিতে পার আর নাই পার, সদাশিবের উপর আর অত্যাচার করিও না। সে ব্যক্তি তোমাদের কোনও অনিষ্ট করে নাই। তাহাকে ধরিয়াও তোমাদের কোন লাভ নাই।

মুকুন্দ। লাভ খতাইয়া দেখিতে তোমাকে কেহই অনুরোধ করে নাই। আমরা যাহা ভাল বুঝিতেছি তাহাই করিতেছি।

তথাপি জানকী স্বামীকে এই অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। ধর্ম্মাধর্ম্মের অনেক কথা তুলিল। মুকুন্দ শুনিল না। পরন্তু পত্নীর নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া, তাহার উপর রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিল। নরাধম স্বামী স্ত্রীর চরিত্রে দোষারোপ করিতে কুণ্ঠিত হইল না। বলিল—"তোমার প্রিয়ভৃত্যের প্রতি এতটা মমতা আগে জানিলে এ কার্য্য করিতাম না। এখন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছি। কি করিব সুন্দরী! বিধাতা তোমার অদৃষ্টে প্রিয়-বিরহ লিখিয়াছিল। আমায় ক্ষমা কর।"

রাগে জানকীর সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। মূর্খ স্বামীর কথায় আর তার উত্তর দিতে প্রবৃত্তি হইল না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া, মুকুন্দ আরও একটু রহস্য করিবার অবকাশ পাইল। বলিল—"দুঃখ করিয়ো না। ননীচোরাকে যখন বাঁধিয়া আনিব, তখন তোমাকে দেখাইয়া লইয়া যাইব।"

জানকী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল—"নিজের চরিত্র-যোগ্য কথায় আমাকে তুমি যাহা ইচ্ছা হয় বলিতে পার, কিন্তু এইটী জানিয়া রাখিয়ো, সদাশিবের অনুগ্রহেই আজ তুমি শুভাকাঙ্ক্ষিনী সহধর্ম্মিনীকে মর্ম্ম-পীড়িত করিবার অবকাশ পাইয়াছ।"

পত্নীর এই কথায় মুকুন্দ বড়ই ক্রুদ্ধ হইল। কাপুরুষ হিতাভিলাষিণী স্ত্রীর মর্য্যাদা না বুঝিয়া, তাহাকে গালি দিয়া বলিল -"কি বলিলি! আমি একটা গোলামের অনুগ্রহে বাচিয়া আছি!"

জানকী। আমার বিশ্বাস তাই আছ। এখনও সদাশিবের কৃপায় বাঁচিয়া আছ।

মুকুন্দ এবারে স্ত্রীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু স্ত্রীর দিকে এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই কে তাহার গণ্ডে চপেটাঘাত করিল। একটা অস্ফুট চীৎকার শব্দে কাপুরুষ সে স্থান হইতে ছুটিয়া পলাইল। পশ্চাতে নিরীক্ষণ করিতেও সাহস করিল না।

জানকী কিন্তু ব্যাপারটা দেখিতে পাইল। স্বামীর উপর ক্রোধ, ভয়ে পরিণত হইল।

যে চপেটাঘাত করিল, সে মুন্না। মুন্না জানকীর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল—"তোমা হইতেই দুইবার নরাধমদের প্রাণ রক্ষা হইল। নতুবা আজ ইহাদের হত্যা করিবার জন্য সঙ্কল্প

স্থির করিয়া আসিয়াছিলাম। কেহই বাঁচাইতে পারিত না। বড় উপযুক্ত সময়ে তুমি আমার প্রভুর নাম মুখে উচ্চারণ করিয়াছ। তাঁহার নামের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছ। নহিলে নরাধমকে আর তোমার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে হইত না।" এই বলিয়া মুন্না জানকীকে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

আজিকার কথাতেই পাঠক বুঝিয়াছেন, মুকুন্দের হাতে পড়িয়া জানকী সুখী ছিল না। বিশেষতঃ রাজকুমার হইবার পর কুচরিত্র চাটুকার সংসর্গে তাহাতে অনেক দোষ ধরিয়াছিল।

দুঃখে, ভয়ে, বিস্ময়ে ম্রিয়মাণ হইয়া জানকী ঘরে গিয়া শুইল। এতদিন নারায়ণীর দুঃখে দুঃখিত ছিল, এখন বুঝিল, তাহার মূর্খ স্বামীর হাতে না পড়িয়া, ভিখারিণী হইয়াও, রাজকুমারী তাহা অপেক্ষা সুখে আছে।

ব্রাউনের রাত্রে নিদ্রা আসিল না। সেই অবস্থায় শয়ন গৃহের বারাণ্ডায় পরিক্রমণ করিতে করিতে তিনি দেখিলেন, তাঁহার একজন স্বদেশী, কতকগুলি সিপাহী সঙ্গে লইয়া, নিঃশব্দে তাঁহার গৃহের সম্মুখস্থ পথ দিয়া চলিয়া গেল। ব্রাউনের সন্দেহ জন্মিল। তিনি প্রাতঃকালে সেই তেজস্বিনী রমণীর হতভাগ্য স্বামীকে দেখিয়া আসিয়াছেন। তাহার বিপদ ব্রাউনের কল্পনায় জাগিয়া উঠিল। তিনি অলক্ষ্যে তাহাদের অনুসরণে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যূষে নারায়ণী সুবর্ণরেখার তীরস্থ ভগ্নাবশিষ্ট উদ্যানে পুষ্পচয়ন করিতেছিল। এমন সময় মুন্না পশ্চাৎ হইতে তাহাকে প্রণাম করিল।

নারায়ণী প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিল না। মুন্না বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল—

"কি দিদি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?

নারায়ণী মুন্নার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া তাহার মুখে পরিচয়ের চিহ্ন অন্বেষণ করিতে লাগিল।

মুন্না। দেখ দেখি মনে করিয়া, যে রাত্রে তোমার বিবাহ হয়, সেই সময় তোমার স্বামীর পাশে আমাকে দেখিয়াছিলে কি না।

নারায়ণী এইবারে চিনিল। মুখে মৃদু হাসি আসিল বলিল—"তুমি মুন্না।"

মুন্না। তোমার ভৃত্য।

নারায়ণী। তা ভাই, এতকাল এ দুঃখিনী ভগিনীকে ভুলিয়া ছিলে কেন?

মুন্না। তোমাদের ভুলিয়া থাকি, একি ইচ্ছায়! সম্বন্ধীদের উৎপীড়নে ভুলিয়া থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু আর থাকিব না।

নারায়ণী। না ভাই, আসিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা আছ, ইহা জানিয়াও আমরা কত সুখী! আমাদের কত সাহস!

মুন্না। না দিদি, আর থাকিব না। তোমাদের যদি না দেখিতে পাইলাম, যদি দু'টা একটা কথাই না কহিতে পাইলাম, তখন বাঁচিয়া সুখ কি! আমরা আসিব—আসিয়া সম্বন্ধীদের সঙ্গে লুকোচুরী খেলিব। আমার এতকাল সাতবার ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল। আজিও বাঁচিয়া আছি, বাঁচিয়া তোমাদের সহিত কথা কহিতে পাইতেছি, এই যথেষ্ট। তোমাদের কিছু রাখে নাই, তাকি জানিতাম! আমি বাঁচিয়া থাকিতে তুলসী দিদিকে বাজারে যাইতে হইবে!

এমন সময় তুলসী সেখানে ছুটিয়া আসিল। মুন্না তাহাকে দ্রুত আসিতে দেখিয়াই বলিল—"কি দিদি সম্বন্ধীরা আসিতেছে?"

তুলসী। এখনি প্রস্থান কর। ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিয়ো না।

মুন্নাকে আর অধিক বলিতে হইল না। সে তখন উভয়কে প্রণাম করিল। বলিল "হুজুর অদূরে আমার অপেক্ষা করিতেছেন। আমি চলিলাম। এই বলিয়াই মুন্না যষ্টিতে ভর দিয়া ক্ষিপ্রগতিতে সে স্থান ত্যাগ করিল।

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি দিদি?"

তুলসী ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল—"হার কোথায় রাখিলি নারায়ণী?"

"ঘরে রাখিয়াছি।"

"শীঘ্র যাইয়া গলায় পর। বড়ই ভুল হইল। মুন্নার হাতে সে জিনিষ দিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইতাম। আর ত মুন্নাকে ধরিতে পারিব না। সে এখন কত দূরে।"

"কেন দিদি?"

"কথা কহিবার অবকাশ নাই। আমার বোধ হয়, কাল-কের সেই সাহেব সমস্ত কথা পুলীশে প্রকাশ করিয়াছে। বিশ্বাস হইতেছে না, তথাপি বিশ্বাস না করিয়া করি কি! নহিলে এতদিন নয় ততদিন নয়, আজ হটাৎ পুলীশ আসিতেছে কেন? তুমি শীঘ্র যাও, হার গলায় দাও। দিয়া রাণীকে লইয়া সুবর্ণরেখা পারে কোন নির্জ্জন স্থানে অবস্থান কর। "আমি মর্য্যাদানাশের আশঙ্কা করিতেছি।"

"আর তুমি?"

"আমার জন্য আশঙ্কা করিয়ো না আমি বীর শৈলজা-নন্দের কন্যা। বুঝিতেই ত পারিতেছ নারীর যাহা হইতে দুর্ভাগ্য আর নাই, সেই পতিবিচ্ছেদ বার বৎসরের জন্য আমাকে ভোগ করাইয়া, আমাকে সকল বিপদের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।"

"তুমি থাকিবে, আর আমি তোমাকে ফেলিয়া পলাইব!"

"পলাইতে হইবে কেন। কি জন্য তাহারা দল-বলে আসি-তেছে বুঝিবার জন্য অন্ততঃ একজনের থাকা প্রয়োজন। আমি ছাদে ছিলাম, সে স্থান হইতে দেখিয়াছি। তাহারা তখনও গ্রামপ্রান্তে। ভগবান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন। শীঘ্র যাও—বাড়ী ঘেরিলে আর বাহির হইতে পারিবে না।"

তথাপি নারায়ণী নড়িল না। তুলসী আবার বলিল— "গিয়া হার ছড়াটা গলায় পর।"

নারায়ণী। প্রয়োজন?

। হার ছড়াটা দিবার সময় স্বামী বলিয়াছেন,

যদি রাখিতে পার ত গ্রহণ কর। সুবর্ণরেখার জলে দিয়ো, তবু শত্রুকে দিয়ো না।

নারায়ণী। তবে সুবর্ণরেখাতেই দিয়া আসি।

তুলসী। সহজে দিব কেন। যখন দিব, তখন আমরাই বা তীরে দাঁড়াইয়া বীরচন্দ্র সাহীদেবের শেষ গৌরব চিহ্ন জলে ডুবিতে দেখিব কেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণরেখায় আত্ম সমর্পণ করিব।

তুলসী নারায়ণীর হাত ধরিয়া লইয়া চলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ঘরে গিয়াই তুলসী রাণীকে বুঝাইল। পুলীশের হস্তে পুনঃ পুনঃ মর্য্যাদা হানি হওয়া অপেক্ষা কাশীপুরে তাহার পিত্রালয়ে সকলের বাস করা কর্ত্তব্য। তখন আর বেশী কথা কহিবার অবকাশ ছিল না। অগত্যা রাণী তুলসীর প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন। এখন দরিদ্রা অর্থাভাবের মর্ম্ম বুঝিয়া,—শ্বশুর বংশের শেষ গৌরব চিহ্ন বজায় রাখিতে, রাণী এতকাল পরে শ্বশুর গৃহ ত্যাগ করিলেন।

স্থির হইল, বনপথ ধরিয়া, অগ্রে রাণী নারায়ণীকে লইয়া প্রস্থান করিবেন। তুলসী সাহেবের ভাব গতিক বুঝিবার জন্য সে স্থানে অবস্থান করিবে। সকলে চলিয়া গেলে, সন্দেহ করিয়া সাহেব তাহাদের অনুসরণ করিতে পারে। পুলীশ যদি অন্য কোনও কারণে অনন্তপুরে আসে, তাহা হইলে, রাণীকে পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে কতক্ষণ!

বাড়ীতে কাষ্ঠের একটী দৃঢ় ভেলা থাকিত, তুলসী তাই দিয়া তাহাদের সুবর্ণরেখা পার করিয়া দিল। তারপর ঘরে ফিরিয়া, আত্মরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন সমস্ত গুছাইয়া শরীরের স্থানে স্থানে রক্ষা করিল। তারপর ভবিষ্যৎ অতিথিগুলির অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল।

তুলসী পুলীশের দলকে গ্রামপ্রান্তে দেখিয়াছিল। সে স্থান হইতে রাজার বাড়ী বেশী দূর নয়। অথচ এই টুকু পথ আসিতে তাহাদের এত বিলম্ব হইল কেন? কারণ বলিতেছি। দলের ভিতর ছিল গ্রীড্ সাহেব—সঙ্গে মুকুন্দ, সেই পাঠকের পূর্ব্ব পরিচিত দারোগা, নাম রূপ সিং, আর দশ জন প্রহরী। ড্যাম্পল সর্ব্বাগ্রে আসিতেছিল।

প্রভাতে ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে যাইয়া জন তিন চারি কোল দেখিল, দূরে ঘোড়ায় চড়িয়া একজন সাহেব আসিতেছে, সঙ্গে আর একজন অশ্বারোহী, এবং পশ্চাতে অনেকগুলি সিপাহী।

প্রথমে তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর একজন ছুটিল, দেখাদেখি সকলেই তার অনুসরণ করিল।

সাহেব দেখিল, লোকগুলা যদি পলাইয়া যায়, তাহা হইলে রাজবাড়ীর লোকেরা তাহার আগমন বার্ত্তা জানিতে পারিবে। তাহা হইলে, বিদ্রোহীও ধরা পড়িবে না, হারও আদায় হইবে না। এই ভাবিয়া সে ঘোড়া ছুটাইল, মুকুন্দেরও সঙ্গে সঙ্গে ছুটা উচিত ছিল। এমন কি রূপ সিং তাহাকে সাহেবের পশ্চাৎ যাইতে অনুরোধ করিল; কিন্তু মুকুন্দ ছুটিল না। রাত্রে গুরু চপেটাঘাতের বেদনা তখনও তাহার গণ্ডকে সুস্পষ্ট রূপে পীড়িত করিতেছিল। সেই জন্য সে কিছুতেই প্রহরীর

সঙ্গ ছাড়িল না। কি জানি কোন দৈব-শক্তি প্রভাবে পথ পার্শ্বস্থ শিলাখণ্ডের অন্তরাল হইতে, তাহার পৃষ্ঠে তীব্র চপেটা-ঘাত নিক্ষিপ্ত হইবে! সে অনন্তপুরের মাটিকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। তার উর্ব্বরতার উপর তাহার বড়ই একটা সন্দেহ জন্মিয়াছিল। কি করিবে, না আসিলে রাবণে মারে, এই জন্য সে সাহেবের সঙ্গে আসিয়াছে।

রূপ সিং ও প্রহরীগুলা হাঁটিয়া চলিয়াছে, তাহারা যথাসম্ভব ছুটিল। কিন্তু তাহারা ছুটিয়া কতদূর যাইবে! অল্পক্ষণের মধ্যেই সাহেব ও কোলগুলা পথের উচ্চতার অন্তরালে পড়িল। এইখানে বলিয়া রাখি ছোটনাগপুরের পথ নিম্ন বঙ্গের পথের মত সমতল নয়। পথে ঘন ঘন উৎরাই ও চড়াই।

কোলগুলা ক্ষিপ্রগতিতে সাহেবের অশ্বকে পরাস্ত করিল। তাহার অনুচরবর্গ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

তাহারা এখন বিষম ফাঁফরে পড়িল। তাহারা যে স্থলে আসিয়া দাঁড়াইল, সেখানে দুই দিকে দুই পথ। বামের পথ দিয়া রাজবাড়ীতে যাইতে হয়, দক্ষিণের পথ শেষে কোল-পল্লী।

তবে রূপ সিং সাহেবের মেজাজটা ভাল রকম জানিত। সে বুঝিয়াছিল, সাহেব যখন কোল ধরিবার গোঁ ধরিয়াছে, তখন বীরচন্দ্রের বাড়ীর কথা আর তার মাথায় নাই। সে নিজের জেদ বজায় রাখিতে কর্ত্তব্য ভুলিয়াছে। এই জন্য রূপ সিং দক্ষিণের পথ ধরিল। সকলে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

কিছুদূর যাইয়া দেখে হুজুর কতকগুলা নিরীহ কোল ঠ্যাঙ্গা-ইতেছে। তাহাদের অপরাধ, তাহারাও কোল, এবং পলায়ন

পর কোলগুলার সঙ্গে এক পথে চলিয়াছে। যাহারা পলায়, তাহারা চোর সুতরাং এক পথাশ্রয়ী কোলগুলাও যে চোর নয়, তাহাতে বিশ্বাস কি! চোর ধরা পড়িলেই শাস্তি পায়। কাজেই সাহেব আগের ভাগ্যবান গুলাকে ধরিতে না পারিয়া, পরের হতভাগ্য গুলাকে প্রহার করিতেছিল।

এমন সময় তাহার সহচরবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আসিতে পারে নাই বলিয়া তাহারা সকলেই কিছু না কিছু গালি খাইল। মুকুন্দও কিঞ্চিৎ মিষ্ট তিরস্কার লাভ করিল।

যাই হ'ক, রূপ সিং সাহেবকে অনেক বুঝাইল, এবং সাহেবের সম্মুখে উপস্থিতি রূপ মহাপাপের শাস্তি স্বরূপ, দুই একজনের গণ্ডে চপেটাঘাত করিল। সর্ব্বশেষে কোলজাতির সঙ্গে নানা জাতীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিল। নিজের কার্য্য কুশলতায় নিশ্চিন্ত হইয়া সাহেব রূপ সিংএর অনুরোধে প্রহারে ক্ষান্তি দিল।

তুলসী এইজন্য রাণী ও নারায়ণীকে নিরাপদে সুবর্ণরেখা পার করিবার অবকাশ পাইল।

তারপর সন্দেহাকুলিত চিত্তে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিল। যতই মনে বল থাকুক, তথাপি তুলসী রমণী—অগণ্য বিপদ-ভারপ্রপীড়িতা কুলবধূ। তুলসীর মনে শত দুঃখের ছবি জাগিয়া উঠিল। পিতা, মাতা, বিশ্বেশ্বর, স্বামী, স্বামীর পবিত্র দান নারায়ণী—সব এক একবার তার চোখের উপর দিয়া চলিয়া গেল। তুলসী অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে তুলসী ভগবানকে ডাকিতে লাগিল—"দয়াময়! জ্ঞান

হইবার পর হইতেই, দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর সুখের মুখ দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়াছি। অবশেষে তোমার কৃপায় সুখের চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছি। এমন সুখ শত্রুর জন্যও প্রার্থনা করিতে সাহস কার না। হে দেবতা! আর সুখ চাই না। এখন এইটী চাই, যেন আমার পিতার, আমার স্বামীর, মর্য্যাদা নষ্ট না হয়। আমার পবিত্র বংশ-গৌরবে ঘা দিয়ো না। যেন নরাধমের হস্তে কুলবধূর ধর্ম্ম লাঞ্ছিত দেখিয়ো না। তাহা হইলে তোমার অঙ্গ-হানি হইবে।"

দেবতা যেন তুলসীর হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন, তাহার হৃদয়কে ভাবী বিপদের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইলেন। সে দেবতার কাছে আবেদন করিয়া, যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় বহির্দ্বারে ঘা পড়িল। "কে আছ দরজা খোল।" তুলসী যাইয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

সাহেব, মুকুন্দ, রূপ সিং, প্রহরী সকলেই দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল।

তুলসী সুন্দর পট্টবস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়াছিল। কটিদেশ অঞ্চলে আবদ্ধ, মস্তক অনাবৃত, কেশপাশ মুক্ত, কুঞ্চিত কুন্তল কপোলে, গণ্ডে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। চকিত স্বভাবা বনহরিণীর চঞ্চল চক্ষু স্থির হইয়াও হইতেছিল না।

এইরূপ অবস্থায় তুলসী দ্বার খুলিয়া সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইল। সাহেব দেখিল, যেন সুমেরুর কোন অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে "বিচিত্র বর্ণা অরোরা বোরিয়ালী" ফুটিয়া উঠিল!

সাহেব কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। রূপ সিং আর একবার এইরূপ মূর্ত্তি দেখিয়াছিল। তাহার দিকে তুলসীর দৃষ্টি পড়িবামাত্র, সে অবনত মস্তকে অভিবাদন করিয়া বলিল—"মায়িজী! আপনি এখানে!"

তুলসী। এখন হইতে এই আমার ঘর। তোমরা কি চাও?

সাহেব বহুবার অনন্তপুরে আসিয়াছে। রামচন্দ্রের সঙ্গে আনন্দদেবের সঙ্গে কত আমোদ উৎসবে যোগ দিয়াছে। রাজ প্রাসাদের শিল্পকার্য্য দেখিয়া দেশীয় শিল্প-নৈপুণ্যের কতবার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছে। কিন্তু এবারে অনন্তপুরে আসিয়া সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। অনন্তপুরের বর্ত্তমান শ্রী দেখিয়া তাহার কঠোর হৃদয়ও কতকটা কোমল হইল। সাহেব তুলসীকে ধীরভাবে প্রশ্ন করিল, "এই কি বীরচন্দ্রের বাড়ী?"

তুলসী। মহারাজ বীরচন্দ্রের প্রকাণ্ড প্রাসাদের তুচ্ছ ভগ্নাবশেষ।

অনন্তপুরের রাজ-প্রাসাদ যে ভূমিসাৎ হইয়াছে, তাহা সাহেব জানিত না। তাই তুলসীকে জিজ্ঞাসা করিল—"অপরাংশ কি হইল?"

তুলসী মুকুন্দকে দেখাইয়া বলিল—"ওই নরাধমের বিশ্বাস ঘাতক পিতাকে জিজ্ঞাসা করিবেন।"

সকলেই একবার মুকুন্দের পানে চাহিল। হতভাগা সে দৃষ্টি সমষ্টির ভার সহিতে না পারিয়া মাথা হেঁট করিল। সাহেব মুকুন্দকে বলিল,—"আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া, তোমার পিতার এ বাটী ভূমিসাৎ করা ভাল হয় নাই।" তুলসীকে বলিল,—"আপনি বীরচন্দ্রের কে?"

তুলসী। কেহ নই।

গ্রীড্। কি জন্য এখানে আছেন?

তুলসী। আপনি কি জন্য এখানে আসিয়াছেন?

গ্রীড্। আমার উপরিওয়ালার কার্য্য করিতে।

তুলসী। আমি সবার উপরিওয়ালার কার্য্য করিতে এখানে আছি। তিনি, এই বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা প্রতারিত, দেশের যত পিশাচ-প্রকৃতিক লোক কর্তৃক লাঞ্ছিত, আর তোমাদের ন্যায় সর্ব্বভুক্ অনল কর্তৃক দগ্ধ এই সাধু পরিবারের সেবা কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

গ্রীড্। এ বাড়ীতে এখন আছে কে?

তুলসী। রাণী আর রাজকুমারী। তবে এখন তাঁহারা এ বাটীতে নাই।

গ্রীড্। কোথায়?

তুলসী। তা বলিব না।

গ্রীড্ এতক্ষণ তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেছিল। এদেশের পর্দ্দানসীন স্ত্রীলোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার মুখে এরূপ কথা শুনিবে, সে স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কতবার তাহাকে কত পুলীশ মোকদ্দমার তদারকে আসিয়া, এদেশের লজ্জা-বিনম্রা, ভীতি-কম্পিতা রমণীর মুখ হইতে, কত ধমকে এক আধটী কথা বাহির করিতে হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অনবগুণ্ঠিতা লাবণ্য-পরিপ্লবে উদ্ভাসিতা তেজস্বিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহা তাহার ভাগ্যে আর কখন ঘটে নাই। সাহেব তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল। তিনি যে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার

জন্য জগতের সকলকেই অবিশ্বাস করিতে জন্মিয়াছেন, এটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তুলসীর শেষ কথায়, আবার তাহার লোকের প্রতি অবিশ্বাস ফিরিয়া আসিল। বলিল—"আমি একবার বাড়ীর ভিতর তদারক করিতে চাই।"

তুলসী। কিসের জন্য ?

গ্রীড্। কেন, সে রাণীর কাছে বলিব।

তুলসী। এই ত বলিলাম সাহেব, রাণী এ বাটীতে নাই।

গ্রীড্। তথাপি আমরা একবার দেখিতে ইচ্ছা করি।

তুলসী 'আমরা' কথার অর্থ জানিতে চাহিল। সাহেব আপনাকে ও আপনার অনুচরবর্গকে দেখাইল। তুলসী বলিল—"ইচ্ছা হয়, তুমি একা আসিতে পার।" তারপর সাহেবের অনুচরবর্গকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া বলিল—"এই অপবিত্র পশুগুলাকে আমি এই পবিত্র গৃহে প্রবেশ করিতে 'দব না।"

গ্রীড্। তুমি দিব না বলিলে, আমি শুনিব কেন ?

তুলসী কটিদেশ হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া বলিল—"বেশ প্রবেশ কর।"

সকলেই চমকিয়া উঠিল। প্রহরীরা এ উহার মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই ইঙ্গিতে পরস্পরকে ধিক্কার দিল। রূপ সিং বলিল—"হুজুর! একেলাই আপনি একবার দেখিয়া আসুন না।"

সাহেব নির্ভীক হইলেও একা সেই বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিল। তুলসী সেটা বুঝিল। জিজ্ঞাসা করিল—"সাহেব! একা যাইতে প্রস্তুত আছ ?"

ভীরুতা প্রদর্শন সাহেবের পক্ষে মৃত্যু হইতেও কষ্টকর সে উত্তর করিল,—"আছি। কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস কি ?"

সুন্দরী অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"এখন ?"

গ্রীড্ তুলসীর সঙ্গে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

তুলসী সাহেবকে নিম্নতলের সমস্ত ঘরগুলি একে একে দেখাইয়া, উপরে লইয়া গেল। ঘর সকল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে, অনেক স্থলের চূণ বালী খসিয়া পড়িতেছে, তথাপি গ্রীড্ গৃহ সকলের নির্ম্মাণ কৌশল দেখিয়া বিস্মিত হইল। অন্দরের যে অংশ এখন ধীরে ধীরে সুবর্ণরেখায় লীন হইতেছে, তুলসী সর্ব্বশেষে সাহেবকে সেই অংশে লইয়া গেল। সেখান হইতে বক্রগামিনী সুবর্ণরেখার গতি বহুদূর পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়। অট্টালিকার সন্নিকট দিয়া কিছুদূর যাইতে যাইতে. শালবনের অন্তরালে পড়িয়া এই পার্ব্বতীয়া স্রোতস্বিনী কিয়ংক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়। তারপর কিছুদূরে, কিছুদূরে কেন বহুদূরে, একেবারে সহস্র রজত ধারায় প্রবাহিতা দিগন্তের শুভ্রবসনা লীলাভিরামা দিগঙ্গনার ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

তুলসী অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সুবর্ণরেখার সেই পরম মনোরম দৃশ্য দেখাইল। আর দেখাইল, সেই বহুদূরের ঘন অরণ্যাণীর স্থির, তরঙ্গায়িত বক্ষ। প্রকাণ্ড তরঙ্গ ভঙ্গে সেই অনন্ত-শ্যাম-সাগরের পরম রমণীয় শোভা, সাহেবকে কিছুক্ষণ তন্ময় হইয়া দেখিতে হইল।

শুধু চক্ষে দেখিয়া সাহেবের তৃপ্তি হইল না। সঙ্গে দূরবীক্ষণ ছিল, তাহা চক্ষে দিল। চক্ষে দিয়াই ব্যস্ততার সহিত সে স্থান ত্যাগ করিল।

তুলসী ব্যস্ততার কারণ বুঝিতে পারিল না। সে সেই দূরস্থ দৃশ্যের প্রতি এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তখন দূরে সঞ্চরমান মনুষ্যদেহ অনুভূত হইল। অতি ক্ষুদ্র—শম্বুকাদি জীববৎ—পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া যেন উপরে উঠিতেছে। তুলসী বুঝিল, আর কেহ নহে, তাহারা রাণী ও নারায়ণী।

তুলসীও নীচে চলিল। নামিতে নামিতে দেখিল, চারি জন প্রহরী সশস্ত্র উপরে উঠিতেছে।

তুলসী জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমরা কি মনে করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলে?"

একজন বলিল—"হুজুরের হুকুম, তোমাকে আমাদের সঙ্গে নীচে যাইতে হইবে।"

তুলসী বলিল—"চল, আমিত নিজেই যাইতেছি।"

ইহার মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল—"কি ঠাকুরাণী! হার ছড়াটা রাখিলে কোথায়?"

"কিসের হার?"

"সেকি, একদিনেই সব ভুলিয়া গেলে! কাল বিদ্রোহী সদাশিবের সহিত অত আমোদ—আজ কি তার কিছুমাত্রও মনে নাই!

তুলসী এ কথার উত্তর দিল না। কেবল বলিল—"পথ ছাড়িয়া দে, নীচে যাই।"

যে প্রহরীটা এখন কথা কহিল, সেটাই গুপ্তভাবে ব্রাউনের

কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতে অনন্তপুরে আসিয়াছিল। সে রাত্রে পুলীশ সাহেবের সঙ্গে আসিতে পারে নাই। সাহেবের জমাদারকের সাহায্যে আসিবে বলিয়া, আনন্দদেবের আদেশে, প্রাতঃকালে পুলীশ দলের সঙ্গে যোগ দিয়াছে।

আর তিন জন সঙ্গী তাহাকে উত্তর করিতে নিষেধ করিল। তখন সকলে তুলসীর অগ্রে অগ্রে চলিল।

তুলসী নীচে নামিয়া দেখিল, তাহার অস্ত্র অপহৃত হইয়াছে। সাহেব নীচে আসিয়া ঘোড়ায় চড়িবার উদ্যোগ করিতেছে।

তুলসী বলিল কি সাহেব! পলাইয়া আসিলে কেন?

সাহেব এইবারে একটু রহস্য করিবার অবকাশ পাইল। এমন সুন্দরীর সম্মুখে অরসিকের দুর্নাম লইয়া ফিরিয়া যাওয়া সাহেবের পক্ষে অসহ্য হইল! সাহেব উত্তর করিল— "তোমার ভয়ে।"

তুলসী। তাই ত দেখিতেছি। অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, আমার সঙ্গে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস করিলে। আমাকে অস্ত্রশূন্য বুঝিয়া, এখন আবার চারিজন দুর্দ্দম বীরকে বাটীর ভিতরে পাঠাইয়াছ।

গ্রীড্। তোমার কোমল হস্তের অস্ত্রে ভয় নাই সুন্দরি! ভয় তোমার দু'টী ডাগর চক্ষুতে।

তুলসী। তবে অস্ত্র চুরি করিলি কেন? যদি সাহস থাকে ত অস্ত্র ফিরাইয়া দে।

এই সময় আনন্দদেবের অনুচর সাহেবকে বলিল—"হুজুর! এই স্ত্রীলোকটার হাতেই কাল বিদ্রোহীকে হার দিতে দেখিয়াছি।"

গ্রীড্। তুলসীকে সেই স্থানে দাঁড় করাইয়া রাখিতে এক-জন প্রহরীকে আদেশ করিল। বলিল—"যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ ইহাকে এইস্থানে দাঁড় করাইয়া রাখ্। সাবধান, যেন চক্ষে ধূলি দিয়া না পলাইয়া যায়।"

এই বলিয়া, অবশিষ্ট সহচরগণকে লইয়া গ্রীড্ নদী অভিমুখে প্রস্থান করিল।

তুলসী বুঝিল, সাহেব দূরবীক্ষণ সাহায্যে রাণী ও নারায়ণীকে দেখিতে পাইয়াছে। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, চক্ষু মুদিয়া ভগবানকে ধ্যান করিতে লাগিল। এ পাষণ্ডদের হস্তে আজ ত তাহাদের নিশ্চয়ই লাঞ্ছনা হইবে! "ভগবন্! তাদের রক্ষা কর। ধরণি! দ্বিধা হইয়া তোমার জ্বলন্ত-গর্ভে তাদের স্থান দাও। আর তাহাদের বাঁচিবার প্রয়োজন নাই!" মায়াময়ী প্রাণের যাতনায় আকুল হইয়া উঠিল। অশ্রু, মুদ্রিত চক্ষুর পলক ভেদ করিয়া প্রস্রবণের ধারায় বক্ষে ঝরিতে লাগিল।

প্রহরী বলিল—কেন মায়িজী! ও নির্দ্দয়ের সঙ্গে তর্ক করিলে!

তুলসী তখন অশ্রু মুছিয়া বলিল—"সাহেব গেল কোথায়?"

প্রহরী বলিল—"সাহেব বনের মধ্যে দুইটী স্ত্রীলোক দেখিয়াছে। তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিতে লোক লইয়া চলিয়াছে।

তুলসী। দুইটী স্ত্রীলোক ধরিতে এত লোক গেল!

প্রহরী। স্ত্রীলোক দুইটী, কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিতে অনেক লোক আছে। তাহারা ডাকাত—মিউটিনির সময়

সর্দ্দারী করিয়াছিল। তাহাদেরই ধরিবার জন্য সাহেব এত লোক আনিয়াছে।

তুলসী। আমাকে লইয়া এখন তুমি কি করিতে চাও ?

প্রহরী। আর কেন লজ্জা দাও মায়ী ! শুধু পেটের দায়ে এই নীচ কর্ম্ম করিতেছি। তুমি স্বচ্ছন্দে এখানে বিচরণ কর। কিন্তু দেখো মা, আমার রুটী মারিয়ো না।

তুলসী। আমি ত থাকিতে পারিব না। তাহারা আমার স্বামীকে ধরিতে চলিয়াছে, আমার রাণীকে ধরিতে চলিয়াছে।

প্রহরী। তা মা, হার গাছটা ফেলিয়াই দাও না। উহারা যখন লইবে বলিয়া আসিয়াছে, তখন না লইয়া যাইবে কি ?

তুলসী। হার তাঁহাদের কাছে। তুমি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে আসিতে পার। আমি সাহেবের কাছেই চলিয়াছি।

এই বলিয়া তুলসী গমনোদ্যতা হইল। প্রহরিবর বড় ফাঁফরে পড়িল। তুলসী বুঝিতে পারিয়া বলিল, "ভয় নাই। তুমি আমার সঙ্গে চল। সাহেবের কাছে গেলে, সে আর তোমাকে তিরস্কার করিবে না।"

তুলসী প্রহরীর উত্তরের অপেক্ষায় রহিল না। প্রহরিবরের চক্ষের পলক না পড়িতে পড়িতে, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কি করিবে, হতভাগ্য অস্ত্র শস্ত্র হাতে থাকিতেও হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তুলসী বরাবর উপরে গেল। উপর হইতে সন্ধান করিতে লাগিল, পুলীসেরদল কোথায় আছে. কতদূর গিয়াছে। চারিদিকে চাহিতে ব্রাউনকে দেখিল। ব্রাউন তাহার পূর্ব্বাধিষ্ঠিত নদীতীরস্থ বৃক্ষতলে গুপ্তভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন

অন্য কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া, তুলসী তাঁহার নিকটেই চলিল। ব্রাউন বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া, প্রৌঢ়ের অনুচরগণের নদীপার হওয়া দেখিতে ছিলেন। এমন সময়ে তুলসী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া, তাঁহাকে বলিল—"কি সাহেব! রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়া, রাগে কি পুলীশের সাহায্য লইয়াছ?"

ব্রাউন ফিরিয়া দেখিল, সেই তেজস্বিনী সুন্দরী! অমনি অভিবাদন করিয়া বলিল—"আমাকে এত নীচ মনে করিবেন না। আপনাদের কি করিতে পারি আদেশ করুন। সে কার্য্যের জন্য আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি।"

তুলসী। সত্য!

ব্রাউন। আমাকে কার্য্যের ভার দিয়া দেখুন।

তুলসী। সাহেব! দয়া করিয়া আমার অভাগিনী ভগিনীটীকে অমর্য্যাদার হস্ত হইতে রক্ষা কর।

ব্রাউন। কোথায় তিনি?

তুলসী। মর্য্যাদা রক্ষার ভয়ে তিনি অরণ্যে পলায়ন করিয়াছেন। পুলীশে তাঁহাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়াছে।

ব্রাউন। আমি কোন পথে যাইব?

তুলসী। পথ এতক্ষণ বোধ হয় পুলীশের আয়ত্তে। আপনাকে এই বন ধরিয়া বরাবর পশ্চিম মুখে যাইতে হইবে তাহাদের অন্বেষণ করিতে হইবে। পুলীশ না পঁহুছিতে তাহাদের ধরিতে হইবে।

ব্রাউন। আমাকে দেখিলে তিনি যদি আবার ভয় পান! আমাকে একবার দেখিয়া, ভয়ে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।

তুলসী। সাহেব। ক্ষণেক অপেক্ষা করুন।

এই বলিয়া তুলসী বৃক্ষের একটা পত্র কুড়াইল। তারপর দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট করিল।

ব্রাউন বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন—"বুঝিয়াছি, নিবৃত্ত হ'ন। আমার কাছে লিখিবার উপকরণ আছে।"

তুলসী মৃদু হাসিয়া বলিল—"আর একটু আগে বলিতে হয়!"

লোহিত রাগে চাঁপার কলি রঞ্জিত হইল। তুলসী সেই শোণিতাশ্রুত অঙ্গুলি দিয়া পত্র পৃষ্ঠে কি লিখিতে লাগিল।

বিস্ময় বিমুগ্ধ ব্রাউন এক দৃষ্টে এই অদ্ভুত রমণীর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন।

লেখা শেষ হইলে, তুলসী পত্র খানা ব্রাউনকে দিয়া বলিল—"এই খানা তাহাকে দেখাইবেন। আর আমার সঙ্গে আসুন। আমি নদী পারের সুগম পথ দেখাইয়া দিতেছি।"

ব্রাউনকে সুবর্ণরেখা পার করিয়া তুলসী প্রহরীর কাছে ফিরিয়া আসিল।

হতভাগ্য দ্বারদেশে মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছিল। সে স্থির করিয়াছিল, স্ত্রীলোকটা আর ফিরিবে না। অথচ বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া রমণীর অন্বেষণ করিতেও তার সাহস ছিল না। কাজেই সাহেবের কাছে লাঞ্ছনা, এবং সেই সঙ্গে চাকুরী হইতে চিরাবসর প্রাপ্তি সে এক রূপ স্থির করিয়া অবসন্ন দেহে দ্বার জুড়িয়া বসিয়াছিল। তুলসীকে দেখিয়া সে প্রাণ পাইল। সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। তুলসী বলিল—"কি সিপাহীজী! লাঞ্ছনার ভয়, চাকুরীর ভয় ঘুচিল কি?"

সিপাহী মাথা হেঁট করিয়া বলিল—"মায়িজী! আপনি দেবী।"

তুলসী। কখন সাহেবের দল ফিরিবে, ততক্ষণ অনাহারে আকাশ পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিবে কেন? আমি কিছু আহারের আয়োজন করি।

প্রহরী। এ তুমি কি বলছ মায়ী!

তুলসী। এটা মহারাজ বীরচন্দ্রের বাটী। এ বাটীর দ্বারে আসিয়া কখনও কোন অতিথি বিমুখ হয় নাই।

প্রহরী আভূমি প্রণত হইয়া তুলসীকে দেবী জ্ঞানে অভিবাদন করিল। তুলসী গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রহরীর যোগ্য আহার সংগ্রহ করিতে তাহার বহু বিলম্ব হইল। বহির্দ্বারে ফিরিয়া আসিয়া দেখে প্রহরী নাই। "সিপাহীজী সিপাহীজী" বলিয়া সে কত ডাকিল, কোনও উত্তর পাইল না। খাদ্য হাতে সে বহুদূর অগ্রসর হইল, প্রহরীর সন্ধান পাইল না। এক পা এক পা করিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইল, সেখানে কাহাকেও দেখিল না।

থালা হাতে তুলসী ফিরিতেছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল—"তুলসী!" তুলসী ফিরিয়া দেখিল, স্বামী।

তুলসীর বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল।

"তুমি কেমন করিয়া এখানে রহিয়াছ!"

সদা। কেন থাকিব না। কতকগুলা বাঁদীর বাচ্ছার ভয়ে পলাইয়া তুলসী! সে দিন অতিথি সৎকার করিতে পার নাই বলিয়া দুঃখ করিয়াছ, তাই আজ তোমার দ্বারে অতিথি

তুলসী। সাহেব যে তোমাকে ধরিতে আসিয়াছে!

সদা। মুন্না তাহাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছে। তার দলবল এখন তাকে বাঁচাইবে, না আমাদের ধরিবে!

এই সময় মুন্না একটা ঘোড়ায় চড়িয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

সদা। কি খবর মুন্না?

মুন্না। সাহেবকে উদ্ধার করিয়া তাহার কাছে এই বক্‌সিস্ আনিয়াছি।

এই বলিয়া মুন্না একটা পিস্তল দেখাইল; এবং ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। তুলসীর হস্তে খাদ্য দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"ভাইটী ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে, আগে হইতেই বুঝিয়া কি আহার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছ? দিদি! অতি পরিশ্রমে আমি ক্ষুধার্ত্ত।"

এই বলিয়া তুলসীর হাত হইতে থালা লইয়া মুন্না ভোজনে প্রবৃত্ত হইল—আদেশের অপেক্ষা রাখিল না।

তুলসী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। মুন্না বলিল—"দেখি-তেছ কি! আর মাস খানেকের মধ্যে এখানে কাহাকেও আসিতে হইবে না। বার কতক যে জল খাওয়াইয়াছি, তাহার ধাক্কা সামলাইতে সাহেবের মাস খানেক লাগিবে।

সদা। সবাই ফিরিয়াছে?

মুন্না। কেবল মুকুন্দ, আর চারিজন সিপাহী ফিরে নাই। আমি তাহাদের সন্ধানে চলিলাম।

মুন্না প্রস্থান করিল।

সদা। আর কেন তুলসী ঘরে চল।

তুলসী। আমি যে এক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি—রাণী মা, ও নারায়ণীকে বনে পাঠাইয়াছি!

সদা। তাহাদের উদ্ধার করিতে লোকও ত নিযুক্ত করিয়াছ। তোমার অঙ্গুলি নিঃসৃত রক্তমসী আমার দৃষ্টিতে সূর্য্যদেবকেও রক্তিমাভ করিয়াছিল।

তুলসী মৃদু হাসিয়া স্বামীকে একটা প্রণাম করিল—"তবে এস, দেব অতিথি ঘরে এস।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

তুলসীর কাছে বিদায় লইয়া মুন্না, সাহেবও তাহার অনুচর দিগের ক্রিয়া কলাপ দেখিবার জন্য, সদাশিবের সঙ্গে বনমধ্যস্থ এক দুরভিগম্য নিভৃত স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল। তিনটী অসহায়া স্ত্রীলোককে বিপদে ফেলিয়া, কাপুরুষের মত নিজের প্রাণ বাঁচাইতে তাহারা পলায় নাই।

সময়ে অসময়ে সুবর্ণরেখা পার হইবার জন্য রাজার গৃহে এক কাষ্ঠের ভেলা থাকিত। তাহারা দেখিল, তুলসী সেই ভেলার সাহায্যে একে একে রাণী, নারায়ণী ও একজন সাহেবকে পার করিল। গ্রীড্ সাহেবের ছাদে ওঠা, দূরবীক্ষণ সাহায্যে চারিদিক দর্শন, তুলসীর পত্র লিখিয়া ব্রাউনের হস্তে দান—এ সমস্তই তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। কেবল বাড়ীর অন্তরালে ছিল বলিয়া, মুকুন্দ ও তৎসহচর দিগকে তাহারা বহুক্ষণ দেখিতে পায় নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিল, তাহারা সকলে বাড়ী হইতে প্রায় পোয়া খানেক পথ দক্ষিণে সুবর্ণরেখা পার হইতেছে।

কয় দিনের বৃষ্টিতে সুবর্ণরেখার জল বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে স্রোতও বাড়িয়াছিল। সুতরাং সহজেই কেহ পার হইতে পারিতেছিল না।

তথাপি সাহেবের আদেশে অনুচরবর্গ অতিকষ্টে নদীপার হইল। বাকী রহিল সাহেব ও মুকুন্দ। সাহেবের ঘোড়া কিছুতেই জলে পা দিল না। মুকুন্দেরও তাই। সাহেবের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য, মুকুন্দ ঘোড়া ছাড়িয়া নদীতে পড়িল। মুকুন্দ ভাল সাঁতার জানিত। তথাপি নদীবেগে প্রায় শত হস্ত দূরে গিয়া পারে উঠিল। সাহেব তাহাকে চারি-জন সিপাহী লইয়া রমণীদ্বয়ের অনুসরণে আদেশ করিল। বলিল—"তুমি অগ্রে যাও, আমি এখনি তোমার সঙ্গে যাইতেছি।"

কিন্তু সাহেব আর পার হইবার সুবিধা পাইতেছিল না। তিনি এ পারে, আর সহচরগণ ওপারে। আধ ঘণ্টা ধরিয়া কেবল পারের চেষ্টা চলিতে লাগিল।

মুন্না সদাশিবকে বলিল,—হুজুর! ক্ষণেক অপেক্ষা করুন। আমি সাহেবকে লইয়া একটু আমোদ করিয়া আসি। আপ-নাকে সকলে চিনে। আমি বহুরূপী আমায় ত কেহ চিনে না। সুতরাং আমোদ করিবার এমন সুবিধা আমি ত্যাগ করিব না।

সদাশিব প্রথমে নিষেধ করিল। বলিল—"যদি সাহেব সন্দেহ করে?"

মুন্না। করিলে ক্ষতি কি! সাহেব এ পারে একা। সঙ্গীরা নদীপার হইয়া ফিরিতে না ফিরিতে, সাহেবকে সুবর্ণরেখার আধ মণ জল খাওয়াইয়া পলাইব।

সদা। সাহেবের জামার পকেটে পিস্তল আছে।

মুন্না। পকেটে হাত দিয়া পিস্তল বাহির করিতে না করিতে, একটী 'পাপড়া' ছুঁড়িয়া দুব হইতেই হাত খানিকে অবশ করিয়া দিব।

এই বলিয়া মুন্না বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী কাষ্ঠখণ্ড দেখাইয়া নিভৃত স্থানত্যাগ করিল; এবং ভেলাটা অপহরণ করিয়া ভাসাইয়া সাহেবের কাছে উপস্থিত হইল। এক লম্বা সেলাম করিয়া বলিল—"সাহেব! অনুমতি করেন ত এই ভেলার সাহায্যে আপনাকে পার করি।"

গ্রীড্ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। মুন্না কাষ্ঠ ব্যবসায়ী বলিয়া আপনার পরিচয় দিল। বলিল—"দুর্য্যোগে অনেক গাছ ভূমিসাৎ হইয়া নদীতে পড়িয়া ভাসিয়া যায়। আমি তাই সংগ্রহ করিতে আসিয়াছি।"

সাহেবের বিশ্বাস হইল। সে তাহাকে পার করিতে আদেশ করিল।

প্রথমে সে ঘোড়ার পৃষ্ঠে চড়িয়া, তাহাকে নদীতে ফেলিল, এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই পারে রাখিয়া আসিল। সাহেবের সহচরবর্গ বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিল।

ফিরিয়া মুন্না সাহেবকে ভেলার উপরে চড়াইল, এবং নিজে এক হাতে ভেলা ধরিয়া সাঁতারিয়া সাহেবকে পারে লইয়া চলিল।

নদীর মাঝখানে কৌশলে সে ভেলা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল। সাহেব নদীতে পড়িয়া গেল। মুন্না তাহাকে ধরিয়া ভাসাইয়া বহুদূর লইয়া গেল। সিপাহীরা কেবল "খবরদার খবরদার" চীৎকার করিতে করিতে তীরাবলম্বনে ছুটিল। জলে নামিয়া সাহেবকে উদ্ধার করিতে কাহারও সাহস হইল না।

সবার অলক্ষ্যে সাহেবকে এক নিভৃত কূলে তুলিয়া মুন্না সাহেবের কাছে পরিশ্রমের পারিতোষিক চাহিল। জলে পড়িয়া সাহেবের কিন্তু মুন্নার উপর ক্রোধ হইয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস এই বর্ব্বর কোন একটা বিশ্বাস-ঘাতক ভেলায় তুলিয়া তাঁহাকে অনুচরবর্গের সম্মুখে লজ্জিত করিয়াছে। অন্য সময় হইলে, মুন্নার পৃষ্ঠদেশের কতকগুলি রক্তরেখা সাহেবের পুরস্কারের সাক্ষ্য প্রদান করিত। কিন্তু সাহেব জীবনের ভয়ে, অত্যন্ত পরিশ্রমে, ও কতকটা জলপানে একেবারে নির্ব্বীর্য্য মৃত-প্রায় হইয়াছিল। সুতরাং সে সময় পুরস্কার দেওয়াটা সে যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল না। বলিল—"সহরে আমার বাংলায় যাইও, সেখানে তোমাকে পুরস্কার দিব।

"আমার এত দেরি সহিবে না," বলিয়া মুন্না সাহেবের বুকের পকেট হইতে একটী রিভলভার পিস্তল বাহির করিয়া লইল।

তখন সাহেব বুঝিল, এ দীন কাষ্ঠ ব্যবসায়ী নয়। হয় দস্যু. নয় রাজা বীরচন্দ্রের কোন শক্তিমান অনুচর। অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাহার উপর একা—মুন্নার পিস্তল গ্রহণে সাহেব আর দ্বিরুক্তি করিল না।

যাইবার সময় মুন্না বলিল—"সাহেব! আমি যদি তোমায়

সুবর্ণরেখার জলে ডুবাইয়া মারিতাম, তাহা হইলে রক্ষা করিত কে? যে হতভাগারা তোমার হুকুমে তাহাদের ভাইদের গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে, তুমি ত নিজেই বুঝ সাহেব, তাহাদের মত বোকা পৃথিবীতে আর নাই। তাহাদের চক্ষে ধূলি দিতে কতক্ষণ!”

গ্রীড্। তুমি কে?

মুন্না। মুন্নার নাম শুনিয়াছ?

গ্রীড্। সেই তুমি!

মুন্না। সেই আর কেমন করিয়া বলিব, সেই থাকিলে কি আমার চোখের উপর একজন নিরীহ ব্রাহ্মণকে জেলে দিতে পারিতে! সংসারের যে কোনও ধার ধারে না, একটী সামান্য পিপীলিকাটীর গায়ে হাত তুলিতে কাতর হয়—যদি সেই মুন্না থাকিতাম, তাহা হইলে কি তার শাস্তি দাঁড়াইয়া দেখিতে পারিতাম। মুন্না বহুকাল মরিয়াছে, আমি তাহার নাম লইয়া আছি।

গ্রীড্। তাই কি এখন প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছ?

মুন্না। এখন! কার উপর প্রতিশোধ লইব? তুমি ত মরা। মরার উপর মুন্না কখনও অস্ত্রাঘাত করে না। প্রতিশোধ লইতাম তখন। পঞ্চাশ কামানের মুখের আগুনে তোমাদের ছোটনাগপুরের বাস জন্মের মতন ভস্ম করিয়া দিতাম। সামান্য দুই একজন অস্ত্রহীনকে মারিয়া তোমাদের আর বীরত্বের গর্ব্ব করিতে হইত না। কি বলিব! দেবতা তোমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া অধিকার দিয়াছেন। একদিনে আমার পঞ্চাশ বৎসরের সঞ্চিত শক্তি পেটে পুরিয়াছেন।

বলিতে বলিতে মুন্না স্থানত্যাগ করিল। সাহেব অবাক হইয়া বসিয়া রহিল। ভাবিল,—বর্ব্বরটা বলিল কি! এ সকল কথার কি অর্থ আছে!

অল্পক্ষণ পরেই রূপ সিং ও তার সহচরবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। দুর্ব্বল গ্রীড্ সে দিনকার মত বিদ্রোহীর অনুসন্ধানে ক্ষান্ত দিয়া প্রসাদপুরে ফিরিয়া চলিলেন। মুন্না সম্বন্ধে কোনও কথা তিনি তাহাদের কাছে প্রকাশ করিলেন না।

যে লোকটা দ্বার জুড়িয়া বসিয়াছিল, সে সঙ্গীদের কোলাহল শুনিয়া আগে হইতেই নদীতীরে ছুটিয়াছিল। সেও দলের সঙ্গে যোগ দিল; তুলসীর আতিথ্য গ্রহণ তাহার ভাগ্যে ঘটিল না।

কেবল মুকুন্দ ও তাহার চারিজন সঙ্গী বনে পড়িয়া রহিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পুলীশের ভয়ে ঘর হইতে পলাইয়া আসিয়া, রাণী মধুমতী ও নারায়ণী, তুলসীর আদেশ মত পার্ব্বতীয় পথ ধরিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। কথা আছে তুলসী আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিবে। বেলা দ্বিপ্রহর হইল, তবুও তুলসী আসিয়া পঁহুছিতে পারিল না। তাহার না আসা পর্য্যন্ত পথে বিশ্রাম করিতে তাহাদের উপর তুলসীর আদেশ ছিল। কিন্তু ভয়বিহ্বলা মধুমতী নারায়ণীকে এক দণ্ডের জন্যও পথে বসিতে দেন নাই।

এখন আর কাহারও পা চলে না। এত পথ হাঁটিয়া আসা উভয়ের জীবনেই এই প্রথম। তাহাতে পথ সমতল নয়—সে পথে চলিতে হইলে অবিরত উঠা নামা করিতে হয়। পথ শুধু দুর্গম নয়, ভীষণ—ছোটনাগপুরের বাঘ ভালুক ভরা অরণ্য ভেদ করিয়া, নিয়তির ন্যায় দুর্গম অন্ধকারে যাইয়া মিশিয়াছে।

যে স্থলে তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার দুই ধারে প্রায় শত হস্ত পরিমিত উচ্চ, সমশীর্ষ, দূরব্যাপী শৈলরেখা। তাহা আবার কেবল এক বর্ণের এক জাতীয় বৃক্ষদ্বারা সমাচ্ছাদিত। দূর হইতে দেখিতে সুন্দর, চিত্রপটে তুলিতে বড়ই মনোহর, কিন্তু সে পথের পথিকের চক্ষে সে যে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাহা কল্পনায় আসে না।

সেই ভীষণ জঙ্গলের মধ্য দিয়া সপ্ততিবর্ষীয়া বৃদ্ধা মহারাণী নাতিনীকে সঙ্গে লইয়া চলিয়াছেন। ইচ্ছা জোরে চলেন, কিন্তু সেই পাথুরে পথের অনভ্যস্ত চরণ তাহাদের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতেছিল না। চলিতে চলিতে নারায়ণী এক একবার পিছাইয়া পড়িতেছিল। ধরা পড়িবার ভয়ে বৃদ্ধা অনিচ্ছায় তাহাকে মাঝে মাঝে তিরস্কার করিয়া অগ্রসর করিতেছিলেন।

মাঝে মাঝে নারায়ণীর পায়ে কাঁকর ফুটিতেছিল। একবার মাত্র ভ্রূর আকুঞ্চনে যন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া, একটীবার মাত্র দাঁড়াইয়া, সে আবার নাগাল ধরিতেছিল। একবার পারিল না। সে বারে বুঝি বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল!

চলিতে চলিতে রাণী ফিরিয়া দেখিলেন, নারায়ণী বায়ু-তাড়িতা করবীর ন্যায় পতনোন্মুখী। ছুটিয়া আসিয়া রাণী

তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। নারায়ণী বলিল—"মা বসিবার স্থান দেখ, আর আমি চলিতে পারি না।"

কিন্তু এরূপ পথের মাঝেই যদি বসিতে হয়, তাহা হইলে এতটা পথ অগ্রসর হইয়া তাহাদের লাভ কি হইল? ধরা পড়িবার ভয় ত ঘুচিল না! রাণী নারায়ণীকে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিলেন। নিজের কত শারীরিক বলের পরিচয় দিলেন। কত দিন উপবাসে কত পরিশ্রমের কাযা করিয়াছেন শুনাইলেন, পুলীশের ভয় দেখাইলেন, বাঘের ভয় দেখাইলেন, তথাপি নারায়ণী চলিতে স্বীকৃত হইল না। অগত্যা রাণীকে বিশ্রাম স্থান অন্বেষণে বাধ্য হইতে হইল।

এতক্ষণ রাণী নারায়ণী-রক্ষার একান্ত কামনায় জ্ঞানশূন্যের ন্যায় পথ চলিতেছিলেন। এই এতক্ষণের মধ্যে এক সময়ের জন্য তিনি পথের ভীষণতা অনুভব করিতে পারেন নাই। এইবারে সময় আসিল। আশ্রয় খুঁজিতে তিনি একবার বামে চাহিলেন। তখন মহারণ্যের প্রকৃত-মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে পড়িল। দক্ষিণে চাহিলেন, দেখিলেন বাম দিকের মত পর্ব্বত পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, স্তরে স্তরে উত্থিত সহস্র সহস্র শালতরু গগনমার্গ ভেদ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে কচিৎ বিরল তরুরাজির মধ্য দিয়া পর্ব্বতের ধূসর গাত্র দেখা যাইতে লাগিল। বৃদ্ধা দেখিলেন, সে মূর্ত্তি কি ভীষণ!

স্বকীয় প্রাসাদের ত্রিতল ছাদোপরি বসিয়া বৃদ্ধা নিত্যই এই মহারণ্যের মূর্ত্তি দেখিতেন। একা দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না বলিয়া, আত্মীয়দিগকে দেখাইতেন। সে মনোরম দৃশ্যের মনোহারিত্ব তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে কিনা

সন্দেহ করিয়া, মহারাণী এই নৈসর্গিক চিত্রপটের এক এক অঙ্গ দেখাইয়া তাহাদের চোখ খুলিয়া দিতেন। তরুণ বয়সে পৌর্ণমাসী রজনীর প্রস্ফুটিত চন্দ্রলোকে পুত্রকে কোলে করিয়া চাঁদ দেখাইতেন, আর সেই ফুটন্ত জ্যোছনায় উদ্ভাসিত দিগন্তস্পর্শী শালবন দেখাইয়া. পুত্রকে হাসাইতেন, আপনিও হাসিতেন। সম্বোধনে উত্তর না পাইয়া, কত দিন সৌন্দর্য্য-বিমুগ্ধা আত্ম-বিস্মৃতা মহিষীর অন্যমনস্কতা ভঙ্গ করিতে মহারাজ বীরচন্দ্রকে উপরে আসিতে হইয়াছে। কতবার বৃদ্ধা মহারাণী রোরুদ্যমানা নাতিনীকে এই হরিৎ সাগরে ফেলিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া ম্লানমুখে হাসির সঞ্চার করিয়াছেন। কিন্তু স্বপ্নেও জানিতেন না, সেই মনোহারিত্বের সন্নিকট এত ভীষণ!

সুষুপ্ত ভয় রাশি সহসা জাগরিত হইয়া, তাহার বক্ষ আলোড়ন করিয়া তুলিল। নারায়ণী পিতামহীর এক দৃষ্টে অরণ্য পরিদর্শন নিরীক্ষণ করিয়া ও তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিল যে. এইবারে বৃদ্ধার ভয় জন্মিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—

"কি দেখিতেছ মা?"

রাণী। এ কোথায় আসিলাম নারায়ণী?

নারায়ণী। তুমি এখন দেখিলে, আমি অনেকক্ষণ হইতে দেখিয়া আসিতেছি।

রাণী। আগে কেন বলিলি না!

নারায়ণী। বলিতে দিলে কই!

রাণী! তুলসী করিল কি!

নারায়ণী। সে আর কি করিবে! তার কি হইল জিজ্ঞাসা কর। হয় আমরা পথ ভুলিয়াছি, নয় দিদি আমার পুলীশের

কাছে আবদ্ধ। মা এমন অভাগ্য আমরা, নিজেও মজিলাম, অপরকেও মজাইলাম!

রাণী দেখিলেন জগৎ অন্ধকার। তুলসী যে বিপন্না হইবে, এ কথা এক সময়ের জন্যও তাহার মনে জাগে নাই। সেই বালিকা মূর্ত্তিতে মায়াময়ী দেবী সাধ করিয়া তাহাদের সুখের ভাগ লইতে আসিয়া বিপদে পড়িবে! সে যদি না আসিল, তাহা হইলে এতটা পথ আসিয়া তাহাদের লাভ হইল কি পূর্ব্ব দিবস-ত্রয় রাণী এক রূপ অর্দ্ধাশনে দিনযাপন করিয়াছিলেন, তথাপি দুর্ব্বলতা তাঁহাকে এতক্ষণ স্পর্শও করিতে পারে নাই। নারায়ণীর শেষ কথায় সহসা কে যেন তাঁর বল অপহরণ করিয়া লইল। পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল, হাতের স্থানে স্থানে খিল ধরিল। কণ্ঠ তালু শুষ্ক, হৃদয় মরুভূমিবৎ নীরস! কথা কহিবার পর্য্যন্ত শক্তি রহিল না! সম্মুখে চাহিলেন, দেখিলেন পার্ব্বতীয় পথ পূর্ব্ব হইতে ক্রমনিম্ন হইয়া ঠিক যেন একটু একটু করিয়া সমুদ্র গর্ভে প্রবেশ করিতেছে। আকাশের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন সূর্য্য চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পর্ব্বতের অন্তরালে পড়িলেই অন্ধকারে সমস্ত পথ ছাইয়া যাইবে। এখনও ফিরিতে পারিলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ীতে ফিরিতে পারা যায়, কিন্তু পশ্চাতে চড়াই—ফিরে কে? দ্বিপ্রহর পার হইয়া গেল, তথাপি নারায়ণী মুখে জল দেয় নাই। অনাহারে এতটা চড়াই পথে উঠিলে, আর কি সে প্রাণ টিকিবে! ফিরিবার কথা ভাবিতে বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিলেন। পর্য্যাটন ক্ষমতার অতীত হইয়া গিয়াছে, বসিতেই হইবে। কিন্তু হায় কোথায় বসিবে।

রাণী। বসিবার স্থান কোথায় দিদি!

নারায়ণী। চারিদিকে বৃক্ষের আবরণ, স্থানের অভাব কি! বিধাতা আমাদিগকে বাসের যোগ্য স্থানে আনিয়া দিয়াছেন।

রাণী। তাতো দিয়াছেন। কিন্তু এরূপ স্থানে আশ্রয় লইলে, আর ঘরে ফিরিতে পারিবি কি!

নারায়ণী। আর ফিরিবারই বা প্রয়োজন কি! বাঘেই খাক্, কি পুলীশেই লইয়া যাক্, আমি বসিব।

পথে আসিতে আসিতে, নারায়ণী একটী পার্ব্বত্য নির্ঝরের ধারে একটী বিশ্রাম যোগ্য স্থান দেখিয়াছিল। পিতামহীকে সেই স্থানে লইয়া চলিল। রাণী দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার সঙ্গে চলিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নির্ঝর সমীপে শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া নারায়ণী রাণীকে বলিল—"মা! বিধাতা আমাদের জন্য এখন এই বাস স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর বোধ হয় আমাদের এ স্থানত্যাগ করিতে হইবে না।"

রাণী কোনও উত্তর করিলেন না। কথা কহিবার আর তাঁর সাধ্য ছিল না। তিনি সতৃষ্ণ নয়নে পথের দিকে চাহিয়া তুলসীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ তার এই অবস্থায় কাটিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে নারায়ণীর দিকে ফিরিয়া দেখেন, সে এক দৃষ্টে নির্ঝরের পানে চাহিয়া আছে। রাণী মনে করিলেন, বুঝি নারায়ণী পিপাসিতা। বলিলেন—"তুই

একেলা এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিবি? আমি শাল পাতের ঠোঙা করিয়া জল আনি।"

নারায়ণী উত্তর দিল না। সে নির্ঝরের পারে কি দেখিতে-ছিল। রাণী তাহার গা ঠেলিলেন। তখন নারায়ণী বলিল— "মা! ওই দূর হইতে কাহারা আমাদের দেখিতেছে।"

"তা' হইলে উপায়?"

"আমি একটু এইখানে শুই।" এই বলিয়া নারায়ণী পিতামহীর উরুতে মাথা রাখিয়া শয়ন করিল।

"এখানে কোথায় শুইলি নারায়ণী!"

আর নারায়ণী! তাহার চোখ বুজিয়া আসিল। রাণী তাহাকে স্থানের বিভীষিকার কথা শুনাইলেন, নারায়ণী চোখ মেলিল না। বৃদ্ধা দেখিলেন, নিদ্রায় সে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। তুলিতে আর তাঁর প্রাণ চাহিল না। "তবে ঘুমা। অদৃষ্টে এ হইতে আর কি অধিক দুঃখ হইতে পারে। তবে ভগবান ক্ষণেকের জন্য যদি তোর এই শান্তির বিধান করিয়া থাকেন, যতক্ষণ পারিস্ তাহা সম্ভোগ কর্।" এই বলিয়া তিনি, নির্ঝরের দিকে নারায়ণী কি দেখিয়াছে, দেখিবার চেষ্টা করিলেন। কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

বসিয়া থাকিতে থাকিতে, সম্পদের ছবিগুলি জীবন্ত হইয়া একটী একটী করিয়া তাঁহার চোখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। পুত্র রামচন্দ্র, পুত্রবধূ, স্বামী, স্বামীর সুখের সহচর বন্ধু ভৃত্য সৈন্য সামন্ত, একবার করিয়া তাহার চোখের উপর উপস্থিত হইয়া মিলাইয়া গেল। ঐশ্বর্য্য সম্ভোগে বঞ্চিত, শত্রু বিমর্দ্দিত মহারাজের শ্রীহীন মূর্ত্তি, কারাবাসে নিষ্পীড়িত দেব-হৃদয়

ব্রাহ্মণের সহিত যুগপৎ হৃদয়ে জাগিয়া, রাণীকে অস্থির করিয়া তুলিল। মনের আবেগে বৃদ্ধা একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

এমন সময়ে পার্শ্বস্থ জঙ্গলের ভিতর হইতে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর শব্দ উত্থিত হইল। সভয়ে রাণী চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন; নারায়ণীকে উঠাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নারায়ণী উঠিতে না উঠিতে চারিজন ভীমকায় প্রহরী তাহাদিগকে বেষ্টিত করিল। সঙ্গে মুকুন্দ।

মুকুন্দকে দেখিয়া রাণী বলিলেন—"কি মুকুন্দ! আমাদের বনবাসিনী করিয়াও কি তোমাদের পিতাপুত্রের তৃপ্তি হইল না। তাই এই গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে আসিয়াছ!"

রাণীর অবস্থা দেখিয়া, তাহার কথা শুনিয়াও মুকুন্দ কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। নরাধম উত্তর করিল—"তোমরা নিজেই আপনাদের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছ। আমার পিতা তোমাদের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। তার পুরস্কার স্বরূপ তোমার স্বামী তার সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছিল। হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর সর্ব্বনাশ করিতে গিয়া, মূর্খ রাজা আপনারই সর্ব্বনাশ করিয়াছে; তোমাদেরও এই দশায় আনিয়াছে।

রাণী বুঝিলেন, অধিক কথা কহিলে, এ নরাধমের কাছে মর্য্যাদা থাকিবে না। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি করিতে চাও?"

মুকুন্দ। বীরচন্দ্র সাহীদেবের সমস্ত সম্পত্তি সরকার

বাহাদুরের প্রাপ্য। তোমরা তাঁহাদের হার অপহরণ করিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছ।

রাণী। হার আমাদের কাছে আছে, এ কথা তোমাকে কে বলিল ?

মুকুন্দ। বলিবে কে ? আমরা সন্ধানে জানিয়াছি। বিদ্রোহী সদাশিব কাল আসিয়া হার গাছটী তোমাদের দিয়া গিয়াছে।

রাণী। যদি না দিই।

মুকুন্দ প্রহরীদের দেখাইয়া বলিল—"ইহারা আদায় করিবে।"

রাণী। আমি দিব না। উহারা আদায় করুক।

প্রহরীরা যে হার আদায় করিতে রাণীর উপর বল প্রয়োগ করে, এ সাহস তাহাদের ছিল না। তাহারা অনন্তপুরেশ্বরীর মর্য্যাদা বুঝিত। মুকুন্দ হার ছড়াটা লইতে, তাহাদের মধ্যে একজনের উপর ইঙ্গিতে যেই আদেশ করিল, অমনি সে বলিল—"হুজুর! গ্রহণ করিতে হয় আপনি করুন। আমি রাণীজীর গায়ে হাত দিতে পারিব না।

আর একজন বলিল—"সাহেব হার লইতে আপনার উপর আদেশ দিয়াছেন। আমাদের দিয়া রাণীর অমর্য্যাদা করিতে তাঁর সাহস হয় নাই।"

তৃতীয় বলিল—"আপনি বনের মধ্যে বিপদে পড়িলে, আমরা আপনাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছি।"

চতুর্থ রাণীর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া জানু অবনত করিল, আর বলিল—"রাণীজী মায়া! হার ছড়াটা ফেলিয়া দিন। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, স্বামী, পুত্র, সমস্ত হারাইয়া তুচ্ছ এক ছড়া হারে লোভ রাখিয়াছেন কেন মা! সরকার বাহাদুর যখন সন্ধান

পাইয়াছে, তখন আর কিছুতেই তাহা আপনি রক্ষা করিতে পারিবেন না।

রাণী উত্তর করিলেন—"তুমি বাপ্ ঠিক বলিয়াছ। হার রাখিব না, তোমাদেরই দিব। ক্ষণেক অপেক্ষা কর।"—এই বলিয়া নারায়ণীকে জাগাইলেন।

নিদ্রার কোলে মাথা রাখিয়া নারায়ণী কিয়ৎক্ষণের জন্য সকল দুঃখই ভুলিয়াছিল। সুতরাং জাগিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় ফিরিতে, তার কিছু বিলম্ব হইতেছিল।

মুকুন্দের বিলম্ব সহিতেছিল না। রাত্রির চপেটাঘাতের ব্যথাটা তখনও তাহার স্কন্ধ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বন হইতে বাহির না হইতে পারিলে, কত কি বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। গণ্ডদেশ কত চপেটাঘাতের আস্বাদ অনুভব করিতে পারে, তার সংখ্যা কি! বিলম্বে বিপদের আশঙ্কায় মুকুন্দ রাণীকে বলিল—

"আমাদের বিদায় করিয়া নাতিনীকে ঢুলিতে বল।"

রাণী আবার ডাকিলেন—"নারায়ণী!"

নারায়ণী অপর দিকে মুখ করিয়াছিল। উঠিয়া মুকুন্দ কিম্বা তৎসহচরদের দেখিতে পায় নাই। পিতামহীর কথা শুনিয়া পশ্চাতে না ফিরিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—

"কাহারা দেখিতেছিল, জানিতে পারিলে কি মা!"

রাণী। জানিয়াছি, তাঁহারা তোমারই পিছনে দাঁড়াইয়া।

নারায়ণী ফিরিয়া বসিল। অমনি সম্মুখে মুকুন্দকে দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার ন্যায়, অনাবৃত অঙ্গ ব্যস্ততার সহিত আবৃত করিতে লাগিল।

মুকুন্দ বহুকাল নারায়ণীকে দেখে নাই। রাজা তাহার হস্তে নারায়ণীকে সমর্পণ করে নাই, নারায়ণীও আত্ম সমর্পণ করিতে ব্যস্ততা দেখায় নাই, এই সকল কারণে মুকুন্দ নারায়ণীকে দেখিতে পাইলে দুই কথা শুনাইবে মনে করিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া তাহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তখন যাহাকে বালিকা দেখিয়াছিল, এখন সে রূপের তরঙ্গ লইয়া পূর্ণাবয়বা সুন্দরী! মুকুন্দ সেরূপ দেখিয়া প্রথমে কোনও কহিতে পারিল না।

মুকুন্দকে দেখিয়াই নারায়ণী বুঝিল, সে হার ছড়াটী লইতে আসিয়াছে। কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া বলিল—

"কি মুকুন্দ! আমি কেমন আছি দেখিতে আসিয়াছ?

মুকুন্দ। আমাকে তিরস্কার করা বৃথা। তোমার বুদ্ধিহীন পিতামহ তোমাকে এই দশায় উপস্থিত করিয়াছেন।

নারায়ণী। তাই বুঝি তোমার বুদ্ধিমান পিতা, তার বুদ্ধিমান পুত্রকে আমার উদ্ধারের জন্য বনে পাঠাইয়াছেন!

মুকুন্দ। ক্রোধ করিয়া যা বল, আমার হাতে পড়িলে, তুমি আজ প্রসাদপুরের রাণী হইতে।

নারায়ণী। আমার বড় ভাগ্য যে তাহা হই নাই। তোমার হাতে পড়ার চেয়ে বনবাসিনী হওয়া শ্রেয়স্কর।

রাণী নারায়ণীকে কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার ভয়, পাছে ক্রুদ্ধ মুকুন্দ তাহার অপমান করিয়া বসে।

মুকুন্দ তথাপি ক্রোধ করিল না। নারায়ণীর অভাবে সে আপনার ঐশ্বর্য্য অসম্পূর্ণ বোধ করিল। নারায়ণীকে সে অবিবাহিতাই জানিত। মনে করিল, নারায়ণী অভিমানে

তাহাকে তিরস্কার করিতেছে। রাণীর কথায় তাহার আর একটু প্রত্যয় হইল। মিষ্টবাক্যে বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আপনি যদি এখনও নারায়ণীকে আমার হাতে সমর্পণ করেন—

"চুপকর্ নরাধম! ভগবান আমাকে দেবতা স্বামীর হাতে সমর্পণ করিয়াছেন।" এই বলিয়া ক্রুদ্ধা নারায়ণী দাঁড়াইয়া পিতামহীর হাত ধরিল—"আয় মা! এ স্থান হইতে চলিয়া যাই। এ পিশাচের মুখ দেখিলে পাপ হয়।"

নারায়ণী জ্ঞানশূন্যের মত পিতামহীকে টানিয়া লইয়া চলিল। মুকুন্দ দেখিল, সব যায়। নারায়ণী ত হস্তচ্যুত হইয়া কোন অজ্ঞাত হস্তে পড়িয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে হার যায়। থাকিবে শুধু সাহেবের কাছে তিরস্কার! এক রমণীর নিকট হইতে হার লইতে যদি মুকুন্দ অপারগ, তাহার হাতে জায়গীর দিলে সে রাখিতে পারিবে কেন! মুকুন্দ শুধু এই টুকু বুঝিল যে, শুধু হাতে ফিরিলে, সাহেব নিশ্চয় তাহাদের প্রদত্ত জায়গীর কাড়িয়া লইবে।

এই ভাবিয়া মুকুন্দ আবার নারায়ণীর অভিমুখে ছুটিল। সিপাহীরা মুকুন্দের কাছে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

নারায়ণী যে দিকে চলিতেছিল, সে দিকে আর পথ ছিল না। উভয়ে এমন স্থানে উপস্থিত হইল যে, সে স্থান হইতে আর এক পদ অগ্রসর হইলে, একেবারে পাঁচ সাত হাত নীচে পড়িতে হয়। সে স্থানটী পূর্ব্বকথিত পার্ব্বত্য নির্ঝরের তীর ভূমি। পাঁচ সাত হাত নিম্নে ঘর্ঘর প্রদেশে কল কল করিয়া নির্ঝর জল ক্রম-নিম্ন ভূমির দিকে বহিয়া চলিতেছে।

রাণী। এ কোথায় আসিলি নারায়ণী?

নারায়ণী। ঠিক স্থানেই ত আসিয়াছি মা! পড়িয়া মরিতে পারিলেই ত আমরা নিশ্চিন্ত। মা! বড় অপমান! বাঁচিয়া আর আমাদের সুখ নাই।

রাণী। মরিতে পারিলে ত বাঁচি। কিন্তু হিঁদুর মেয়ে আত্মহত্যা করিয়া ত মরিতে পারি না। ভোগের শেষ হয়, এই জন্মেই হউক, আবার জন্মান্তরের জন্য রাখা কেন? উহারা আসিতেছে, হার ফেলিয়া দে।

নারায়ণী। প্রাণ থাকিতে দিব না। উহারা কেমন করিয়া লইতে পারে দেখিব।

এই সময়ে সানুচর মুকুন্দ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল—"হার না দিয়া কোথায় যাইতেছ?"

("Hold! wretch! a step more and you are a dead man.") "খবরদার আর এক পদও অগ্রসর হইয়ো না। এক পদ অগ্রসর হইলেই মৃত্যু।" বনমধ্য হইতে এই অশ্রুত পূর্ব্বস্বর উত্থিত হইল। সকলে ফিরিয়া দেখিল—এক সাহেব! ভয়ে বিস্ময়ে নীচে নামিবার ব্যস্ততায় রাণীর পদস্খলন হইল। তিনি একেবারে সাত হাত নীচে পড়িয়া গেলেন। নারায়ণী সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিল।

মুকুন্দও তৎসহচরবর্গ দারুণ ভয়ে অভিভূত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সে স্থান ত্যাগ করিল। পাঠককে বলিতে হইবে না, সাহেব কে? ব্রাউন সুবর্ণরেখার তীর ধরিয়া ছুটিয়া, অবশেষে বন আতিপাতি করিয়া বহুকষ্টে রাণী ও নারায়ণীর সন্ধান পাইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নারায়ণী ডাকিল—"মা!" রাণী চক্ষু মুদিয়া, ভূমির দিকে মুখ করিয়া পড়িয়া—উত্তর দিলেন না। নারায়ণী আবার ডাকিল—"মা!"—উত্তর পাইল না। গা ঠেলিল—"এ কোথায় শুইলি মা!"

বার দুই তিন ঠেলিয়া যখন দেখিল মা উঠিল না, তখন নির্ঝরিণী হইতে অঞ্জলি, ভরিয়া জল আনিয়া, বার কয়েক পিতামহীর মুখে দিল। পিতামহী সংজ্ঞার চিহ্ন মাত্রও দেখাইল না।

নারায়ণী তখন বুঝিল, পিতামহী আর মানুষের আহ্বানে উত্তর দিবে না। তখন তাঁহাকে কোলে তুলিয়া নীরবে অশ্রুজলে তাঁহার দেহ সিক্ত করিতে লাগিল।

মুকুন্দও তৎসহচরগণকে দূরীভূত করিয়া, ব্রাউন নারায়ণীর অন্বেষণে নির্ঝর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সে পিতামহীর বুকে মুখ রাখিয়া বসিয়া আছে। মুক্ত দীর্ঘ-কেশরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। রাণী ভূপতিতা। তাঁহার অবস্থাও নারায়ণীর কার্য্য, ব্রাউন দূর হইতে ভাল বুঝিতে পারিলেন না। মর্য্যাদা হানির ভয়ে, দূর হইতেই তিনি সম্বোধন করিলেন—"রাজকুমারী!"

নারায়ণী মাথা তুলিয়া দেখিল, একজন সাহেব। সে কোনও উত্তর করিল না। গলা হইতে হার ছড়াটা খুলিল। এবং নির্ঝরিণী লক্ষ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিল। হার জলে পড়িল না। জল সন্নিহিত একটা বালুকাস্তূপে পতিত হইল। ব্রাউন তাহার

মনের ভাব বুঝিলেন। হার ছড়াটা কুড়াইয়া আনিলেন; এবং নারায়ণীর নিকটে গিয়া, ভূমিতে রাখিয়া বলিলেন— "আমি হার লইতে আসি নাই। যাহারা লইতে আসিয়াছিল, সেই নরাধমদের দূর করিয়া দিয়াছি।"

নারায়ণী বিস্মিত হইল। "এও কি সম্ভব! না, আমাকে নিঃসহায় ও দুরবস্থাপন্ন দেখিয়া দুষ্ট রহস্য করিতেছে! "জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে?"

ব্রাউন তুলসী কর্তৃক লিখিত বৃক্ষপত্র নারায়ণীর হাতে দিতে গেলেন।

নারায়ণী পত্র ভূমিতে রাখিবার ইঙ্গিত করিল। পত্র পাঠান্তে একবার ব্রাউনের মুখ পানে চাহিল।

ব্রাউন। আমি আপনাদের বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছি। আপনাকে এই দশায় উপস্থিত করিয়াছি।

নারায়ণী। আপনি করিবেন কেন! যাহাকে ইতঃপূর্ব্বে আপনি দূর করিয়া দিয়াছেন, সেই দুরাত্মা ও তাহার পিতা হইতেই আমাদের এই অবস্থা হইয়াছে।

ব্রাউন। হার?

নারায়ণী। আপনি রাখুন। বুঝিতেই ত পারিতেছেন, আমার রক্ষা করিবার শক্তি নাই। আমি উহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিব বলিয়াই আসিতেছিলাম।

ব্রাউন। যাহাতে রাখিতে পারেন, আমি যথাশক্তি তার ব্যবস্থা করিব।

নারায়ণী। যিনি আপনাকে পত্র দিয়াছেন, তিনি কোথায়?

ব্রাউন। আমি তাহাকে বাটীতে দেখিয়াছি। তিনি আপনার কে ?

নারায়ণী। কে! এক কথায় যে বুঝাইবার শক্তি নাই সাহেব! তিনি দেবী—কোন স্বর্গ হইতে, আমাকে সান্ত্বনা দিতে, আমার সঙ্গে সমভাবে দুঃখভোগ করিতে আসিয়াছেন।

ব্রাউন। তারপর, কি করিব আদেশ করুন: আমাকে ভৃত্য জ্ঞান করিবেন।

নারায়ণী। না সাহেব! ওকথা আর আমাকে শুনাইবেন না। দুঃখী বলিয়া দয়া করিতে আসিয়াছেন, এই যথেষ্ট। আমার অবস্থা ক্রীতদাসীরও অধম। তাহার ত একটা থাকিবারও স্থান আছে – আমার নাই।

ব্রাউন। বন্ধু জ্ঞান করুন।

নারায়ণী। কি করিবেন! উপকার করিবার আর কি আছে সাহেব!

ব্রাউন। রাণী কি নিদ্রিত ?

নারায়ণী পিতামহীর মস্তক ভূমিতে রাখিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল। কটীদেশ অঞ্চলে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—"নিদ্রা বটে—কিন্তু এ ঘুম ভাঙ্গাইতে কোনও মানুষের শক্তি নাই।"

ব্রাউন বুঝিলেন, কিন্তু কথা কহিতে পারিলেন না। এক দৃষ্টে সেই গতজীবনা বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নারায়ণী প্রথমে হার ছড়া কুড়াইয়া গলায় পরিল, তারপর পিতামহীকে কাঁধে তুলিবার চেষ্টা করিল। ব্রাউন বলিলেন—"আমাকে আদেশ করুন না। কোথায় লইয়া যাইতে হইবে, কাঁধে করিয়া লইয়া যাই।"

নারায়ণী। তা যে হয় না সাহেব! আমাদের মৃতদেহ যে বিধর্ম্মীর স্পর্শ করিতে নাই।

ব্রাউন। এই ভার কাঁধে লইয়া, এই প্রকাণ্ড বনের ভিতর কোথায় যাইবেন?

নারায়ণী। বলিতে পারি না কোথায় যাইব। সাহেব তুমি আর আমার সঙ্গে আসিয়ো না। দেখিতেছ না চারিদিক হইতে অন্ধকার ঘেরিয়া আসিতেছে! আমি বহুদিন হইতে অন্ধকারে ডুবিয়াছি। অন্ধকারই আমার প্রিয়। তুমি আমার সঙ্গে আসিয়া সুখ পাইবে না।

নারায়ণী পিতামহীকে স্কন্ধে করিয়া নদীগর্ভে অবতরণ করিল। ব্রাউন এক স্থানেই দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, বালিকা পিতামহীকে স্কন্ধে লইয়া, নদীর ধার ধরিয়া বালুকা-স্তরের উপর দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইল। যেখানে নির্ঝর সুবর্ণরেখার জলস্রোতে মিশিয়াছে, সেইখানে আসিয়া কিয়ৎ-ক্ষণের জন্য দাঁড়াইল। তারপর! চক্ষের নিমেষে বালিকা পিতামহীর সঙ্গে নদীর আবর্ত্ত মধ্যে পতিত হইল।

উন্মাদের মত ছুটিয়া ব্রাউন নদীতে ঝাঁপ দিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

জানকী শ্বশুর আনন্দদেবকে জিজ্ঞাসা করিল—"বিদ্রোহী ধরিতে তাহার স্বামীকে সাহেবের সঙ্গে পাঠাইলেন কেন?

আনন্দদেব পুত্রবধূকে বড়ই স্নেহ করিতেন। তাহার প্রশ্নের ভাবে বুঝিলেন, মুকুন্দের জন্য তাহার ভয় হইয়াছে। সেই জন্য আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"তাহার জন্য কিছু ভয় নেই মা।"

জানকী। কেমন করিয়া জানিলেন ?

আনন্দ। সঙ্গে সাহেব আছে; বার জন অস্ত্রধারী পুরুষ আছে।

জানকী। বিদ্রোহীদের কাহারও উপর রাগ নাই। তাদের যত রাগ আপনার উপর ও আপনার পুত্রের উপর।

আনন্দ। থাকিলেই বা কি করিবে!

জানকী। কি করিবে! তাহারা যদি কিছু করিতে চায়, সাহেব কিম্বা তার বার জন সঙ্গী কিছুই করিতে পারিবে না।

আনন্দ। তুমি মা স্ত্রীলোক। স্বামীর জন্য ভয় পাইতেছ, তাই বলিতেছ। অন্যে এ কথা শুনিলে বিশ্বাস করিবে কেন ?

জানকী। যেহেতু তাহারা কেহই বিদ্রোহীদের শক্তি দেখে নাই। দেখিলে বিশ্বাস করিত। আমি দেখিয়াছি, তাই বলিতেছি।

আনন্দ। তুমি কি দেখিয়াছ ?

জানকী। একবার নয়, বার বার। তবে বলি, আপনি কিম্বা আপনার পুত্রের, কিছুতেই এতদিন নিশ্চিন্ত হইয়া ঐশ্বর্য্য ভোগ ঘটিয়া উঠিত না। ঘাতকের হস্তে কোন কালে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইত।

ভীরু আনন্দ ভীতিবিস্ফারিত দৃষ্টিতে পুত্রবধূর পানে চাহিয়া রহিল। জানকী বলিতে লাগিল—"এতদিন কোনও প্রকারে বাঁচিয়াছেন; কিন্তু বার বার তাহাদের উৎপীড়িত করিলে, আপনাদের রক্ষা করিবে কে ?"

আনন্দ। কবে আমাদের হত্যা করিতে আসিয়াছে! তুমি বোধ হয়, আমার ঘরে দুই একদিন অস্ত্র দেখিয়া সন্দেহ করিয়াছ যে, হত্যাকারী আমার ঘরে আসিয়াছিল।

জানকী। আমি চক্ষে দেখিয়াছি। অস্ত্র ভিক্ষা লইয়া আপনাদের জীবন রক্ষা করিয়াছি।

আনন্দ। বল কি!

জানকী। আর বলিব কি! এত কষ্টে ধন সংগ্রহ করিয়া আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছেন? পুত্রহত্যা করিতে বসিয়াছেন।

আনন্দ। কবে আমার গৃহে ঘাতক ঢুকিয়াছিল?

জানকী। যে দিন ব্রাহ্মণের কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়া, উল্লাস করিতে আপনারা রাঁচি হইতে ঘরে আসিয়াছিলেন, সেই দিন প্রথম তাহাকে দেখিয়াছিলাম। তারপর মধ্যের কথা ছাড়িয়া দিই—কাল দেখিয়াছি। আপনার পুত্র দেখেন নাই, তবে বুঝিয়াছেন। এখনও বোধ হয় তাঁহার গণ্ডে জালা আছে।

আনন্দ। রক্ষা করিল কে?

জানকী। প্রথম রাখিয়াছিল সদাশিব। তারপর বরাবর আমি তার নাম লইয়া রক্ষা করিয়া আসিতেছি।

জানকী পূর্ব্ব রাত্রের ঘটনা শ্বশুরকে শুনাইল। এমন সময় আনন্দ-পত্নী স্বামীর কাছে ছুটিয়া আসিল; এবং কাঁদিতে কাঁদিতে জানাইল—সন্ধ্যা হইল, সাহেব দলবল লইয়া ফিরিল, কিন্তু তাহার পুত্র ফিরিল না।

জানকী প্রমাদ গণিল।

আনন্দ। উপায়!

আনন্দ-পত্নী এখনি উপায় কর। নহিলে আত্মহত্যা করিব।

আনন্দ। তুমি কেমন করিয়া সংবাদ পাইলে?

আনন্দ-পত্নী। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল। সাহেব মুকুন্দকে বনে ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

আনন্দ কাতর দৃষ্টিতে জানকীর মুখ পানে চাহিল।

জানকী। আমাকে অনুমতি করুন। আমি অনন্তপুরে যাই।

আনন্দ-পত্নী। তুমি যাইয়া কি করিবে!

জানকী। আমি না গেলে কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

আনন্দ। এস মা, তোমার যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিই।

আনন্দ-পত্নী এ কথার কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে স্বামীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আনন্দদেব বলিলেন—"পরে শুনিও।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সদাশিব রতনের বাটীর সম্মুখে সুবর্ণরেখার ভাঙ্গা ঘাটে সিক্ত বস্ত্রে দাঁড়াইয়াছিল। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। আকাশে আবার ঘন মেঘের সঞ্চার, সন্ধ্যায় দ্বিপ্রহর রজনীর অন্ধকার।

ধীরে ধীরে তুলসী তার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সদা। কি করিলাম তুলসী! এতদিনের কার্য্য একদিনে নষ্ট করিলাম! নারায়ণীকে হারাইলাম!

তুলসী। এখনও আশা আছে।

সদা। আর আশা। আতি পাতি করিয়া বন খুঁজিয়াছি। দিবসে সন্ধান মিলিল না, এ ঘোর অন্ধকারে তাহাদের পাই-

বার আশা! তুলসী এতদিন তোমাকে ছাড়িয়া জীবন ধারণ করিয়া রহিলাম, আজ কিনা দু'দণ্ডের জন্য পারিলাম না!

তুলসী। এখনও মুন্না ফিরে নাই।

সদা। মুন্নাও ত মানুষ। মানুষের যা সাধ্য, মুন্না বরাবর তাই করিয়া আসিতেছে। তাহার অধিক ত সে করিতে পারে না। বুঝিয়াছি সে সন্ধান পায় নাই। সন্ধান আর পাইবেও না।

তুলসী। মুকুন্দ কিম্বা তাহার সহচরেরা যদি ফিরিত, তা'হলে এই পথেই ত ফিরিত!

সদা। আমি তাহাদেরই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি। পাইলে তাহাদের রক্তে আজ নারায়ণীর অদর্শনের প্রতিশোধ লইব।

তুলসী। না প্রভু! তা করিয়ো না।

সদা। বৃথা অনুরোধ করিয়ো না তুলসী। নারায়ণী বাঁচিলেও সে পামরকে হত্যা করিব, মরিলেও হত্যা করিব। দুরাত্মার ভারে ধরণীকে আর অবসন্ন হইতে দিব না।

তুলসী স্বামীর পায়ে ধরিল। সদাশিব বলিল—"গুরু আসিয়া অনুরোধ করিলে শুনিতাম কি না সন্দেহ। তুলসী! দেবতা হইয়া ত আসি নাই। মানুষের প্রাণ লইয়া আসিয়াছি। আর কত সহিব।

তুলসী। আমি যে তোমাকে তাহারও অধিক দেখি প্রভু! দেবতায়ও কি এত ধৈর্য্য আছে।

সদা। তা বলিয়া স্ত্রীর লাঞ্ছনা সহ্য করিব! রাজার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, আমি ভিখারী হইয়াছি, তবু ত একদিনের জন্যও

বিচলিত হই নাই। আনন্দে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছি। তোমার অনুরোধে নারায়ণী আমার হাতে হাত দিয়াছে। কেন জান তুলসী! সে জানে তুলসীও একদিন এই হাতে হাত দিয়াছিল। তার অপমানের শোধ না লইয়া মরিলে বৈকুণ্ঠ বাসেও আমি সুখী হইব না।

অদূরে বৃক্ষান্তরালে মনুষ্যপদ শব্দ শ্রুত হইল। কাহারা যেন কোন দিকে ছুটিয়া পলাইতেছে। সদাশিব সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। তুলসী প্রমাদ গণিল। নত জানু হইয়া গলবস্ত্রে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিল—"ঠাকুর! স্বামীকে আমার নরঘাতী হইতে দিয়ো না।"

তুলসীও স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে যাইবে ইচ্ছা করিল। কিন্তু দুই পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই, পশ্চাৎ হইতে ব্রাউন ডাকিলেন—"ঠাকুরাণী!"

তুলসী। কে—সাহেব?

ব্রাউন। আপনি গৃহে যান।

তুলসী। আমার ভগিনীকে পাইয়াছেন?

ব্রাউন। পাইয়াছি, কিন্তু এখনও জ্ঞান ফিরে নাই। তিনি নদীতে ডুবিয়া ছিলেন। নিমগ্ন হইয়া সংজ্ঞা হারাইয়াছেন।

তুলসী। কেমন করিয়া আপনার ঋণ শুধিব সাহেব!

ব্রাউন। অন্য কথায় সময় নষ্ট করিবেন না। এখনি যাইয়া রাজকুমারীর শুশ্রূষা করুন। আমি ডাক্তার আনিতে রাঁচি চলিলাম। তাঁহাকে ঘরে রাখিয়া আসিয়াছি। শীঘ্র যান।

এই বলিয়াই ব্রাউন তুলসীকে সেলাম করিয়া সে স্থান হইতে দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

তুলসী রাণীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। দূর হইতে একটা অস্পষ্ট উত্তর তাহার কানে পশিল। সে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিবার অবকাশ পাইল না। চক্ষু পালটীতে ব্রাউন দৃষ্টিপথের বাহিরে। নানা অশুভ কল্পনা করিতে করিতে তুলসী গৃহ প্রবেশ করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

যে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলে একদিন রতন প্রহরীর সঙ্গে যুঝিয়া বিশ্রাম লইয়াছিলেন। মুকুন্দও তাহার চারিজন সঙ্গী গভীর অন্ধকারে তাহারই তলে আসিয়া বসিল।

একজন বলিল—হুজুর! আর ভয় নাই, এই স্থানে কিছু-ক্ষণের জন্য বিশ্রাম করুন।

২য়। আজ যখন মরি নাই, তখন অনেক কাল বাঁচিয়া থাকিব।

৩য়। এখনও আমাদের ভয় ঘুচে নাই। এস, এ স্থান যত শীঘ্র পারি ত্যাগ করি।

৪র্থ। সে শক্তি আর নাই। শু'তে পারিলে বসিতাম না।

৩য়। আমার মতে এ স্থান ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। কেন না যার হাত হইতে আজ উদ্ধার পাইয়াছি, তার নাম মুন্না। সে যাহাকে মারিতে অস্ত্র তুলিয়াছে, আজও পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে অক্ষত দেহে ফিরিতে দেখে নাই। রাণীকে যদি সে সুবর্ণরেখার জলে না পাইত, তাহা হইলে কেহই আমরা রক্ষা পাইতাম না। কিন্তু বাঘ তাহার মুখের আহার পরিত্যাগ

করিয়াছে। সে সুবিধা পাইলে, আবার আমাদের পাছু লইবে। তাই বলি, যদি বাঁচিতে চাও, একেবারে প্রসাদপুরে যাইয়া বিশ্রাম কর।

মুকুন্দ বড়ই ক্লান্ত। তাহার কথা কহিবার পর্য্যন্ত শক্তি ছিল না। তথাপি এখনও নিরাপদ নয় শুনিয়া, সে সকলকেই স্থান ত্যাগে অনুরোধ করিল। বলিল—আমাকে তোমরা বাড়ী পৌঁছাইয়া দাও। যদি প্রসাদপুর পুরস্কার চাও, তাও তোমাদের দিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি।

এমন সময় বাতাসে শব্দ তুলিয়া একটা 'পাপড়া' প্রথম প্রহরীর মাথায় পতিত হইল। সে মূর্চ্ছা গেল। দেখিতে দেখিতে আর একটী! দ্বিতীয় সিপাহী সকরুণ চীৎকার করিয়া ছুটিল। অবশিষ্টের আর চিন্তা করিবার অবকাশ হইল না—মূর্চ্ছিত প্রহরীকে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। মুকুন্দও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে মুন্না সেখানে আসিয়া উপস্থিত। মুন্না আসিয়াই প্রহরীর পৃষ্ঠে পদাঘাত করিল। পদ-প্রহারে হতভাগ্যের সংজ্ঞা ফিরিল। মুন্না বলিল—"আমার কথা কহিবার অবকাশ নাই। বল্, রাজকুমারীর কি হইল। মিথ্যা বলিলে এখনি তোকে হত্যা করিব।"

প্রহরী। রাজকুমারী নদীতে ঝাঁপ খাইয়াছেন। তারপর কি হইল জানি না। এক সাহেব সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি বলিতে পারেন।

পশ্চাৎ হইতে সদাশিব আসিয়া মুন্নাকে ধরিল।

মুন্না। হুজুর! রাণী আর রাজকুমারী দুইজনকেই বুঝি

হারাইয়াছি। আমি রাণীর মৃতদেহ নদীর জল হইতে তুলিয়াছি, কিন্তু রাজকুমারীকে ত পাইলাম না! এই পিশাচেরা তাহাদের হত্যা করিয়াছে।

সদা। তার জন্য এ হতভাগ্যকে হত্যা করিয়া কি হইবে। তুমি পাপিষ্ঠ মুকুন্দকে ধরিয়া আন।

মুন্না। যদি ছাড়িয়া না দাও, তাহা হইলে আনি। নহিলে মিছামিছি ছেলে মানুষী করিতে আর ইচ্ছা করি না।

সদা। না আর তাহাকে দয়া করিব না।

মুন্না। সত্য কর।

সদা। যদি বুঝিতে পারি নারায়ণীও মরিয়াছে, তাহা হইলে ছাড়িব না।

মুন্না। সেও মরিয়াছে।

সদা। তা'হলে পিশাচকে ধরিয়া আন, আমি স্বহস্তে তাহাকে হত্যা করিব।

মুন্না ছুটিল। সদাশিব প্রহরীকে আকর্ষণ করিয়া কালাবাঁধের তীরাভিমুখে লইয়া চলিল। বলিল—"মারিব না, নীরবে সঙ্গে আয়। কিন্তু যদি চীৎকার কর এইখানেই হত্যা করিব।"

পঞ্চম খণ্ড।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নারায়ণী আপনার ঘরে এক দীন শয্যায় শুইয়া। পার্শ্বে তুলসী। একটী ক্ষীণ দীপশিখা সেই প্রশস্ত গৃহের এককোণে ম্লান আলোকে গভীর অন্ধকারের সহিত যুদ্ধে আপনার অক্ষমতার পরিচয় দিতেছিল। তুলসী নারায়ণীর মুখের কাছে মুখ লইয়া ডাকিল—নারায়ণী !

নারায়ণী। কেও, দিদি।

তুলসী। এত ঘুম ঘুমাইতেছ কেন বোনটী আমার ?

নারায়ণী। আমি কোথায় ?

তুলসী। কেন ভগিনী, তুমি তোমার নিজের ঘরে।

নারায়ণী উঠিবার চেষ্টা করিল। তুলসী উঠিতে নিষেধ করিল। নারায়ণী শুনিল না, দুই হাতে ভরদিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

তুলসী। উঠিয়োনা, তুমি বড় দুর্ব্বল।

নারায়ণী। তা বুঝিয়াছি, কিন্তু দিদি, আমাকে রক্ষা করিল কে ?

তুলসী। দেবতা রক্ষা করিয়াছেন।

নারায়ণী। আমাকে লইয়া আর কষ্ট পাও কেন ?

তুলসী। কষ্ট! সেকি নারায়ণী! জীবনে যদি কিছু সুখ পাইয়া থাকি ত তোমার সঙ্গে পাইয়াছি।

নারায়ণী। আর থাকিও না—আর সুখ পাইবে না। ঘরে ফিরিয়া যাও। মমতাময়ী! পুত্র কোন অপরাধে তোমার মমতায় বঞ্চিত হইল!

তুলসী। তাহাকে যোগ্য স্থানেই রাখিয়া আসিয়াছি। মানুষকে সুখী রাখিবার সহস্র উপায় মধ্যে স্নেহ যদি একটা উপায় হয়, আমার পুত্রের ভাগ্যে সে স্নেহের অভাব হইবে না। পুত্রের কথা তুলিয়া আমাকে কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ করিবার চেষ্টা করিয়ো না। তুমিই এখন আমার পুত্র-কন্যা।

নারায়ণী এ কথার কোনও উত্তর দিতে পারিল না। কেবল চক্ষুজল গণ্ড ভাসাইয়া তাহার কৃতজ্ঞতার সাক্ষী দিল। তুলসী তাহার কম্পিত হস্তদুটী এক হস্তে ধরিয়া, অন্য হস্তে অঞ্চল ধরিয়া মুখ মুছাইতে মুছাইতে বলিল—

"ভগিনী! কাঁদিয়ো না। বিধাতা যদি আমাদের এই অবস্থায় রাখিয়া সুখী হন, তাহা হইলে এই আমাদের সুখ। আমার ঘরের অবস্থা, পুত্রসম স্নেহ-ভাজন দেবরটীর অবস্থা, আমি জানিয়াও জানিতে চাহি না। যাহা জানিতেছি, মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি, তাই আমার মত রমণীর পক্ষে যথেষ্ট।

নারায়ণী। কেন এ কথা কহিলে দিদি?

তুলসী। আমার বোধ হয়, সে বালক জীবিত নাই।

নারায়ণী। এরূপ নিদারুণ কথা মুখেও আনিয়ো না। তুমি স্বামী লইয়া, সেই বালকটীকে লইয়া সুখী হও।

তুলসী। আর তুমি?

নারায়ণী। আমার আশা পরিত্যাগ কর।

তুলসী। কি দুঃখে পরিত্যাগ করিব ?

নারায়ণী। বিধাতার নির্দ্দেশ। আমার জাতি গিয়াছে।

তুলসী। দেবতায় স্পর্শ করিলে জাতি যায় না। যিনি তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছেন, তাঁহাকে তুমি সাধু বলিয়াই জানিও।

নারায়ণী কোনও উত্তর করিল না, ধীরে ধীরে আবার শয্যায় শয়নের উদ্যোগ করিল। তুলসী বুঝিল, কথাটা নারায়ণীর মনোমত হইল না। তাহাকে সাহায্য করিতে গিয়া বুঝিল, তাহার শরীর উষ্ণ। নারায়ণীর জ্বর হইয়াছে।

তুলসী। ভগিনী! শীত অনুভব করিতেছ কি ?

নারায়ণী। শরীর জ্বলিতেছে।

তুলসী। সমস্ত দিন অনাহারে আছ, কিছু আহারের ব্যবস্থা করি।

হাত নাড়িয়া নারায়ণী নিষেধ করিল, এবং ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিল। তুলসী অনেকক্ষণ পার্শ্বে বসিয়া রহিল। রাণীর কথাটা জানিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু কেমন করিয়া নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিবে? বালিকা যতক্ষণ মোহাবৃতা থাকে, ততক্ষণই তার সুখ। এ সুখ ভাঙ্গিতে তাহার সাহস হইতেছিল না।

নারায়ণীকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া, তুলসী তাহার আহার সংগ্রহের জন্য বাহিরে চলিল। সে বুঝিয়াছিল, বালিকার যেরূপ শারীরিক অবস্থা, তাহাতে বলকর পথ্য না পাইলে সে প্রাণে বাঁচিবে না। কিন্তু পথ্যের উপযোগী এমন কি

সামগ্রী আছে যে, তাহার মুখের কাছে লইয়া উপস্থিত হয়। এই সময় স্বামীর ভাবনা আবার তাহার মনে জাগিল। অমনি তাহার শরীর শিহরিল। "স্বামী যে মুকুন্দকে হত্যা করিতে গিয়াছিল! আমি এখানে, কে হতভাগ্যকে রক্ষা করিবে! আমি ভিন্ন আমার স্বামীর মতি কে ফিরাইতে পারিবে!"

তুলসী মনে করিল, নারায়ণী যখন ঘুমাইতেছে, তখন এই অবকাশে স্বামীর একবার সন্ধান লইয়া আসি।

বাহির হইতেছে, এমন সময় তুলসী দেখিল, ছাদের উপরে দীর্ঘাকৃতি সশস্ত্র এক পুরুষ দণ্ডায়মান। কতকটা বিস্ময়ে কতকটা ভয়ে তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

লোকটী দূর হইতেই অভিবাদন করিয়া বলিল "মা! আমি আপনার এক নরাধম সন্তান। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আসুন, তা হইলেই আমাকে চিনিতে পারিবেন। আমি চীৎকার করিয়া কথা কহিতে পারিব না।"

তুলসী তাহার কথায় সাহস পাইয়া অগ্রসর হইল। নিকটে উপস্থিত হইয়াই চিনিল—"কেও দারোগা সাহেব!"

দারোগা রূপসিং উত্তর করিল—"কথা কহিবার সময় নাই। আত্মীয় যে কেহ থাকে তাহাকে এখনি সাবধান করিয়া দিন। এই দণ্ডেই অরণ্যে আশ্রয় লইতে বলুন। বিলম্ব করিলে রক্ষা করিতে পারিবেন না। মা! উদরের দায়ে আত্ম বিক্রয় করিয়াছি। ইহার পর আমি কোনও উপকারে আসিতে পারিব না। দাঁড়াইয়া চক্ষের উপরে আপনার প্রিয়জনের বন্ধন দেখিব। হয়ত বন্ধনে সহায়তা করিব। বিলম্বে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা বলিয়া, বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াছি।"

তুলসী রূপ সিংকে অভিবাদন করিয়া বলিল—"আপনি পরম সুহৃদের কার্য্য করিয়াছেন। সে আত্মীয় আর কেহ নহে আমার স্বামী।"

রূপ সিং প্রত্যভিবাদন করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে স্থান ত্যাগ করিল। তুলসীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তিন বৎসর পূর্ব্বে যে উদ্যানে সদাশিব একদিন প্রহরি-বেশে প্রবেশ করিয়াছিল, সিপাহীটীকে ধরিয়া, আজি আবার সেই উদ্যানে প্রবেশ করিল। এ তিন বৎসরে তার কত পরিবর্ত্তন! সদাশিবের অনুভবেই সে উদ্যানের অস্তিত্ব,—অন্যে দেখিলে বুঝিতে পারিত কি না সন্দেহ। সে সুন্দর কাছারী বাড়ী নাই, যেখানে দেওয়ান আনন্দদেব রাজা বীরচন্দ্রের সমস্ত ঐশ্বর্য্য লইয়া বাস করিত। উদ্যান প্রবেশ মুখে বিচিত্র লতালিঙ্গিত সে সুন্দর স্তম্ভ নাই, তাহার পূর্ব্ব গৌরব চিহ্নের ক্ষীণ লেখাটী পর্য্যন্ত আনন্দদেব মুছিয়া লইয়া গিয়াছে। চারিধারে কেবল কতক গুলা ভগ্নস্তূপ। যেখানে এক সময় ছোট ছোট মর্ম্মর প্রস্তর গুলি, ছোট ছোট ফুলগাছ গুলির বেষ্টনে, আগন্তুকের প্রাণের প্রতিবিম্ব লইয়া, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলির মত, নীরবে আপনা আপনির ভিতর হাসির চলাচল করিত, স্তূপ গুলা সেখানে তাহাদের এক একটা সমাধি স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া আছে। অধিকাংশ পুষ্পবৃক্ষ উন্মূলিত অথবা কর্ত্তিত। যে গাছ গুলা মরিবার নয়, তাহারাই কেবল আছে।

তাহারাই কেবল, নির্লজ্জ ভিখারীর মত শত লাঞ্জনা সহিয়াও, কচিদাগত আগন্তুকের উদ্দেশে মাথা নাড়িয়া, হাত দুলাইয়া দর্শন-করুণা ভিক্ষা করিতেছে।

উদ্যানে প্রবেশ করিবামাত্রই সদাশিবের মন বিষন্ন হইল। সেই তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা তাহার মনে জাগিল। মনে মনে বলিল—তখন আমি কি ছিলাম, এখন আমি কি হইয়াছি। এই বাগানের সঙ্গে আমার মন শতধা ভগ্ন হইয়াছে।

বিষাদের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ কোমলতা আবার তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। সে ভাবিল, জীবনের যখন কোনও কার্য্য সিদ্ধ হইল না, তখন একটা সামান্য সিপাহীকে হত্যা করিয়া হস্ত কলঙ্কিত করি কেন! সদাশিব হতভাগ্যকে মুক্তি দিয়া বলিল—"অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া, এই দণ্ডেই এই স্থান পরিত্যাগ কর। সাবধান, যেন মুন্না দেখিতে না পায়, দেখিলে আমি রক্ষা করিতে পারিব না। সিপাহী সেলাম করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলাইল।

যে মর্ম্মর প্রস্তর মণ্ডিত বেদীর উপর সদাশিব একবার বিশ্রাম লইয়াছিল, সেইটী অর্দ্ধভগ্নাবস্থায় পড়িয়াছিল। আনন্দদেব তাহার উপর হইতে পাথর গুলি লইয়া গিয়াছে। সদাশিব সেইস্থানে আর একবার উপবেশন করিল।

যুবক বসিল, কিন্তু তার মনের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। ভৃত্যের বেশেও তখন তার আনন্দ উৎসাহ। কর্ত্তব্য পালনের যোগ্যতায় নিজের জীবন লইয়া তখন সে কত সুখী ছিল। এখন আর তাহার সে অবস্থা নাই। তাহার সমস্ত আশা নির্ম্মূল, পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিনী নিকটে থাকিতেও সে বিয়োগী,

স্বাধীন হইয়াও সমাজ হইতে তাড়িত, বন্যজন্তুপূর্ণ অরণ্য মধ্যে বন্দী।

সেদিনকার মত সে রাত্রিও নাই। সে চন্দ্রসনাথ গগণ-মণ্ডল, মলয়সেবিত তরুলতা, পুষ্পগন্ধসেবিত কানন, কিছু নাই। কৌমুদীপ্রতিফলিত আনন্দদেবের সেই সুরম্য বাস-ভবনের চিহ্নমাত্রও নাই।

চারিদিকের অন্ধকার বিশাল প্রান্তর মধ্যেও আপনার বিরাট দেহের স্থান দিতে পারিতেছিল না, তাই ঘনীভূত হইয়া কতকটা সদাশিবের হৃদয়ে প্রবেশ করিল।

সদাশিব ভাবিল, বাঁচিয়াও সুখ নাই, দুঃখের হাত হইতে নিস্তার পাইতে যে মরিব তাহারও উপায় নাই। অন্য কাহা-রও মৃত্যু কামনা করিলেও কি নিস্তার আছে! সদাশিব এক-বার চিন্তা করিয়া দেখিল। একবার ভাবিল,—রাজা? রাজা ত মরিবার জন্য দিবারাত্রিই প্রস্তুত, তার মরণে সদাশিবের বিশেষ কি লাভ হইবে! তুলসী? সেও ত তাহার মুখ চাহিয়া বসিয়া নাই, তাহার উপর নির্ভর করিতে অনন্তপুরে আসে নাই। পরহিত ব্রত লইয়া সে যে প্রিয় জন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে! নারায়ণী? দূরে কালাবাঁধ কল নাদে কাঁদিয়া উঠিল। বিস্মিত হইয়া সদাশিব চাহিয়া দেখিল, কালাবাঁধের কালো জল সেই নিবিড় আঁধারে দুইটা প্রতিবিম্বিত তারকা চক্ষু লইয়া, কটমট করিয়া তাহার পানে চাহিয়া আছে। পূর্ব্বে কাছারী বাড়ী ব্যবধান থাকায়, সে উদ্যান হইতে সরোবর দৃষ্ট হইত না। এখন সর্ব্বত্র সমভূমি। সদাশিব বলিয়া উঠিল—

"না নারায়ণী তুমি বাঁচিয়া থাক। কাহাকেও যদি মরিতে হয়, তবে মুকুন্দই মরুক।"

"তাঁহাকে ক্ষমা করুন, দয়া করিয়া ক্ষমা করুন।"—কি কোমল করুণ কণ্ঠ!

চমকিত হইয়া সদাশিব পশ্চাতে ফিরিল—"কে আপনি?"

অবগুণ্ঠণবতী জানকী তাহার পদপ্রান্তে আসিয়া জানু অবনত করিল।

সদা। বুঝিয়াছি, আপনি উঠুন।

জানকী। অগ্রে অভয় দিন।

সদা। নরাধমকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিবেন না।

জানকী। কিন্তু কি করিব, আমার স্বামী। একদিন আপনি কুলকামিনীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন, আজ তার আয়তি রক্ষা করুন।

সদাশিব বিপন্ন হইল। বলিল—"সুন্দরি! আমি প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ, স্ত্রীর অনুরোধ শুনি নাই।"

আর কোনও কথা না কহিয়া জানকী সদাশিবের নিকট হইতে চলিল; এবং নিকটের একটা অর্দ্ধভগ্ন স্তম্ভে ভর দিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

সদা। এখানে দাঁড়াইয়া লাভ নাই, আপনি ঘরে ফিরিয়া যান।

জানকী নড়িল না, কোন কথাও কহিল না।

সদা। দেখুন, অনেক সহিয়াছি।

জানকী নিরুত্তর। সদাশিব ফাঁফরে পড়িল, ভাবিল এস্থান ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া সে বেদী হইতে উঠিল।

দুই চারিপদ অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় জানকী বলিল—"আর একটা অনুরোধ।"

সদা। কি বলুন।

জানকী। স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাই না। কোন সাহসে চাহিব! তিনি আপনাদের যা অনিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে তাঁর জন্য দয়া ভিক্ষা করিবার কোনও উপায় নাই। তবে আমার একটী ভিক্ষা।

সদা। কি বলুন।

জানকী অগ্রসর হইয়া সদাশিবের পা ধরিল।

সদা। পা ধরিবেন না, কি অনুরোধ বলুন। সাধ্যমত রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব।

জানকী সদাশিবের মুখপানে চাহিল! অবগুণ্ঠন মাথা হইতে সরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝি কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকার সে ভাঙ্গা বাগান ছাড়িয়া পলাইল! সদাশিব দেখিল যেন চারিদিকে আবার ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার মাঝে কে যেন দুটী খঞ্জন পাখী একটী প্রফুল্ল কমলের উপর বসাইয়া দিয়াছে।

সদা। অনুমতি করুন।

জানকী। আর একদিন ভাগ্যবশে আপনাকে এইস্থানে এই বেদীতে দেখিয়াছিলাম। সেদিন বড়ই তৃপ্তি পাইয়াছিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, সে তৃপ্তি জীবনে কখন পাই নাই। সেদিন দেবতারাও চারিদিক হইতে তৃপ্তিদানের সহায়তা করিয়াছিল। আকাশে চাঁদ হাসিয়াছিল, বাগানে গাছে গাছে ভারে ভারে ফুল ফুটিয়াছিল। কিন্তু আজ অন্ধ-

কার! সেদিন আপনাকে দেবতা দেখিয়াছিলাম। কিন্তু আজ চক্ষের দোষে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।

সদা। কি করিতে হইবে বলুন।

জানকী। তাই বলিতেছিলাম, যদি আমার স্বামীকে বধ করাই আপনার অভিপ্রায়, তাহা হইলে এ উদ্যানে তাহাকে হত্যা করিবেন না।

সদা। যাও সুন্দরী, তুমি স্বামীকে লইয়া সুখিনী হও, আমি তাহাকে হত্যা করিব না।

জানকী। তাঁহাকে দেখিলেই যে আপনার ক্রোধ হইবার সম্ভাবনা।

সদাশিব জানকীর হাতে অস্ত্র প্রদান করিল। মুন্নাও এই সময়ে মুকুন্দকে ধরিয়া তাহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। হতভাগ্য ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়াছিল, তাহার কথা কহিবার ও শক্তি ছিল না।

মুন্না। বিলম্ব করিবেন না, দুষ্টকে এখনি হত্যা করুন।

সদা। ভাই, আর হত্যায় কাজ নাই, নরাধমকে ছাড়িয়া দাও।

মুন্না। প্রতিজ্ঞার কি হইবে?

সদা। একটা তুচ্ছ কীটবধের প্রতিজ্ঞা নাই রাখিলাম।

জানকী অগ্রসর হইয়া মুন্নার সম্মুখে জানু পাতিল।

মুন্না। কে তুমি—দিদি?

জানকী। তাঁহার আশ্রিতা কনিষ্ঠা। ভাই যাঁর নামের দোহাই দিয়া, এতদিন স্বামীকে রক্ষা করিয়া আসিতেছি। আজ আমি সেই প্রত্যক্ষ দেবতার শরণাপন্ন। আমার স্বামী কি মরিতে পারে!

মুন্না। লইয়া যাও। তুমি ভাগ্যবতী! আমার প্রভুর প্রতিজ্ঞা, তাঁহার স্ত্রী পায়ে ধরিলেও, ভাঙ্গিত কি না সন্দেহ? কিন্তু তুমি ভাঙ্গিলে। শুধু ভাঙ্গিলে নয়, কালরূপিনী তুমি মাঝে পড়িয়া, আগে হইতেই সব উদরস্থ করিয়াছ। তুমি না থাকিলে, তোমার এই স্বামী, ইহার সেই বেইমান বাপ্ তোমার শ্বশুর, আর তার পৃষ্ঠপোষক কেহই এদেশে থাকিতে পাইত না। মায়ের মন্দির চূর্ণ হইত না। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তার অধিষ্ঠান হইত। এই নাও, তোমার স্বামীকে গ্রহণ কর। আর এখানে দাঁড়াইয়োনা!

জানকীর হাতে মুকুন্দকে দিয়া মুন্না সদাশিবকে বলিল— "আসুন হুজুর রাণীর মৃতদেহের সংকার করিবেন। বিলম্ব করিলে, দেহ শিয়াল কুকুরের পেটে যাইবে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উভয়ে প্রস্থান করিলে, জানকী স্বামীকে বলিল—"আর দাঁড়াইয়া কেন, ঘরে চল।"

তখনও মুকুন্দ নীরব। জানকী তাহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। কিছুদূরে গিয়া মুকুন্দ কথা কহিল—"আমাকে কেন বাঁচাইলে জানকী?"

জানকী। আমার উপর বীরত্ব দেখাইবে বলিয়া।

মুকুন্দ। এখন দেখিতেছি আমার মরণ মঙ্গল।

জানকী। মরিয়া কি নিস্কৃতি আছে! তা'হলে উভয়ে এক

সঙ্গেই মরিতাম। বাঁচিয়া যদি অকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারি, তবে এস আমরা আজি হইতে সেই চেষ্টা করি।

মুকুন্দ। জন্মাবধি যে পাপ করিয়া আসিতেছি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি সর্ব্বশেষে তোমার মত স্ত্রীরও অবমাননা করিয়াছি।

জানকী। আমি স্ত্রী, আমার কথা তুলিতেছ কেন? ইহাদের রক্ষার কি কোনও চেষ্টা করিতে পার না?

মুকুন্দ। কেমন করিয়া করিব, সবইত তুমি বুঝ জানকী। এস আমরা ইহাদের শরণাপন্ন হই। দাস দাসী হইয়া ইহাদের পরিচর্য্যা করি। অনুচর অনুচরী হইয়া ইহাদের সঙ্গে বনে বনে ঘুরি। ঐশ্বর্য্যে আর আমি সুখ পাইব না। জানকী! ইহারা কে? রাজপ্রদত্ত অন্নের রক্ত আমাদের পিতা পুত্রের সর্ব্বাঙ্গে খরস্রোতে বহিতেছে। আমাদের সেই শক্তি সেই প্রভুর ধ্বংসেই নিযুক্ত করিয়াছি। আর ইহারা সেই রাজাকে রক্ষা করিতে, কেন অজ্ঞাত দেশ হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে। এই নীচ দানবীয় শক্তির সহিত সমভাবে যুঝিতেছে। ইহারা কি জানকী?

জানকী। তাই ভাল, এস আমরা ইহাদের শরণাপন্ন হই; তা'হলে প্রায়শ্চিত্ত করা হইবে।

মুকুন্দ। তুমি দেব দর্শন করিয়াছ, কিন্তু দেবী দেখ নাই। আমি তখন অন্ধ ছিলাম, দেখিতে পাই নাই; বধীর ছিলাম, কথা শুনিতে পাই নাই।

জানকী। চল দেখিয়া আসি।

সহসা অনন্তপুর আলোকিত হইয়া উঠিল। উভয়েই বিস্মিত হইয়া একবার নদীতীরস্থ পরিদৃশ্যমান বনভূমির দিকে চাহিল।

জানকী। বুঝি রাণীর চিতা জ্বলিল।

মুকুন্দ। তা নয়, সেই দেবী আসিতেছেন। তাঁহারই রূপে এই শ্মশান ভূমি আলোকিত হইয়াছে।

তুলসী স্বামীকে অন্বেষণ করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মুকুন্দ ছুটিয়া তাঁহার পায়ে পড়িল। জানকীও বুঝিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে তুলসীকে প্রণাম করিল।

তুলসী। ভগিনী, তোমার স্বামী পাইয়াছ, আমার স্বামীটী ফিরাইয়া দাও।

জানকী এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। কি উত্তর দিবে বুঝিতে না পারিয়া বলিল - "তিনি আমাকে কৃপা করিয়া স্বামীর জীবন ভিক্ষা দিয়াছেন।

তুলসী। তুমিও কৃপা করিয়া আমার স্বামীকে ভিক্ষা দাও।

মুকুন্দ। মা! নরপিশাচ আমি আপনার সম্মুখে কোন মুখ লইয়া দাঁড়াইব! তথাপি আপনি দয়াময়ী। আপনি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া চরণে স্থান দিন।

তুলসী। তুমি রাজ্যেশ্বরী—ভিখারিণীর সহিত এ রহস্য কেন? আমার স্বামী—

তুলসী আর কথা কহিতে পারিল না।

জানকী। আপনার স্বামীর কি হইয়াছে?

তুলসী। কি হইয়াছে তুমি কি জান না সুন্দরী? স্বামী আমার অনুরোধ রাখেন নাই, দেখিতেছি তোমার রাখিয়া-

ছেন। তোমার এত শক্তি, তাঁহার উপর এত প্রভুত্ব, তাঁহাকে ধরিতে আবার অন্য শক্তির সাহায্য লইয়াছ কেন? কুলস্ত্রী হইয়া গোয়েন্দা সাজিয়াছ!

জানকী। এ তুমি কি বলিতেছ! আমি যে কিছুই জানি না।

তুলসী। জান না?

এই সময়ে সদাশিব উন্মত্তের ন্যায় সেস্থানে ছুটিয়া আসিল।

সদা। সুন্দরি! আমার অস্ত্র?

যাইবার সময় সদাশিব অস্ত্র লইতে ভুলিয়াছিল, জানকীও তাহা অন্যমনস্কে ভূমিতে রাখিয়াছিল; কিন্তু কোথায় রাখিয়াছিল, তাহার মনে আসিল না। সে ব্যস্ত হইয়া চারিদিক অন্বেষণ করিতে লাগিল।

তুলসী। আর অস্ত্রের প্রয়োজন নাই। সময় থাকিতে অন্ধকারে আত্মগোপন কর।

সদা। চোরের মত পলাইব?

এই সময় লাঠীতে ভর দিয়া মুন্না আসিয়া পড়িল।

মুন্না। চোর কেন, আসুন সাধুর মত পালাই। অনেক সম্বন্ধী—হাতে বন্দুক—

সদা। দোহাই সুন্দরী, আমার অস্ত্র ফিরাইয়া দাও—

মুন্না। তবে আপনি অস্ত্র গ্রহণ করুন, আমি এই লাঠী ও এই শ্রীচরণ অস্ত্রের সাহায্য লইলাম। চোরের হাতে মরিতে পারিব না—

চক্ষের নিমেষে মুন্না স্থান ত্যাগ করিল। জানকী দূর হইতে বলিল—অস্ত্র পাইয়াছি।”

ভূমি হইতে অস্ত্র তুলিয়া যেমন জানকী দাঁড়াইল, অমনি অন্ধকারে এক গুলি আসিয়া তাহার চক্ষু বিদ্ধ করিল। "মাগো!" বলিয়াই জানকী পড়িয়া গেল। সদাশিব নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, শাল-লতার জীবন মূল ছিন্ন হইয়াছে।

মুকুন্দ "জানকী জানকী" বলিয়া চীৎকার করিয়া তাহার বক্ষে আছাড় খাইয়া পড়িল। এই আকস্মিক ঘটনায় মর্ম্মাহত তুলসী ছুটিয়া মুকুন্দের নিকট হইতে জানকীর দেহ নিজ বক্ষে তুলিয়া লইল। প্রকৃতিস্থ হইয়া অস্ত্র ধরিতে না ধরিতে সদাশিব দেখিল আপনাকে বন্দী। বহুলোকে যুগপৎ তাহাকে বেষ্টিত করিয়া ধরিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয়বার মোহের ঘোর কাটিলে নারায়ণী ডাকিল—"দিদি!" উত্তর পাইল না। উঠিয়া বসিল। আবার ডাকিল—"দিদি!" উত্তর পাইল না। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তখনও মিটিমিটি দীপ জ্বলিতেছে। সে ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিল, ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল—তুলসীকে দেখিতে পাইল না। তখন, এক একটী সোপান হাত দিয়া ধরিয়া, সাবধানে পা ফেলিতে ফেলিতে নীচে নামিল। যথাশক্তি জোর করিয়া ডাকিল—"দিদি, ঘরে আছ?" উত্তর না পাইয়া বুঝিল, দিদি ঘরেও নাই।

উপর হইতে নীচে সমস্ত দ্বার খোলা। এরূপ অবস্থায় তাহাকে এই নির্জ্জন অন্ধকার পুরীমধ্যে একা ফেলিয়া, তাহার

দিদি যে তুচ্ছ কারণে চলিয়া যায়, এটা নারায়ণী কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে সদর দরজায় আসিয়া প্রাণপণে দিদিকে ডাকিল। কে যেন তাহার কথা শুনিয়া আসিতেছে। স্ত্রীলোক ত নয়! নারায়ণীর বড়ই ভয় হইল। দুর্ব্বল দেহে কম্প আসিল। এ দেশীয় ত নয়! বালিকা পিছাইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবে মনে করিল, কিন্তু পা চলিল না। সে দ্বার ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

অন্ধকার ভেদ করিয়া আগন্তুক দ্বার সমীপে উপস্থিত হইল। নারায়ণী দেখিল, আগন্তুক তাহার রক্ষাকর্ত্তা সাহেব।

নারায়ণী। আবার কি মনে করিয়া, এখানে কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন সাহেব!

ব্রাউন। রাজকুমারী! সুস্থ হইয়াছেন?

নারায়ণী। হইয়াছি।

ব্রাউন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি ডাক্তার আনিতে রাঁচি চলিয়াছিলাম।

নারায়ণী। ফিরিলেন কেন?

ব্রাউন। আপনার ভগিনীর আদেশে আসিয়াছি।

নারায়ণী। তিনি কোথায়?

ব্রাউন। তিনি আজ রাত্রির মত এখানে আসিতে পারিবেন না।

নারায়ণী। কেন?

ব্রাউন। তাঁহারই মুখে শুনিবেন।

নারায়ণী। বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন?

ব্রাউন। তাঁহার স্বামী বিপন্ন।

শুনিয়া নারায়ণী কিয়ংক্ষণ নীরব রহিল। ব্রাউনও আর কোন কথা না কহিয়া পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে নারায়ণী বলিল—

"আর দাঁড়াইয়া কষ্ট পান কেন সাহেব ?"

ব্রাউন। এই ঘোর রাত্রি, এই নির্জ্জন দেশ, আপনি একা।

নারায়ণী। তা হ'ক, আপনি আর আমার জন্য কষ্ট ভোগ করিবেন না।

ব্রাউন। কষ্ট নয় রাজকুমারী, আমি এ গৌরবান্বিত প্রহরীর কার্য্যে আনন্দ বোধ করিতেছি।

নারায়ণী। আপনি মহৎ—বুঝি কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা। তথাপি সাহেব—

ব্রাউন। কি বলিতেছিলেন, বলুন।

নারায়ণী। বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছি।

ব্রাউন। বুঝিয়াছি—আমি সে দিন আপনার ভগিনীর মুখে শুনিয়াছিলাম। ভাল, আমি দূরে থাকিলে কি আপনার আপত্তি আছে ?

নারায়ণী। আমি অভাগিনী। দুঃখিনী দেখিয়া দয়া করিতে আসিয়াছেন, তথাপি আপনার মনে কষ্ট দিলাম।

ব্রাউন। আপনি ঘরে গিয়া বিশ্রাম করুন।

নারায়ণী। আর আপনি ?

ব্রাউন। আমি একটা গাছের তলায় বসিয়া রাত্রি যাপন করি। আপনাকে এই অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। আমাকে স্থানত্যাগে অনুমতি করিবেন না।

নারায়ণী। আপনার যাহা অভিরুচি।

ব্রাউন। আপনি ঘরে যান।

নারায়ণী। যাইতেছি।

ব্রাউন অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। নারায়ণী দ্বারে বসিয়া রহিল। বাস্তবিক তার উঠিবার শক্তি ছিল না। ব্রাউন কিছুদূর যাইলে, নারায়ণী ডাকিল—"সাহেব!"

ব্রাউনের হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল। দ্রুত ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি রাজকুমারী?"

নারায়ণী। ধন সম্পত্তি হারাইয়া ভিখারিণী হইয়াছি। সময় বুঝিয়া, সুবর্ণরেখা, পিতামহীও আমাকে কোলে লইয়াছিল, তুলিলে কেন সাহেব? তোমার মত সদাশয় ক'জন আছে! আর কে আমার মর্য্যাদা রাখিবে।

ব্রাউন। ভাল, রাজকুমারী, আপনার দারিদ্রের যদি কোনও প্রতীকার করিতে পারি?

নারায়ণী মাথা হেঁট করিল, উত্তর দিল না। তথাপি ব্রাউন বলিতে লাগিলেন—"আমি যথেষ্ট সম্পত্তির অধিকারী। তাহার অর্দ্ধেক যদি আপনি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করি।

নারায়ণী তথাপি উত্তর দিল না। ব্রাউন আবার বলিলেন—

"আপনি ভয় পাইতেছেন, আমি নিঃস্ব হইব? আমার তিন লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি।"

বিস্মিত হইয়া নারায়ণী তাহার মুখের পানে চাহিল। ব্রাউন বলিতে লাগিলেন—

"পঁচিশ লক্ষ টাকা নগত। আমি সমস্ত সঞ্চিত অর্থ আপনাকে দান করিব।"

নারায়ণী। সমস্ত সম্পত্তি হারাইলেও আপনি নিঃস্ব হইবার ন'ন। যে হেতু আপনি করুণা-রত্নের অধিকারী। কিন্তু সাহেব, আমার পিতামহেরও ত যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল, তবু আমি ভিখারিণী কেন?

ব্রাউন। আপনি রাজকুমারীই বটে!

ব্রাউন আবার অভিবাদন করিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে নারায়ণী বলিল—"যদি এ রাত্রির মত অনন্তপুরে থাকাই আপনার অভিপ্রায়, তাহা হইলে নিম্নতলে একটী গৃহে বিশ্রাম করুন। আমি উপর হইতে শয্যা আনিয়া দিই।

ব্রাউন। না রাজকুমারী, আমার জন্য চিন্তা করিবেন না।

নারায়ণী। বাহিরে বন্যজন্তুর ভয় আছে।

ব্রাউন। ইংরাজ মৃত্যুকে ভয় করে না। বিশেষতঃ কর্ত্তব্য পালনের অত্যন্ত আগ্রহে, সে বিপদকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে।

নারায়ণী। আমি বুঝিয়াছি, আপনার সমস্ত দিবস আহার হয় নাই।

ব্রাউন। কাল প্রাতঃকালে হইবে।

ব্রাউন প্রস্থান করিলেন, এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই বাটীর অন্তরালে পড়িলেন। নারায়ণী উপরে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উপরে গিয়া নারায়ণী শয়ন করিল; কিন্তু নানা দুশ্চিন্তায় তাহার নিদ্রা আসিল না। কিছুক্ষণ শয্যার এপাশ ওপাশ

করিয়া উঠিয়া বসিল, তারপর শয্যা ছাড়িয়া ঘর ছাড়িয়া ছাদে আসিল। ছাদে পা দিতেই দুরুদুরু মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল। বালিকা মাথা তুলিয়া দেখে, সমস্ত পশ্চিম আকাশ ব্যাপী ঘন মেঘের শিরে বিজলি খেলিতেছে! এখনি ত ধারাজলে দেশ ভাসিয়া যাইবে! তখনই সাহেবের জন্য তাহার ভাবনা হইল। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে গৃহে আশ্রয় না দেওয়া নীচের কার্য্য। রাজকুমারী সে নীচতা মনেও আনিতে পারিল না। সে আলিশা হইতে মুখ বাড়াইয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল। আবার বিজলি! তাহার সাহায্যে নারায়ণী দেখিল, সাহেব খিড়কির বাগানে একটা গাছের তলায় বসিয়া আছে। আবার সে নীচে নামিল।

একদিন যে আম্রবৃক্ষের তলে বৃদ্ধ রতন রায়ের সঙ্গে হরিণ শিশু 'শারী'কে লইয়া নারায়ণী খেলা করিয়াছিল, ব্রাউন ঘটনাক্রমে সেই স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সারা-দিনের উপবাসে ও পরিশ্রমে তিনি বসিবার অল্পক্ষণ পরেই ঘুমাইয়া পড়েন।

ঘুমাইবার পূর্ব্বে ব্রাউন অনুক্ষণ চিন্তা করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া রাজকুমারীর দুঃখ দূর করিবেন। বালিকা লইতে চায় না, কিন্তু তাহাকে যেমন করিয়া হউক লওয়াইতেই হইবে। টাকা দিলে না লইতে চায়, একখানি দলিল দিবেন—কলিকাতার কোন ব্যাঙ্কের সঙ্গে, সেই টাকা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিবেন। তারপর যে কোন উপায়ে হউক, তাহার ভগিনীপতির উদ্ধা-রের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভাল ভাল উকীল নিযুক্ত করিতে হইবে। তাহাতেও না হয়—ব্রাউন সদাশিবের উদ্ধারের জন্য

নানা উপায় কল্পনা করিয়াছিলেন। সদাশিবের সঙ্গে নারায়ণীর কি সম্বন্ধ ব্রাউন জানিতেন না। নারায়ণীও বলে নাই, তুলসীও বলে নাই।

ঘুমাইয়াও তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। এই সময় নারায়ণী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আসিয়া দেখিল, সাহেব গাছের গোড়ায় ঠেস দিয়া হাঁটুতে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া নারায়ণীর চক্ষে জল আসিল। যার তিন লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি, পঁচিশ লক্ষ টাকা নগত, তাহার কি এই অবস্থা! কেন? সাহেবের প্রাণে এত করুণা!

নারায়ণী ব্রাউনকে ডাকিতে যাইতেছিল—"সাহেব! উঠিয়া আসুন। এ তরুতল আপনার ন্যায় রাজপুত্রের স্থান নয়।" কিন্তু কথা মুখে ফুটিতে না ফুটিতে, সে শুনিতে পাইল, সাহেব যেন কি বলিতেছে।

প্রথমে সে মনে করিল, সাহেব বুঝি জাগিল। তাহার বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল! "চারিদিক অন্ধকার, এ নির্জ্জন দেশ—কুলকামিনী আমি কোথায়, কাহার সম্মুখে আসিয়াছি! যদি কেহ দেখিতে পাইত? যদি স্বামী এই সময় ফিরিয়া আসিতেন—রাজা দেখিতেন?"

পরক্ষণেই নারায়ণী বুঝিতে পারিল, সাহেব স্বপ্নে কি বলিতেছে! সে কাণ পাতিয়া শুনিল। প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিল না; ভাষা অস্পষ্ট, অপরিচিত, অর্থহীন।

ব্রাউন পকেটে হাত দিলেন, এক খানা বাঁধা খাতা বাহির করিলেন। খুলিবার চেষ্টা করিলেন,—জলে ভিজিয়া পাতা গুলা জুড়িয়া গিয়াছিল, খুলিল না। তাহার পার্শ্ব হইতে একটী

পেন্সিল লইয়া, সে খানা আবার পকেটে রাখিলেন। হাত বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে এক খানা কাগজ বাহির হইল। নারায়ণী দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

লিখিবার যেমন উদ্যোগ করে, এই ভাবে কাগজ খানা বাম হস্তে ও দক্ষিণ হস্তে পেন্সিল লইয়া ব্রাউন জিজ্ঞাসা করিলেন— "আপনার নাম কি রাজকুমারী?"

নারায়ণী চমকিল—সাহেব চক্ষু মুদিয়া ও কি তাহাকে দেখিতেছে!

ব্রাউন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলিলেন—না—না —নারা—য়ণী?

নারায়ণীর সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল—একি ম্লেচ্ছ বেশ-ধারী দেবতা!

ব্রাউন। কি মধুর নাম! আপনি আমাকে চার্লি বলিয়া ডাকিবেন।

ব্রাউন কাগজে নাম লিখিলেন। আবার মেঘ গর্জ্জিল! নারায়ণী দেখিল, ঘন জলধর মধ্য-গগণে আসিয়া বিকট হাসি-তেছে! নারায়ণী সাহেবকে জাগাইতে ডাকিল—"সাহেব!" সাহেবের ঘুম ভাঙ্গিল না। আবার ডাকিল—"সাহেব!" সাহেবের নিদ্রা গাঢ়তর হইল, হস্ত মাটীতে পড়িল। "চার্লি!" এক চমকে সাহেবের নিদ্রা ভাঙ্গিল। সম্মুখে দেখিলেন নারায়ণী। তিনি স্থির মূর্ত্তিতে অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

নারায়ণী। আকাশে মেঘ গর্জ্জিতেছে—উঠিয়া আসুন।

ব্রাউন। অগ্রে কিছু গ্রহণ করিতে স্বীকার করুন।

নারায়ণী। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এখন লইয়া কি করিব!

ব্রাউন নত জানু হইলেন—"কোনও উপকারে আসিলাম না রাজকুমারী! শুধু সর্ব্বনাশসাধন করিয়া ফিরিয়া চলিলাম!"

নারায়ণী। আপনি ম্লেচ্ছ বেশে দেবতা। মরণের সুগম পথ দেখাইতে পারিলেই উপকৃত হই।

ব্রাউন। আমিও তার অনুসন্ধান করিতেছি।

নারায়ণী। আপনি ঘরে আসুন।

ব্রাউন। আমি বেশ আছি।

নারায়ণী। এখনি মুষলধারে বৃষ্টি আসিবে।

ব্রাউন। তাহাতে আরও ভাল থাকিব।

নারায়ণী। ভাল—চার্লি! তোমার দান গ্রহণ করিব।

ব্রাউন। নাম কেমনে জানিলে রাজকুমারী!

নারায়ণী। তুমি কি আমার নাম জান না?

ব্রাউন। কখনও ত শুনি নাই!

বাড়ীর দিক হইতে কে ডাকিল;"নারায়ণী!"

ব্রাউন। এই ত তোমারই নাম। এ নাম যে আমি কোথায় শুনিয়াছি!

নারায়ণী। আমার যম বলিয়াছে।

ব্রাউন। যম কে?

নারায়ণী। তুমি বুঝিবে না।

আবার কণ্ঠস্বর উঠিল—"নারায়ণী!" গম্ভীর, বার্দ্ধক্য-বিকৃত অস্পষ্ট কণ্ঠ!

ব্রাউন। কে ডাকিতেছে নারায়ণী?

নারায়ণী। এও বুঝি সেই যম। চার্লি! তুমি অপেক্ষা কর। আমি শুনিয়া আসি। বিলম্ব দেখিলে সংবাদ নিয়ো।

নারায়ণী প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কাঁপিতে কাঁপিতে নারায়ণী গৃহে চলিল। অত্যধিক পরিশ্রমে তাহার শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে। প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিল, কে এক বৃদ্ধ দ্বার আগুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বৃদ্ধ রাজা বীরচন্দ্র। তিনি নারায়ণীকে দেখিয়াই বলিলেন—

"কোথা গিয়াছিলে নারায়ণী?"

নারায়ণী। কেও মহারাজ!

বীর। কার সহিত কথা কহিতেছিলে?

নারায়ণী উত্তর করিল না। আগ্রহে পিতামহকে জড়াইয়া ধরিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু আর পা সরিল না। সে দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল। রাজা আবার বলিলেন—তোমার স্বামীর অবস্থার কথা শুনিয়াছ?

নারায়ণী। শুনিয়াছি। তিনি বিপন্ন।

বীর। তাহার জীবিত ফিরিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। সাহেব তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার ফাঁসি হইবে। আমিও ধরা দিতে চলিয়াছি।

নারায়ণী। যদি জানেন, আপনি ধরা দিলেও তাঁর মুক্তি নাই, তখন আপনি ধরা দিতে চাহিতেছেন কেন?

বীর। আমার সন্ধান জানিবার জন্য তাহার উপর উৎপীড়ন হইবে। জানি, সে বীর মরণ পর্য্যন্ত যাতনা সহিবে, তথাপি আমার সন্ধান দিবে না। জানিয়া শুনিয়া কেমন করিয়া এ হীন প্রাণের জন্য লুকাইয়া থাকি নারায়ণী! সে সাধু আমার দুর্দ্দশায় সঙ্গী হইয়াছে, আমি তাহার মরণে সঙ্গী হইব না।

নারায়ণী। এরূপ অবস্থায় সঙ্গী হওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু আপনি কি দিন দুই অপেক্ষা করিতে পারেন না?

বীর। কেন?

নারায়ণী। আমি তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারি।

বীর। তুমি পার, আর চেষ্টা করিলে বোধ হয় রক্ষাও করিতে পার। কিন্তু নারায়ণী! তোমার স্বামীর পবিত্র প্রাণ কি ওই ম্লেচ্ছের কৃপার উচ্ছিষ্ট হইবে?

নারায়ণী বুঝিল, পিতামহ সমস্তই দেখিয়াছেন। তথাপি সে আত্মপক্ষ সমর্থন করিল না। কেবল বলিল—"তবে যান।"

বীর। যাইব, কিন্তু তোমায় কোথায় রাখিয়া যাইব?

নারায়ণী। কোথায় রাখিতে চান বলুন।

বীর। তোমার পিতামহী যেখানে আশ্রয় লইয়াছেন, সেই মমতাময়ী সুবর্ণরেখার বক্ষে।

নারায়ণী। তা হ'লে আপনিই সে বক্ষে তুলিয়া দিন। আমি বড় দুর্ব্বল, ততদূর যাইতে পারিব না।

বীর। এতটা পথ যাতায়াত করিলে কেমন করিয়া?

নারায়ণী ভাবিল—"তাইত! এতক্ষণ কেমন করিয়া চলা

ফেরা করিলাম! এই উপরে, নীচে, দীর্ঘ উদ্যান পথে যাতায়াতের শক্তি আমাকে কে দিল?

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া, বীরচন্দ্র আবার বলিলেন—"পারিবে না?"

নারায়ণী। পারিব—সঙ্গে আসুন।

নারায়ণী বাটীর ভিতর আর প্রবেশ করিল না, আর পিতামহের মুখের পানে চাহিল না দ্বার হইতেই ফিরিল। পিতামহ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। মন্থর অথচ স্থির গতিতে বালিকা অন্তঃপুর সংলগ্ন ঘাটের দিকে চলিল। একবারও কাঁপিল না, টলিল না—পিতামহ পশ্চাতে আসিতেছেন কিনা ফিরিয়াও দেখিল না। ঘাটে আসিয়া, ভাঙ্গা ধাপ অন্ধকারে ধরিয়া জলে নামিল। বীরচন্দ্র ঘাটে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া নারায়ণী বলিল— দাদা আমাকে লইতে চায় না। এখনও হাঁটু পর্য্যন্ত জল—কেমন করিয়া মরি?

বীরচন্দ্রের স্থির হৃদয় এইবারে টলিল—"মা, বুঝিতে পারি নাই, আর মরিতে হইবে না, ফিরিয়া আয়।"

নারায়ণী ফিরিল না, অগ্রসর হইল—ক্ষীণ মধ্য এইবারে জলে ডুবিল।

"দাদা আর ফিরিতে হইবে না, আসিয়াছি। মা এইবারে আমাকে আকর্ষণ করিতেছেন।" এই সময়ে একবার বিদ্যুৎ চমকিল। রাজা দেখিলেন, বিসর্জ্জনোন্মুখী প্রতিমা নদীবক্ষে কাঁপিতেছে। চীৎকার করিয়া বলিলেন—"নারায়ণী! দিদি আমার! বৃদ্ধ আমি, জ্ঞানশূন্য আমি, তিন বৎসর বন্য জন্তুর

সংসর্গে মমতাহীন উন্মত্ত আমি। দয়া করিয়া ফিরিয়া আয়।”
রাজা জলে পা দিলেন।

মড়মড় শব্দে আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল জ্বালাময়ী তড়িল্লতা সুবর্ণরেখার বক্ষে লীলা করিতে করিতে ছুটিয়া গেল। হতভাগ্য বীরচন্দ্র দেখিল, সুবর্ণরেখা যেন সহস্র স্রোতো-বাহুবেষ্টনে তড়িন্ময়ীকে কোলে লইয়াছে।

বীরচন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিলেন—“কে কোথা আছ, আমার মাকে রক্ষা কর।”

অন্ধকারে তিনি কেবল নদীবক্ষে একটা গুরু দ্রব্য পতন শব্দ শুনিতে পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে জল আসিল।

প্রত্যুষে, ভগ্নহৃদয় মুন্না আরণ্য আবাসে ফিরিতে দেখিতে পাইল, নদীতীরস্থ শিলাগাত্রে তিনটী শব আবদ্ধ হইয়া ভাসিতেছে। তুলিয়া দেখিল, এক সাহেবের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ নারায়ণী, আর উভয়কে ধরিয়া রাজা বীরচন্দ্র। কাহারও সাহায্য না পাইয়া উন্মত্ত বীরচন্দ্র পৌত্রীর উদ্ধারার্থে নিজেই জলে পড়িয়াছিলেন। মুন্না রাজাকে পৃথক করিতে পারিল, কিন্তু সহস্র চেষ্টায় সাহেবের বাহুবন্ধন হইতে নারায়ণীকে মুক্ত করিতে পারিল না।

পরিশিষ্ট।

কারামুক্ত হইয়া রতন কিছুদিন গ্রামে অবস্থিতি করেন। অনন্তপুরে ফিরিতে তাঁহার আর ইচ্ছা ছিল না, ফিরিতে সাহসও ছিল না। কারাক্লেশে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু জন্মগ্রামে তিনি অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। তীর্থবাসী হইবার জন্য দিন কয়েক কাশীতে রহিলেন। কাশীতেও মন টিকিল না। অদৃষ্টে অশেষ দুঃখে কল্পনা করিয়া, তিনি অবশেষে অনন্তপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

সেখানে আসিয়া ব্রাহ্মণ যাহা দেখিলেন, তাহা আর পাঠককে বুঝাইতে হইবে না। অনন্তপুরের শ্রী দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইল। সিপাহী বিদ্রোহের কথা শুনিয়াছিলেন মাত্র। রাজার বিদ্রোহিতার সংবাদ তিনি কিছুই জানিতেন না। সুতরাং অনন্তপুরের এরূপ অবস্থার কারণ বুঝিতে পারিলেন না।

রাজার পরিণাম জানিতে তিনি বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু কে তাঁহাকে সংবাদ দেয়! তিনি রাজার ভগ্ন অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। যে কয়টী ঘর আছে, সকল গুলির দ্বার খোলা। লোক সমাগমের চিহ্নমাত্রও নাই। ঘরে ঘরে রাণী ও

নারায়ণীর দুই একটী চিহ্ন পড়িয়া আছে এই মাত্র। “রাণী, নারায়ণী, তুলসী” বলিয়া দুই একবার চীৎকার করিলেন— কেহই উত্তর দিল না। শেষে নিজের কুটীর পরিদর্শন করিতে আসিলেন। দেখিলেন, কুটীর জঙ্গলে ঘেরিয়াছে।

তথাপি ব্রাহ্মণ ঘরের মায়া ভুলিতে পারিলেন না। দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তাহার শয়ন গৃহ এখনও পর্য্যন্ত কালের সহিত সংগ্রাম করিতেছে। তিনি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। “জুনিয়ার মা, জুনিয়ার মা” বলিয়া চীৎকার করিলেন। শব্দঘাতে দেয়ালের কতকগুলা ইষ্টক অপসারিত হইয়া গেল। তাহার মধ্য হইতে একটা থলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দেখিবামাত্র রতন বুঝিলেন, ইহা সেই জুনিয়ার মাকে প্রদত্ত স্বুবর্ণ মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া। থলিয়া লইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। মুখ খুলিয়া গণিয়া দেখেন, বৃদ্ধা তাহার একটী মুদ্রাও স্পর্শ করে নাই।

গণনাও শেষ হইল, অমনি একটী বিকট শব্দে তাঁহার ঘর খানি ভাঙ্গিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইলেন। বাটীর ভিতরের চারিদিকে জুনিয়ার মায়ের সন্ধান করিলেন। অনুসন্ধানের ফলে, বাটীর এক কোণে একটী নর-কঙ্কাল দৃষ্ট হইল।

মোহরের থলিয়া লইয়া রতন গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু কোথায় যাইবেন? এ বৃদ্ধ বয়সে এত অর্থ লইয়াই বা কি করিবেন?

তখন কাশীপুরে যাওয়াই তিনি স্থির করিলেন। ভাবিলেন সেখানে পাইলেও পাইতে পারি। নারায়ণীর অদর্শনে অস্থির ব্রাহ্মণ স্থানত্যাগে কালাকাল নিরূপণেরও অবকাশ পাইলেন

না। সৌভাগ্যক্রমে কিছু খাদ্য তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাই মুখে দিয়াই তিনি অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। চলিতে চলিতে পথে সন্ধ্যা হইল। সম্মুখে জনার ভীষণ বন! ব্রাহ্মণ পথ পার্শ্ব হইতে কতকগুলি শুষ্ক শাল কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া, পরস্পরের ঘর্ষণে অগ্নি জ্বালিলেন, এবং তাহারই আলোক আশ্রয় করিয়া ভীষণ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বক্রগামিনী সুবর্ণরেখা অনন্তপুরের পার্শ্ব দিয়া বহিয়া জনার জঙ্গল বেড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। রাঁচি হইতে পুরুলিয়ার পথে ইহাকে দুইবার অতিক্রম করিতে হয়।

জঙ্গল পার হইয়া রতন যখন নদীতীরে আসিলেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। শুক্ল পক্ষের রাত্রি—চন্দ্র ধীরে ধীরে অস্তমিত হইতেছিল।

ব্রাহ্মণ একবার আকাশের পানে চাহিলেন। পর পারেও বন, কিন্তু অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। তিনি মনে করিলেন, চাঁদ থাকিতে থাকিতে এই বন টুকু পার হইয়া, অনাবৃত স্থানে উপস্থিত হইতে পারি।

এই মনে করিয়া, তিনি নদী জলে অবরোহনের উদ্যোগ করিলেন।

নদী-সৈকতে প্রতিভাত জ্যোৎস্না, তখনও পর্য্যন্ত তরু গাত্র সংলগ্ন হইয়া খেলা করিতেছিল। ঝিল্লীরব-মুখরিত পরপারের তীর-ভূমি কল্লোলিনীর সঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া, রজত প্রান্তরের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

ব্রাহ্মণ জলে পা দিয়াছেন, এমন সময়ে দূরে—বহুদূরে পাদপস্কন্ধ প্রতিহত, অর্দ্ধপরিস্ফুট বীণাঝঙ্কারবৎ কোমলকণ্ঠ-

ধ্বনি সুবর্ণরেখা তীরভূমে আসিয়া উপস্থিত হইল—"বীরচন্দ্র সাহীদেব!"

কথা শুনিয়াই ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"নারায়ণী!" উত্তর আসিল না। আবার ডাকিলেন। জনমানবশূন্য-প্রান্তরস্থা অশিক্ষিতা প্রতিধ্বনি সে কণ্ঠের অনুকরণ করিতে নিষ্ফল চেষ্টা করিল। উত্তর আসিল না।

বিষণ্ণমনে ব্রাহ্মণ নদীপার হইতে লাগিলেন।

সহসা দূর হইতে অশ্বপদ শব্দ শ্রুত হইল। জনার সেই আরণ্য পথ ধরিয়া কোন অশ্বারোহী নদীতীরাভিমুখে আসিতেছে। বৃদ্ধ সাগ্রহে সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, চন্দ্র বৃক্ষান্তরালগত—কিছু দেখিতে পাইলেন না। উৎকর্ণ হইয়া শব্দের গতি লক্ষ্য করিলেন, নিকটবর্ত্তী হইতে হইতে, শব্দ দূর অধিকতর দূরে যাইয়া মিলাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের শব্দ। ব্রাহ্মণ ফিরিয়া সত্বর উপরে উঠিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু উঠিতে না উঠিতে, আবার নদীতীরস্থ দেশ অন্ধকারে ভরিয়া গেল। আবার কণ্ঠধ্বনি—"বীরচন্দ্র সাহীদেব!"

তীর ধরিয়া রতন কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন, কিন্তু চলিতে চলিতে প্রতিপদে বাধা পাইতে লাগিলেন। অধিক দূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বোধে নিকটস্থ একটা শিলাস্তূপে আরূঢ় হইয়া, সেই পূর্ব্বশ্রুত স্বর লক্ষ্যে ডাকিলেন—"নারায়ণী!" দূরাগত একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তাঁহারই স্বর আবার তাঁহারই কাছে ফিরাইয়া আনিল। অগত্যা তিনি এক শিলাখণ্ডের উপর উপবিষ্ট হইলেন। ভাবিলেন—"প্রভাত হইতে বিলম্ব নাই,

পূর্ব্বাকাশে উষার পূর্ব্বাভাষ শুক তারা দেখা দিয়াছে। একটু পরেই সন্ধান করিব।”

বসিয়া বসিয়া তিনি দেখিলেন, অরণ্য গর্ভ সহসা আলোকিত হইয়া উঠিল। বুঝিলেন, কোন লোক জঙ্গলে ভ্রমণ করিতেছে। আলোকবৃত্ত ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন হইতে লাগিল, বুঝিলেন, লোকটা তাঁহারই দিকে আসিতেছে। সহসা আলোক অন্তর্হিত হইল। ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইলেন। একি কোন অপদেবতার ক্রিয়া! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তুমি?” কোনও উত্তর পাইলেন না। কিয়ংক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—“আলোক দেখাইলে কে তুমি?”

এক অপরিচিতের স্বর বনমধ্য হইতে উচ্চারিত হইল—“তুই কে?”

রতন দেখিলেন, আঁধার ভেদ করিয়া অস্ত্রধারী একজন কৃষ্ণকায় তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

তাহার হস্তে বন্দুক ছিল। সে রতনের সমীপবর্ত্তী হইলে তিনি উত্তর করিলেন—“দেখিতেই ত পাইতেছ, দুর্ব্বল বৃদ্ধ।

সে জিজ্ঞাসা করিল—“এখানে বসিয়া কি করিতেছিস্?”

রতন উত্তর করিলেন—“কিছুই করি নাই—অন্ধকারে পথ হারাইয়াছি। তাই বসিয়া প্রভাতের অপেক্ষা করিতেছি। “তুমি কে?”

লোকটা উত্তর করিল—“আমি শিকারী। আমি জেলার বড় সাহেবের সঙ্গে হরিণ শীকারে আসিয়াছিলাম।”

“সাহেব কোথায়?”

“তিনি ডাকাত দেখিয়া তাহাকে ধরিতে গিয়াছেন।”

"তুমি কি করিতেছ ?"

"হুজুরের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া, আমি তাঁহাকে খুঁজিতে আসিয়াছি।

রতন দেখিলেন, তাহার হাতে একটা 'আঁধারে' লণ্ঠন রহিয়াছে। তাহার সাহায্যে সে দূর হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছিল, এবং কাছে আসিয়াই সে লণ্ঠনের মুখ বন্ধ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ মনে করিলেন—এমন আলোকের সুবিধা থাকিতে শুধু শুধু বসিয়াই বা রাত্রি যাপন করি কেন ? ইহাকে দিয়া নারায়ণীর সন্ধান করাইলে ক্ষতি কি ? এই ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে নিকটে আসিতে আদেশ করিলেন।

সে আসিল না; অধিকন্তু তীব্রতর ভাষায় তাহার কথার উত্তর দিল—"তুই কি আমার মনিব যে, তোর হুকুমে কাছে যাইব !"

রতন দ্বিতীয়বার কাছে আসিতে আদেশ করিলেন। শব্দটা একটু ঘণ-গম্ভীর হইয়া পড়িল। সুবর্ণরেখায়, অরণ্যে, প্রান্তরে, পর্ব্বতগাত্রে—চারিদিক হইতে একটা বিভীষিকাময় শব্দ-তরঙ্গ যুগপৎ উত্থিত হইয়া শিকারী প্রভুর কর্ণপটাহ ভীমবেগে আঘাত করিল। সে তখন বুঝিল, নরব্যাঘ্রের মুখে পড়িয়াছি। অন্ধকারে রতনের মূর্ত্তি তাহার চক্ষে অস্পষ্ট দেখাইতেছিল। বিভীষিকা সেটাকে স্পষ্ট ও বৃহত্তর করিয়া তুলিল। মন্ত্র-পরিচালিতবৎ সে ব্রাহ্মণের নিকটে আসিল।

ব্রাহ্মণ তাহাকে অভয় দিয়া তাহার নিকট হইতে লণ্ঠন চাহিলেন। তার দক্ষিণ হস্তে লণ্ঠন ও বাম হস্তে বন্দুক ছিল। কিন্তু কোথায় কি ছিল, মনের গোলমালে ভুলিয়া গিয়াছিল।

রতন লণ্ঠন চাহিতে সে বন্দুক দিতে আসিল। ব্রাহ্মণ তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া অপর হস্ত হইতে লণ্ঠন লইলেন। লণ্ঠনের মুখ খুলিবামাত্র সম্মুখের বহুদূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়া উঠিল।

সেই উজ্জ্বল আলোক সাহায্যে রতন দেখিলেন, একটা ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয়া তটিনীর তীরস্থ শৈলগাত্রে এক খণ্ড বহির্ম্মুখ শিলাতলে উপবিষ্টা একটী রমণী। রমণী আলোকের দিকে চাহিতেছিল।

রতন আত্মহারাবৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"নারায়ণী!" শুধু একটী প্রতিধ্বনির তরঙ্গ ছুটিল—উত্তর আসিল না। আবার তিনি নারায়ণী বলিয়া ডাকিলেন: রমণী নিরুত্তর, অবস্থিতি চিত্রপুত্তলিকাবৎ। রতন তাহাতে আগ্রহের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন না।

শিকারীও সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিল। দেখিয়াই স্থির করিয়াছিল, পার্ব্বতীয়া প্রেতিনী। দর্শন মাত্রেই সে মনে মনে প্রেতাপসারী দেবতার নাম করিতেছিল। বৃদ্ধের উচ্চারিত নাম শ্রবণ মাত্র বুঝিল, বৃদ্ধ যখন উহাকে সম্বোধন করিতেছে, তখন এ প্রেতিনী মন্ত্রমুগ্ধা—বৃদ্ধের বশীভূতা। বৃদ্ধ প্রেতিনীদের রাজা।

এ দিকে রতন দেখিলেন, রমণী শিলাতল পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারের ভিতর ডুবিয়া গেল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, লোকটাকে বলিলেন—"ভাই! যথেষ্ট পুরস্কার দিব, আলোক লইয়া সঙ্গে আয়।"

ভ্রাতৃ সম্বোধনে শিকারী গলিয়া গেল। কহিল—"হুজুর! অনুমতি করিলে আমি প্রেতিনীর মুখেও যাইতে পারি।"

রতন পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। পর্ব্বতের পাদসমীপস্থ হইয়া, আর একবার 'নারায়ণী' বলিয়া চীৎকার করিলেন।

পার্শ্বস্থ অরণ্যমধ্য হইতে উত্তর আসিল—"ঠাকুর!"

রতন ফিরিয়া দেখেন তুলসী! বিস্মিত ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন—"তবে পাহাড়ের উপরে কাহাকে দেখিলাম!"

তুলসী। বলিতে পারিনা। আমি আলোক দেখিয়া বনের ভিতর হইতে আসিতেছি।

রতন। এখানে কেন?

তুলসী। এইরূপ স্থানেই এখন আমার বাস। আমি বনে বনে পথে পথে বিচরণ করি।

তুলসী ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে প্রণতা হইল।

পূর্ব্বাকাশ অরুণ রাগে ঈষৎ ঈষৎ রঞ্জিত হইতেছিল। দুই এক খানি খণ্ড মেঘ অরুণাভ হইতে লাগিল। তুলসী প্রণাম করিয়া যেই দাঁড়াইল, অমনি দুইটী পরস্পর সন্নিহিত শৈলের ঈষদুন্মুক্ত মধ্য দিয়া একটী আলোক রশ্মি তাহার মুখে পড়িল। রতন দেখিলেন, কাঞ্চণ কমলের পলাশ হইতে ঝর ঝর পদ্মরাগমণি ঝরিতেছে।

রতন। তোমার স্বামী?

তুলসী। পরশ্ব প্রভাতে তাঁহার ফাঁসি হইবে।

রতন। তোমার পিতা?

তুলসী। নাই।

রতন। পুত্র?

তুলসী। নাই।

রতন। পিত্রালয়?

তুলসী। কিছুই নাই। সমস্ত ভূমিসাৎ হইয়াছে।

রতন। নারায়ণী ?

তুলসী। তাহারই সন্ধানে ফিরিতেছি। সে বুঝি আমাকে লুকাইয়া এই বনে বাস করিতেছে।

রতন। রাজার নাম ধরিয়া তবে তুমিই ডাকিতেছিলে ?

তুলসী। স্বামীর কাছে শুনিয়াছি, রাজা এইরূপ কোন স্থানে আত্মগোপন করিয়া আছেন। নারায়ণী বুঝি তাঁর কাছে আছে।

"এস তবে উভয়েই তাঁর সন্ধান করি।" এই বলিয়া রতন তুলসীর হাত ধরিয়া বনপথে অগ্রসর হইলেন। শিকারী সঙ্গে চলিতেছিল, তিনি নিষেধ করিলেন ; এবং প্রতিশ্রুতি মত কিছু পুরস্কার দিয়া, তাহাকে বিদায় দিলেন।

কিছুদূর না যাইতেই বনমধ্যে মুমূর্ষুর কণ্ঠ শ্রুত হইল। উভয়ে যাইয়া দেখেন, মুন্না একটী ঝোপের ভিতরে একটী শিলায় হেলান দিয়া মরিতেছে।

রতন। এ কি মুন্না !

মুন্না। কে আপনি—ঠাকুর ?

সেই অবস্থাতেই মুন্না হাত বাড়াইয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিল। বলিল—"এত দিন পরে, আপনাদের সর্ব্বনাশের প্রতিশোধ লইয়া, পরম সুখে মরিতেছি।"

রতন। প্রতিশোধ ! মুন্না ! তোমার ন্যায় ধর্ম্মবীরের, নীচের যোগ্য প্রতিশোধ গ্রহণ কর্ত্তব্য নয়। কথা কহিবার শক্তি থাকিতে থাকিতে কি করিয়াছ বল। তোমার আত্মা স্বর্গরাজ্যের উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হউক।

মুন্না হাত বাড়াইয়া একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিল — "ওই দূরে গহ্বরের অনুসন্ধান কর।"

তুলসীকে মুন্নার সুশ্রূষার জন্য রাখিয়া, রতন সেই স্থান অন্বেষণে প্রস্থান করিলেন।

প্রথমে কিছু সন্ধান পাইলেন না। কিছুক্ষণ পরে শুনিলেন, ভূগর্ভ হইতে এক গভীর দুর্ব্বোধ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতেছে। শব্দের অনুসরণে, প্রকাণ্ড শিলাচ্ছাদিত এক কৃত্রিম গহ্বর আবিষ্কৃত হইল। তাহার ভিতরে এক সাহেব। দেখিবামাত্র রতন তাঁহাকে চিনিলেন। সাহেব মুন্না কর্ত্তৃক কৌশলে সেই স্থলে আনীত হইয়া জীবিত প্রোথিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য ব্রাহ্মণ তাহার উদ্ধার করিলেন।

* * * * *

রতন ফিরিবার পূর্ব্বেই মুন্না মরিল। তিনি আসিলে, তুলসী বলিল—"আসুন, এইবার রাজাকে ও নারায়ণীকে দেখিয়া আসি।

রতন। আর দেখিবার প্রয়োজন নাই। চল মা! তোমায় লইয়া তীর্থে যাই।

তুলসী। স্বামীর কর্ম্মভূমি—এ হইতে পবিত্র স্থান আর কোথায় পাইব ব্রাহ্মণ!

রতন। তবে আমার কুটীরে চল।

* * * * *

তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে রাঁচির জেলে সদাশিবের ফাঁসি হইল। গ্রীড্ সেখানে উপস্থিত ছিল। শিষ্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ব্রাহ্মণ স্বয়ং দেহ আনিতে গিয়াছিলেন।

সাহেব তাঁহাকে দেখিল। আগে চিনিতে পারে নাই, এখন চিনিল। উদ্ধারের কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া, সমস্ত পূর্ব্ব ঘটনা মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার স্মরণে আসিল। রতন যে সময় সদাশিবের দেহ স্কন্ধে লইয়াছেন, সেই সময়ে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"এ ব্যক্তি তোমার কে?"

"আমার পুত্র, শিষ্য, গর্ব্ব, ধর্ম্ম"—

"একটু আগে বলিলে না কেন?"

"আর জিজ্ঞাসা করিয়ো না সাহেব! আর কাছে আসিয়ো না—আমি মানুষ।"

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

আলিবাবা (রঙ্গ-নাট্য) ... ... ॥০

প্রমোদ রঞ্জন (নাটিকা) ... ... ॥০

কুমারী ... (নাটিকা) ... ... ।৵০

বভ্রুবাহন (নাটক) ... ... ॥০

বভ্রুবাহন নাটকান্তর্গত চরিত্রগুলি 'বঙ্গবাসী'র মতে সেক্স-পিয়রের নাটকীয় চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়। প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠ্য।

জুলিয়া ... (নাটক) ৸০

'জুলিয়া'র চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের।

সপ্তম প্রতিমা (নাটক) ... ... ॥০

সাবিত্রী ... (নাটিকা) ... ... ॥০

'সাবিত্রী' ও বভ্রুবাহনের ন্যায় প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠ্য।

বেদোরা (রঙ্গ-নাট্য) ... ... ॥০

বৃন্দাবন বিলাস ... ... ।৵০

মহাজনদিগের পদাবলীর এক একটী পদ অমূল্য মণি। ইহাতে সেই মণি গুলি যত্নের সহিত গ্রথিত।

কবি কাননিকা ... ... ১৲

কবি কাননিকা নূতন ধরণের উপন্যাস। বাঙ্গালায় এ ধরণের হাস্যরস পূর্ণ উপন্যাস কচিৎ বাহির হইয়াছে। বুদ্ধি পাঠক ইহা পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন। "কমলাকা স্পর্দ্ধাবিজয়ী কবি কাননিকা।"

রঘুবীর, বিয়োগান্তনাটক (ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত) ৸

রঞ্জাবতী, বিয়োগান্তনাটক (ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত) ৷